Noah Feldman

The Fall And Rise Of The Islamic State

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ও পুনরুত্থান

নোয়াহ ফেল্ডম্যান

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

"[A] concise and thoughtful history."
-U.S. News & World Report

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ও পুনরুত্থান

নোয়াহ ফেল্ডম্যান

অনুবাদ
মুহাম্মদ রাশেদ

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ও পুনরুত্থান
(The Fall And Rise Of The Islamic State)
নোয়াহ ফেল্ডম্যান রচিত ও মুহাম্মদ রাশেদ অনূদিত

বি আই এল আর এল এ সি-১১

ISBN : 978-984-90208-8-2

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৪ ঈসায়ী
সফর ১৪৩৬ হিজরী
অগ্রহায়ণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ

গ্রন্থস্বত্ব : সংরক্ষিত

প্রকাশক
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
Website : www.ilrcbd.org

কম্পোজ
ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স বিভাগ

মুদ্রণ : আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ৩০০ (তিন শত) টাকা, $ 15

ISLAMI RASTROBEBOSTHAR PATON O PUNURUTTHAN (The Fall And Rise Of The Islamic State) written by Noah Feldman, translated by Muhammad Rashed and Published by Muhammad Nazrul Islam on the behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone : 02-9576762, Mobile : 01761-855357.

E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com, Website : www.ilrcbd.org,
Price : Tk. 300, $ 15

www.pathagar.com

'আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী'
-সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস নং-৩৬৩৪

'যাজকের নিয়ম-বিন্যাস, শৃঙ্খলা এবং পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উচ্চাশা মুসলিমদের অজানা। ইসলামী আইনের পণ্ডিতগণ মুসলিমদের বিবেকের পথপ্রদর্শক ও বিশ্বাসের মাধ্যম। আটলান্টিক থেকে গঙ্গা সর্বত্র পবিত্র কুরআনকে মনে করা হয় আইনের মৌলিক গ্রন্থ এবং তা কেবল ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রেই নয়, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের মূলনীতির ক্ষেত্রেও। শুধু তাই নয়, কুরআনকে মনে করা হয় আইনের এমন উৎস যা মানবজাতির কর্মকাণ্ড এবং তার সম্পদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। এ আইন স্রষ্টার ত্রুটিহীন ও অপরিবর্তনীয় ইচ্ছা দ্বারা সুরক্ষিত ও পরিচালিত...'

গীবন
The Decline and Fall of Roman Empire
পঞ্চাশতম অধ্যায় (৫ : ৩২৫)

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড ল' স্কুলের প্রফেসর নোয়াহ ফেল্ডম্যান যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি নিউইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিনের নিয়মিত কলাম লেখক। এছাড়া তিনি মার্কিন কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্স নামক সংস্থার একজন সিনিয়র ফেলো। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থাবলী হচ্ছে: Divided by God, What We Owe Iraq, After Jihad. ২০০৮ সালে প্রকাশিত তাঁর The Fall And Rise Of The Islamic State গ্রন্থটি পাঠকমহলে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এতে তিনি সাম্প্রতিককালে মুসলিম বিশ্বে শরীয়া আইন প্রতিষ্ঠার জনপ্রিয় দাবির বিভিন্ন দিক বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশ্চাত্যের অনেকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে গণতন্ত্রের জন্য হুমকি মনে করছে। আবার সন্ত্রাসীরা তাদের কর্মকাণ্ডকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে যৌক্তিক বলে চালিয়ে দিতে চায়। নোয়াহ ফেল্ডম্যান 'শরীয়া' বলতে আসলে কী বোঝায় এবং ইসলামী বিশ্বে তা সুশাসন ও ন্যায়বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারবে কিনা-এরূপ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছেন।

নোয়াহ ফেল্ডম্যান ট্রাডিশনাল বা ঐতিহ্যিক ইসলামী রাষ্ট্রের আইন কাঠামো এবং ঐতিহ্যের আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, সেখানে নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইনি ব্যাখ্যার মধ্যে আলেম সমাজ তথা ইসলামী পণ্ডিতরা ভারসাম্য বিধান করতেন। কিন্তু তুরস্কে অটোমান শাসনের শেষদিকে এই ভারসাম্যের অবসান সূচিত হয়; ফলে তার পথ ধরে মুসলিম দেশগুলোতে ব্যাপক বিপর্যয় দেখা দেয় এবং ভারসাম্যহীন স্বৈরতন্ত্রের উত্থান ঘটে। তিনি মনে করেন, আধুনিক যুগে ইসলামী রাষ্ট্র ও শরীয়া আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে আবার ভারসাম্যপূর্ণ সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

ফেল্ডম্যানের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক প্রবণতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী আন্দোলনের গতি সে সব দেশে তীব্রতর হচ্ছে। আজ প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে যে, ইসলামী দলগুলোর সফলতা কি বেশি সংখ্যক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকেত দিচ্ছে? এর মাধ্যমে কি গণতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক শরীয়াভিত্তিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন মুসলিম দেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন জোরদার হচ্ছে এবং এতে ইসলামী দলগুলো বেশ সক্রিয় থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, তারা সাংবিধানিক সংস্কার ও গণতন্ত্রায়ণে ইসলামী আদর্শকে সামনে নিয়ে আসতে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চাইবে। তারা ক্রমবর্ধমান হারে সরকারে অংশগ্রহণ করবে এবং নানা রকম সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইসলামী আইনকে কার্যকর করতে প্রয়াসী হবে। তবে আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন ও ইরাকের মত দেশগুলোতে সাংবিধানিক পরিবর্তন সত্ত্বেও হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও বিশৃঙ্খলা চলতে থাকবে, যাতে সরকার ঠিকমত ইসলামী নীতি অনুযায়ী কাজ করতে না পারে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, চরমপন্থা চলতে থাকলে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার তা ব্যাহত হবে।

এখন পর্যন্ত কোথাও ইসলামপন্থীদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা গ্রহণ করতে বা ক্ষমতা গ্রহণ করতে দিলেও ক্ষমতায় থাকতে দেয়া হয়নি। তারা ক্ষমতায় গেয়ে সরকার পরিচালনায় তাদের যোগ্যতা জনগণকে দেখানোর যথেষ্ট সুযোগ পায়নি। সাম্প্রতিক মিসর এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এজন্য জনগণ যে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এমনটি নাও হতে পারে; যেহেতু জনগণ দেখছে যে, তাদেরকে কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না। অন্যদিকে নানা কৌশলে- কূটনৈতিক-রাজনৈতিক-সামরিক শক্তি প্রয়োগ এবং গণমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে যারা পরাস্ত করতে চাইছে, তারা অতি মাত্রায় স্বৈরতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা চর্চা করছে; যদিও দৃশ্যত তারা গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা গ্রহণ করছে। এর উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। এ বাস্তবতায় নিরিখে বলা যায়, ইসলামপন্থীরা যদি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়, তাহলে জনগণ হয়ত তাদেরকেই বার বার ভোট দেবে। তবে তার জন্য তাদের যেমন নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ পন্থায় রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক আন্দোলন নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যেতে হবে, তেমনি সমাজে উপস্থিত নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক সকল শক্তির এ ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতে হবে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন এসে যায় যে, ইসলামপন্থীদের ক্ষমতায় বসানো হলে তারা সত্যিই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে কি? তারা যদি রাজনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে না পারে, তাহলে তাদের অবস্থাও স্বৈরশাসকদের মতই হবে। আর যদি তারা রাজনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তার সমূহ সম্ভাবনাও রয়েছে, সেক্ষেত্রে আরব ও মুসলিম বিশ্বে তাদের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে যাবে। ইসলামপন্থীরা এ কাজ করতে পারবে কিনা তা নির্ভর করবে তারা কতটা সাফল্যের সাথে শরীয়া বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলতে পারবে- তার ওপর। বস্তুত একটি ইসলামী আইনসভা- হোক তা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অথবা জুডিশিয়াল রিভিউ বা বিচারিক পর্যালোচনার ব্যবস্থা সম্বলিত, এরূপ একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থার ওপরই তাদের সাফল্য নির্ভর করবে।

www.pathagar.com

ফেল্ডম্যানের মতে, যে কোন দেশেই নির্বাহী বিভাগের হাতে যখন প্রচুর ক্ষমতা পুঞ্জিভূত থাকে, তখন তাকে আইনের শাসনের আওতায় নিয়ে আসার ব্যাপারটি সাংবিধানিক ব্যবস্থায় জটিল একটি বিষয় বলে পরিগণিত হয়। এজন্য কোনো কোনো জায়গায় পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের দরকার হয়। কোনো দেশের দুর্বল শাসকরা হয়ত তাদের বৈধতার জন্য আইনের শাসনের আওতায় আসতে সম্মত হবে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম দেশেই বিপ্লবের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। এর বিপরীতে ক্রমান্বয়ে সংস্কারের কাজটি ইসলামপন্থীদের জন্য অধিকতর উপযুক্ত বলে মনে হয়। এর মাধ্যমে তারা ক্রমান্বয়ে ইসলামকে আইনগত কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। এর সাথে জুডিশিয়াল রিভিউর ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। যে কোন সমাজে শূন্যস্থানে আইন কার্যকর করা যায় না; এজন্য প্রয়োজন হয় মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং আইনের প্রতি মানুষের আস্থা এবং আইনের অনুশীলন। ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রে এ ধরনের পরিবেশ বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে হয়ত সে অবস্থা পুরোপুরি ফিরিয়ে আনা যাবে না। তবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে বিচারকদের জন্য ইসলামী আইন বিষয়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তবেই এ সব দেশে কিছুটা হলেও সে শূন্যতা পূরণ হবে বলে আশা করা যায়।

বিখ্যাত ইকনোমিস্ট পত্রিকা এই বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছে যে, 'ফেল্ডম্যান সাধারণ পাঠকদের জন্য এই ছোট ও হৃদয়গ্রাহী বইটিতে শত শত বছরের ইসলামী শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেছেন। একই সঙ্গে তিনি আধুনিককালের রাজনৈতিক ইসলাম ও পুরনো ইসলামী শাসনব্যবস্থার পার্থক্যগুলোও চিহ্নিত করেছেন।' ইকনোমিস্টের বিবেচনায় বইটি ২০০৮ সালের অন্যতম সেরা গ্রন্থ। বইটি BESTSELLER-এর পুরস্কারও জিতে নিয়েছে। বইটি প্রকাশ করেছে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস।

বইটির বঙ্গানুবাদ যে সহজ বিষয় নয় পাঠক মাত্রই তা স্বীকার করবেন। বিজ্ঞ অনুবাদক এটিকে সহজবোধ্য করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, সেই সাথে একাজে রিসার্চ সেন্টার ও এর বাইরেও একাধিক ব্যক্তিত্ব এটিকে সম্পাদনা করার ফলে বক্তব্য ও উপস্থাপন হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই মোবারকবাদ, সেই সাথে কামনা করি উভয় জগতের তাদের মর্যাদাপূর্ণ জীবন।

এই বইটি অগ্রসর বাংলাভাষাভাষী পাঠকদের কাছে একটি নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। সবশেষে মহান রব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

ডিসেম্বর ২০১৪

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

মানবসভ্যতার ইতিহাসে কোন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিলুপ্তির পর এর পুনরুত্থান নিতান্তই বিরল। সভ্যতার ইতিহাসে এ ধরনের পুনরুত্থানের উদাহরণ খুঁজে পাওয়া কঠিন। ফারাওদের আমলের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার পুনরাগমন কেউ কল্পনা করে না। ব্যবিলনীয় সভ্যতায় মানবজাতি ফিরে যাবে না। ব্যর্থ প্রমাণিত কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থাতেও ফেরার আগ্রহ তেমন কারো নেই। কিন্তু মানবেতিহাসে দুটো ব্যবস্থা বা আদর্শ হারিয়ে যাওয়ার পর সেগুলোর পুনরাগমন ঘটেছে কিংবা তার পুনরাগমনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। একটি হচ্ছে গণতন্ত্র অন্যটি ইসলামী আদর্শবাদী ব্যবস্থা। গ্রিসের নগর রাষ্ট্র কাঠামোর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরো পরিশীলিত ও ব্যাপকভিত্তিক এবং যুগোপযোগী হয়ে আবারো ফিরে এসেছে এবং সগৌরবে পৃথিবীর নানা দেশে তা বিকশিত হচ্ছে।

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ সা. এর সমসাময়িক অকৃত্রিম ও অবিমিশ্র ক্লাসিক্যাল ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার অন্তত অবশেষটুকু শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গত শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত অটোম্যান বা উসমানিয়া খিলাফতের মাধ্যমে টিকে থাকলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পক্ষে অটোম্যান খিলাফতের অংশগ্রহণ সেটুকুও নিঃশেষ করে দেয়। বিজয়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তাদের সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক স্বার্থের অনুকূলে বিজিত উসমানিয়া সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলে এবং খিলাফত ব্যবস্থাও তুলে দেয়। কামাল পাশা (যিনি কামাল আতাতুর্ক নামেই বেশি পরিচিত) আধুনিক তুরস্ক এবং তুর্কি জাতিরাষ্ট্র গঠন করতে গিয়ে খিলাফত ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটান। তুরস্ক থেকে ইসলামী আইন ও সরকার ব্যবস্থা, শরীয়া তথা শাসন ক্ষমতায় ভ্যরসাম্য রক্ষাকারী হিসেবে আলেম সমাজের ভূমিকা তিনি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করেন। মূলত উসমানিয়া খিলাফত ব্যবস্থার বিলোপের মধ্য দিয়ে শরীয়ার যে ব্যবহারিক- রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক কার্যকারিতা ছিল তা সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলা হয়। এভাবেই বিশ্ব থেকে ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক বিচার এবং শাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে।

সাবেক অটোমান সাম্রাজ্যের অধীন বিভিন্ন অঞ্চল ভেঙ্গে মুসলিম প্রধান যে জাতিরাষ্ট্রগুলোর সৃষ্টি হয় সে সব রাষ্ট্রে মূলত ক্ষমতার ভারসাম্যহীন একচ্ছত্র রাজতন্ত্র কিংবা স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এভাবেই কয়েক দশক অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এরই মধ্যে গত শতকের ত্রিশের দশকে মুসলিম ব্রাদারহুডের উৎপত্তি। যদিও মিসরে মসুলিম ব্রাদারহুড আদর্শিক চিন্তাধারা ভিত্তিক রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলন শুরু করে তবে বিভিন্ন মুসলিম প্রধান দেশ বিশেষত আরবী ভাষী অঞ্চলগুলোতে তা বিস্তৃতি লাভ করে এবং বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বিকশিত হতে থাকে।

আজকে মধ্যপ্রাচ্যের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের প্রতিক্রিয়ায় জনগণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শরীয়াভিত্তিক শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিই বেশি আস্থা প্রকাশ করছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষত পাকিস্তানের জনগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করে তাদের দেশের আইনের উৎস হওয়া উচিত ইসলামী শরীয়া। এরা নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন করছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূল আধুনিক শরীয়াভিত্তিক রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলে। এরা তাদের পরিকল্পনাকে ইঙ্গিত করতেই প্রতীকী অর্থে জাস্টিস শব্দটি ব্যবহার করতে পছন্দ করে। যুদ্ধোত্তর আফগানিস্তান এবং সাদ্দাম উত্তর ইরাক শরীয়াকে সম্মান জানিয়েই শাসনতন্ত্র বলবৎ করেছে। কাজেই এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, গণতন্ত্রের পুনরাগমনের পর ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থারই পুনরাগমন ঘটতে যাচ্ছে।

ইসলামপন্থী গোষ্ঠিগুলো আলেমসমাজ ভিত্তিক ক্লাসিক্যাল ইসলামী শরীয়াভিত্তিক শাসনতন্ত্রের কথা বলে না; তবে এরা সার্বিক বিচারে একটি ন্যায়ভিত্তিক আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থে শরীয়াভিত্তিক শাসনতান্ত্রিক এবং বিচারিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথাই বলে। তবে সামরিক জান্তা কিংবা দেশিবিদেশি শক্তির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে ক্ষমতার কাছাকাছি গিয়েও ইসলামপন্থীদের ক্ষমতা থেকে ছিটকে পড়তে হয়েছে। সাম্প্রতিক মিসর ও আলজেরিয়া এর জ্বলন্ত উদাহরণ। বস্তুত আধুনিক শরীয়াভিত্তিক রাজনৈতিক শক্তিকে কখনো স্বাভাবিক ভাবে ক্ষমতা চর্চার সুযোগ দেয়া হয়নি। তবে এটাও সত্য, ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করে ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে সফল হতে চাইলে ইসলামপন্থীদের আরো বহু পথ অতিক্রম করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। তবে প্রত্যাশিত সে সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুযোগ তারা আদৌ পাবে কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন।

এ সব কথাই তুলে ধরা হয়েছে নোয়াহ ফেল্ডম্যান-এর ব্যতিক্রমী রচনাকর্ম 'দি ফল এন্ড রাইজ অব দ্যা ইসলামিক স্টেট' গ্রন্থে। বইটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে

www.pathagar.com

অসাধারণ তবে একটু জটিল হলেও চিন্তাশীল পাঠকদের জন্য এতে রয়েছে মূল্যবান তথ্য ও উপাত্ত এবং চিন্তার গভীর খোরাক। সেই সাথে এতে রয়েছে যে কোন সচেতন মুসলিমের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। বইটির উপযোগিতার কথা চিন্তা করে এটি অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার। বইটির অনুবাদকর্ম আমার জন্য ছিল সত্যিই চ্যালেঞ্জিং বিষয়। আমি চেষ্টা করেছি সে চ্যালেঞ্জ জয় করতে। জানি না কতটুকু সফল হয়েছি। সে বিচারের ভার পাঠকের হাতেই রইল।

বিষয়বস্তুর বিবেচনায় এটি কোন হালকা সাহিত্যকর্ম নয়। আমার কাজের ব্যস্ততা অন্যদিকে বইটির উপস্থাপনায় লেখকের মুন্সিয়ানার কারণে অনুবাদ কাজে আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে; সময় সময় কিছুটা হতোদ্যমও হয়েছি। কিন্তু ল' রিসার্চ সেন্টার এর ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বন্ধুবর শহীদুল ইসলাম-এর নিরন্তর উৎসাহ, উপর্যপুরি তাগাদা ও অনুরোধ এবং আরো অনেক বিদগ্ধজনের উৎসাহ ও দিকনির্দেশনা আমাকে এই দুরূহ কাজে উৎসাহ যুগিয়েছে। লেখকের শব্দচয়ন, জটিল বাক্যবিন্যাস এবং বিষয়বস্তুর সূক্ষ্মতা মেনে নিয়েই আমি একে সহজপাঠ্য করার চেষ্টা করেছি। আমাকে বইটি অনুবাদে অসামান্য সহযোগিতা করেছেন আমার সহকর্মী ও শ্রদ্ধেয় জনাব মোল্লা আবুল ফিদা মোহাম্মদ আহনাফ। তাঁকে মহান আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন। বইটি পাঠকদের কিছুমাত্র উপকার করলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। মহান আল্লাহ আমাদের এই চেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

বিনীত
মুহাম্মদ রাশেদ
ডিসেম্বর ২০১৪

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

প্রকাশকের কথা ৭
অনুবাদকের কথা ১১
লেখকের ভূমিকা ১৭

প্রথম অধ্যায়

সঠিক কী ঘটেছিল? ৩৯
নতুন ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ডাক ৩৯
ইসলামী আইনের উৎপত্তি ৪২
রাসূলুল্লাহ স.-এর উত্তরাধিকারী ৪৮
উলামা ও খলীফা ৫১
আইন সংরক্ষণ : সংকট ও সমাধান ৬২
আইন শৃঙ্খলা ৬৭
আইনি বৈধতা এবং আমলাতন্ত্র ৭৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

পতনোন্মুখ অবস্থা এবং চূড়ান্ত পতন ৮৭
আইনি সংস্কার এবং আইনের সূত্রবদ্ধকরণে সমস্যা ৮৯
শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন : আলেমদের পরিবর্তে নতুন শ্রেণী ৯৯
হারানো আইনসভা ১০৭
আইন প্রণয়নকারী রাষ্ট্র এবং শরীয়া ১১০
নির্বাহীর প্রাধান্য ও প্রভাব ১২১
সউদী ব্যতিক্রম ১২৫

তৃতীয় অধ্যায়

নতুন ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার উত্থান ১৩৯
আধুনিকতাবাদী ভাবাদর্শ হিসেবে ইসলামিজম ১৩৯
ইসলামপন্থী শরীয়া এবং ইসলামী শরীয়া : ন্যায়বিচারের প্রশ্নে ১৪৭

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
শরীয়ার গণতন্ত্রায়ণ?	১৫৫
শরীয়ার শাসনতান্ত্রিকীকরণ	১৬০
ইসলামপন্থী শাসনতান্ত্রিক মডেল : সম্ভাবনাময় না কি নিষ্ফল?	১৬৪
ইরানী ধারা	১৬৬
আলেমদের দ্বারা শাসন	১৭৬
সর্বশেষ আশ্রয় হিসেবে শরীয়া	১৮১
ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার ভবিষ্যৎ	১৮৪

উপসংহার

ইসলামিজম, প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান এবং আইনের শাসন	১৯১
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	১৯৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখকের ভূমিকা

সাধারণত যখন কোন সাম্রাজ্যের পতন হয় তা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। যে কোন সরকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। আমেরিকায় বিপ্লবের পর থেকে বিশ্বে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমশ পতনের দিকে যেতে থাকে। বর্তমানে বিশ্বের কোথাও নতুন করে রাজতন্ত্রের উত্থানের কথা কল্পনা করাও কঠিন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সোভিয়েত ব্লকের পতন ছিল কম্যুনিজমের মৃত্যুর শামিল; এর মধ্য দিয়ে কম্যুনিজমের পতন হয়েছে। এখন কেউ আর কার্ল মার্কসের প্রত্যাবর্তন কামনা করে না। এমন কি চীনের বর্তমান শাসক দলও মূলত নামে মাত্র কম্যুনিস্ট (Communist)।

তবে বর্তমানে দুটি শাসন ব্যবস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের কথা বলা যায়, যেগুলো দৃশ্যত বিলুপ্ত হয়ে যাবার পর পুনরায় এগুলোর উত্থান ঘটেছে। একটি হচ্ছে গণতন্ত্র। ক্ষুদ্র গ্রীক নগর-রাষ্ট্রে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত সীমিত আকারে যার সাফল্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। গ্রীক নগর রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র পরিসরের সে গণতন্ত্র বিলুপ্ত হওয়ার প্রায় দু' হাজার বছর পর পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। পুনর্জীবনদানকারীরা অ-গ্রীক; যারা গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের পরিবেশ থেকে একেবারে ভিন্ন পরিবেশে বাস করতেন। এঁদের কাছে গণতন্ত্র হচ্ছে দর্শনশাস্ত্রের একটি তাত্ত্বিক পরিভাষা বিশেষ, যা কেবল উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত উপায়ে গুরুত্বপূর্ণ পুনঃব্যাখ্যাসহ প্রয়োগযোগ্য। অন্য শাসনব্যবস্থাটি হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা।

নিজেদের রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদীনায় নবী মুহাম্মাদ স. এবং তাঁর সঙ্গীদের হিজরতের পর থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পর পর্যন্ত প্রায় তের শত বছর ইসলামী সরকারগুলো দুর্গবেষ্টিত নগর থেকে শুরু করে আন্তঃমহাদেশে বিস্তৃত সাম্রাজ্য শাসন করেছে। এ সব রাষ্ট্র সময়, স্থান ও আকারের দিক দিয়ে একটি আরেকটি থেকে ভিন্ন ছিল। এগুলো এতটাই ইসলামী ভাবাপন্ন ছিল যে, এগুলো নিজেরাই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট ছিল; এর জন্য আলাদা কোন বিশেষণের প্রয়োজন ছিল না। কয়েক শতকের পথ-পরিক্রমায় সৃষ্ট ও বিকশিত একটি সাধারণ সাংবিধানিক তত্ত্ব সর্বত্র বিরাজমান ছিল। যে কোন মুসলিম শাসক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী দেশ শাসন করেছেন।

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য স্রষ্টার আইন বা বিধানকে শরীয়ার মূলনীতি ও বিধিবিধানের মাধ্যমেই তুলে ধরা হয়েছে। আর এগুলোকে ইসলাম বিষয়ক মুসলিম পণ্ডিত (অর্থাৎ আলেম সমাজ) ব্যাখ্যা করেছেন। আইন যা করতে বলেছে তা করার আদেশ দিয়ে এবং যা করতে নিষেধ করেছে তা করতে নিষেধ করার মাধ্যমে নিজের দায়িত্ব পালন করে শাসকরা নিজ কর্তৃত্বকে আইনসম্মত ও বৈধ করেছেন।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এসে ইসলামী সরকারগুলো লক্ষণীয়ভাবে বিলুপ্তির পথে যেতে শুরু করে। সে সময় তুরস্কভিত্তিক উসমানিয়া সাম্রাজ্য বা অটোমান সাম্রাজ্যের শাসক নিজেকে খলীফা হিসেবে ইসলামী বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে দাবি করতেন। তিনি দেশের ভেতরের সংস্কারকদের উৎসাহে এবং পাশাপাশি পশ্চিমা ঋণদাতাদের দাবির প্রেক্ষিতে শাসন-ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন সংস্কারমূলক ব্যবস্থা চালু করেন। এ ধরনের সংস্কারের পর আনুষ্ঠানিকভাবে উসমানিয়া সাম্রাজ্য ইসলামী সাম্রাজ্য হিসেবে যদিও বহাল ছিল, প্রকৃতপক্ষে তাতে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন, আইনসভা ও আইনসভা দ্বারা অনুমোদিত কোডিফাইড বা সূত্রবদ্ধ আইন প্রচলনের কথা বলা যায়। এগুলোর প্রচলন করে মূলত ট্রাডিশনাল বা ঐতিহ্যবাহী এবং অলিখিত ইসলামী শাসনতন্ত্রের ভিত্তিমূলে পরিবর্তন সাধন করা হয়, যা ট্রাডিশনাল ইসলামী শাসনামলে বিদ্যমান এবং কার্যকর ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয়ের পরিণতিতে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের পতন হওয়ার পর এর আওতাধীন ভূখণ্ড সরাসরি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স দ্বারা শাসিত হতে থাকে- এ কথা না বললেও, এটা বলা ভুল হবে না যে, পশ্চিমা প্রভাব বলয়ে এই দুই বিজয়ী শক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী এর ভূখণ্ডকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলা হয়। উসমানিয়া সাম্রাজ্যের অধীন আনাতোলিয়ার যে অবশিষ্টাংশ ছিল সেখানে নতুন তুর্কি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন সরকার নিজেদেরকে 'সেক্যুলার' বলে ঘোষণা করে এবং খিলাফত ব্যবস্থার বিলোপ ঘটায়। এর মধ্য দিয়ে মূলত প্রতীকী ও বাস্তব উভয় অর্থে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার মৃত্যু ঘটে।

তবে এখন ইসলামী রাষ্ট্রের আবার উত্থান ঘটছে। এ ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি ও বিস্তৃতি কেবল ত্রুটিবিচ্যুতি বা অনিয়ম চিহ্নিত করার মধ্যে সীমিত নয়; এর ভূমিকা আরো গভীরে। যেমন সউদী আরবের কথা বলা যায়। সউদী আরব দাবি করে, প্রাচীন ইসলামী সংবিধানই তারা নিখুঁতভাবে অনুসরণ করছে। অন্যদিকে মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশসমূহের সরকারগুলো ক্রমবর্ধমান হারে বিপ্লবের মাধ্যমে নিজেদেরকে ইসলামী বলে ঘোষণা করছে; যেমন ইরানের কথা বলা যায়। আবার ইরাক ও আফগানিস্তানের কথা বলা যায়, যারা

www.pathagar.com

ইসলামী শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে গণভোটের মাধ্যমে রায় নিয়েছে। এসব দেশে সাংবিধানিক শাসনের মাধ্যমে গত শতকের সেক্যুলার ব্যবস্থার পরিবর্তে কোনো না কোনোভাবে শরীয়াভিত্তিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রবণতা তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া সর্বত্র মুসলিম দেশগুলোর জনগণের উল্লেখযোগ্য অংশই বলছে শরীয়া তাদের নিজ নিজ দেশের আইনের অন্যতম উৎস হওয়া উচিত। আবার গুরুত্বপূর্ণ জনসংখ্যাবহুল দেশ, যেমন, মিসর ও পাকিস্তানের জনগণের বৃহৎ অংশ বলছে তাদের দেশে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী আইন একমাত্র উৎস হওয়া উচিত।[১] মুসলিম দেশগুলোর যেখানেই গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানেই জনগণের একটি বৃহৎ অংশ শরীয়াভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে ভোট দিচ্ছে, যাদেরকে ইসলামপন্থী হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। এসব দলের কর্মসূচি এক দেশ থেকে আরেক দেশে খুব বেশি ভিন্ন নয়। তারা গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও মৌলিক অধিকারগুলোকে গ্রহণ করে। তারা অর্থনৈতিক সংস্কারের অঙ্গীকার করে; তারা দুর্নীতি নির্মূল করার কথা বলে। সবচেয়ে বড় কথা, তারা শরীয়াকে আইনের অন্যতম অথবা একমাত্র উৎস হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলে।[২]

---

১. গ্যালপ ওয়ার্ল্ড পল (Gallup World Poll), Islam and Democracy পাওয়া যাবে এই ওয়েব সাইটে : http://media.gallup.com/ MuslimWest Facts/ PDF/GALLUPMUSLIMSTUDIESIslamandDemocracy030607rev.pdf. মিসরে শতকরা ৬৬ ভাগ ও পাকিস্তানে ৬০ ভাগ জনগণ শরীয়াকে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একমাত্র উৎস বানানোর দাবি জানায়। জর্ডানে এই সংখ্যা শতকরা ৫৪ ভাগ। আরো সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্বাচনী উপাত্ত দেখার জন্য দ্রষ্টব্য 'Revisiting the Arab Street from Within,' সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ, আম্মান, জর্ডান (ফেব্রুয়ারি ২০০৫), পৃ. ৫২-৫৫; পাওয়া যাবে এই ওয়েবসাইটে: http://www.jcss.org /SubDefault. aspx?PageId=37&PollId=140&PollType=3
সরকারে শরীয়ার প্রয়োগ বা ব্যবহার বিষয়ে মনোভাব সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন : ন্যান্সি জে ডেভিস এবং রবার্ট ভি রবিনসন, The 'Egalitarian Face of Islamic Orthodoxy : Support for Islamic Law and Economic Justice in Seven Muslim Majority Nations', দ্রষ্টব্য *Values and Perceptions of the Islamic and Middle Eastern Publics*, সম্পাদনা মনসুর মুয়াদ্দেল (নিউইয়র্ক : প্যালগ্রেভ ম্যাকমিলান, ২০০৭), পৃ. ১২৬-৫৯

২. এ গ্রন্থের সর্বত্র যেখানেই আমি 'ইসলামপন্থী' (Islamist) বা 'ইসলামিজম' (Islamism) শব্দ ব্যবহার করেছি আমি মনে মনে ইঙ্গিত করেছি মূলধারার সুন্নী মুসলিম কর্মীর প্রতি, যারা শিথিলভাবে হলেও আন্তর্জাতিক মুসলিম ব্রাদারহুডের আদর্শের সমর্থক। 'ইসলামই সমাধান' এ শ্লোগানের অধীনে ব্রাদারহুড ব্যাপক অর্থে নির্বাচনমুখী রাজনীতি

www.pathagar.com

গ্রহণ করেছে। বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতেও এরা সহিংসতা পরিহার করেছে। এমনকি যাদেরকে ইরাক ও ফিলিস্তিনে জবরদখলকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় তাদের বিরুদ্ধেও এরা সহিংসতার পথ পরিহার করেছে। রেডিক্যাল বা গোঁড়া ইসলামপন্থী হচ্ছে তারা, যারা যে কোন রকম গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রত্যাখ্যান করে। অন্যদিকে উদারপন্থী ইসলামপন্থীরা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার অনেক লক্ষ্যই গ্রহণ করে, তবে তারা মূলধারার ইসলামপন্থীদের চেয়ে শরীয়ার আরো উদার ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে। মূলধারার ইসলামপন্থী আন্দোলন বিষয়ে বিভিন্ন দাবির সপক্ষে আমি মুসলিম ব্রাদারহুডের ওয়েবসাইট এবং এর আন্তর্জাতিক সহযোগী উৎস থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন দলিল বা ডকুমেন্টের উদ্ধৃতি দেব। এই সাইটগুলো দ্রুত পরিবর্তনশীল। কাজেই আমি সাইটগুলোতে দলিলগুলোর যে শিরোনাম পেয়েছি সেভাবেই শিরোনামগুলো ব্যবহার করেছি এবং যেখানে সম্ভব হয়েছে হালনাগাদ URL দিয়েছি। যেখানে ওয়েবসাইটে এ সমস্ত লেখা ইংরেজিতে পেয়েছি সেগুলো যেভাবে আছে কোন ব্যাকরণগত বা উচ্চারণগত সংশোধনী ছাড়াই সেগুলো আমি উপস্থাপন করেছি। আর যেখানে লেখাটি আরবীতে রয়েছে সেখানে এ বিষয়ে বলে দেয়া হয়েছে এবং তার অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এই দলিল বা ডকুমেন্টের শিরোনাম দ্রষ্টব্য : 'The Principles of Muslim Brotherhood: The Introduction of the Islamic Shari'a as the basis controlling the affairs of state and society'; এগুলো হচ্ছে ব্রাদারহুডের আহ্বানের প্রথম মূল বিষয়। 'The Principles of Muslim Brotherhood', *IkhwanWeb.com*, জুন ৮, ২০০৬, http://www.ikhwanweb.com /Article.asp? ID=813&LevelID =2&SectionID =116. 'Muslim Brotherhood Initiatives for Reform in Egypt' নামের শিরোনামে রাজনৈতিক সংস্কারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে-'রাজনৈতিক সংস্কার হচ্ছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সংস্কারের সূচনা, যে জীবনধারায় মিসর ও আরবে এবং ইসলামী দুনিয়ায় প্রায় সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত দ্রুত অবক্ষয় ঘটেছে।' *IkhwanWeb.com*, জুন ১০, ২০০৭, http:// www.ikhwanweb.com /Article.asp? ID=797&SectionID=-1&Searching=1.

শরীয়ার ব্যাপারে একই ডকুমেন্টটি ব্রাদারহুডের মিশন উপস্থাপন করেছে; অর্থাৎ সেখানে বলা হয়েছে যে, 'আল্লাহর শরীয়াকে যেভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে, এটি অভ্যন্তরীণ ও বহির্মুখী; এ উভয় ক্ষেত্রে সকল প্রকার কষ্ট ও সমস্যা, তা রাজনৈতিক হোক বা অর্থনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক যে কোন রকম হোক না কেন, এ সব সমস্যা থেকে মুক্তির বাস্তব ও কার্যকর উপায়- ব্রাদারহুড এই অর্থে শরীয়াকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাজ করে। এ মিশন অর্জিত হতে পারে মুসলিম ব্যক্তি গঠনের মাধ্যমে, ব্যক্তি থেকে মুসলিম পরিবার এবং পরিবার থেকে মুসলিম সরকার এবং সরকার থেকে মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে। মুসলিম রাষ্ট্র মুসলিম দেশ গঠন করবে যেখানে সকল মুসলিম একত্র হবে, ইসলামের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করবে, হারানো মুসলিম ভূমি পুনরুদ্ধার করে তার মালিকের কাছে ফেরত দিবে এবং আল্লাহর আহ্বানের পতাকা বহন করবে। এভাবে ইসলামের শিক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সারা বিশ্বকে সুখী করবে। মুসলিম ব্রাদারহুড হিসেবে এটি আমাদের লক্ষ্য, এটি আমাদের পদ্ধতি।' আরো দেখুন 'The

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলন নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত। তবে এটাও সত্য যে, এ আন্দোলন ভবিষ্যৎমুখীও। যারা নতুন ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকারী, যারা এর পক্ষে কথা বলে, তারা পুরনো ঐতিহ্যবাহী ইসলামী রাষ্ট্রের সে মৌলিক উপাদানটুকু পুনঃআয়ত্ব করতে চায় যা একে মহান করে তুলেছিল। তারা যুগপৎ শরীয়ার প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করে, পাশাপাশি গণতন্ত্রের প্রতি তাদের আগ্রহের কথাও বলে।[৩] এর অর্থ হচ্ছে, নতুন ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা অতীতের ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে ভিন্ন হবে। এখানে ইতিহাসের চাকা পেছনে ঘোরানোর কিছু নেই; কে কী বলল সেটি কোন বিষয় নয়।

ইসলামপন্থীদের লক্ষ্য যুগপৎ ধর্মীয় ও পার্থিব। সত্যি বলতে কি তারা স্রষ্টার অভিপ্রায়ের অনুসরণ করতে চায়। তবে পাশাপাশি তারা স্পষ্টতই বলে, তারা ন্যায়ভিত্তিক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বৈশ্বিক গুরুত্ব পুনরুদ্ধার করতে চায়। এ সব ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এগুলো বাস্তবায়নের সম্ভাবনা না থাকলে ইসলামপন্থীরা হয়ত খুব সামান্য জনসমর্থন পেত অথবা একেবারেই জনসমর্থন পেত না। সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বে সাধারণ ভোটার থেকে শুরু করে এলিট শ্রেণী পর্যন্ত রাজনৈতিক ভূমিকা পালনকারী (Political actor) সব পক্ষ ইসলামকে সরকারের ভিত্তি হিসেবে ততটুকু পর্যন্ত গ্রহণ করতে

Electoral Programme of the Muslim Brotherhood for Shura Council in 2007',http://www.ikhwanweb.com/ Article.asp?ID=822&LevelID=1&SectionID=116. আরো দেখুন জর্ডানের পার্লামেন্ট নির্বাচন ২০০৩ এর জন্য ইসলামিক এ্যাকশন ফ্রন্টের কর্মসূচি, http://www.jabha.net/body7.asp?field=jbh%20&id=2.

৩. গণতন্ত্রের ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে 'Muslim Brotherhood and Democracy in Egypt' নামক আলোচনায়, যা এই ওয়েবসাইটে পাওয়া গেছে: *IkhwanWeb.com*, জুন ১৩ ২০০৭, http://www.ikhwanweb.com /Article.asp?ID=808 &SectionID=-1&Searching=1. আরো দেখুন মুসলিম ব্রাদারহুড এর ডেপুটি চেয়ারম্যান ড. মাহমুদ হাবিবের বিবৃতি যার শিরোনাম 'Democracy is Our Choice Toward a Civil State', *IkhwanWeb.com*, জুন ১৩, ২০০৭, http://www.ikhwanweb.com /Article.asp?ID=807&SectionID=-1&Searching=1. এ ছাড়া দেখুন 'The Principles of Muslim Brotherhood', এখানে ১৫টি মূলনীতি আলোচনায় এসেছে, যেগুলো হচ্ছে মুসলিম ব্রাদারহুডের 'গণতান্ত্রিক মূলনীতির সংক্ষিপ্তসার' (Compendium)। *IkhwanWeb.com*, জুন ৮, ২০০৬, http://www.ikhwanweb.com/ Article.asp?ID=813&LevelID= 2&SectionID=116. আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে ইসলামী শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন (Islamic Constitutional Movement), 'Who are We' 'আমরা কারা?' আরবীতে পাওয়া যাবে এই ওয়েবসাইটে: www.icmkw.org

www.pathagar.com

প্রস্তুত যেখানে রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়ে বর্তমানে কঠিন অবস্থার মুখোমুখী হয়েছে এবং যেখানে ইসলাম বাস্তবিক কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারবে বলে তারা বিশ্বাস করে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে নতুন ইসলামী রাষ্ট্র সফল হতে পারবে কি? এ প্রশ্ন অনেক কিছুর ইঙ্গিত বহন করে। বস্তুত এ প্রশ্ন মুসলিম দেশগুলোর জনগণ এবং মুসলিম বিশ্বের সাথে কোন না কোন ভাবে জড়িত বিশ্বের বাকি অংশের জন্য অনেক কিছুর ইঙ্গিত বহন করে। পাশাপাশি এ প্রশ্ন এবং যে আন্দোলন ইসলামকে রাজনৈতিক সমাধানের উপায় বলে দাবি করে এসেছে এদের সকলের জন্য অনেক কিছুর ইঙ্গিতবহ। এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে দরকার সে শ্লোগান সম্পর্কে অবগত হওয়া, যা এ প্রশ্নের উত্তর কেন্দ্রিক বিতর্কের পক্ষ-বিপক্ষ উভয় দিককে স্পষ্ট করে। প্রথমত আমাদের দরকার অতীতের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পতনোন্মুখ হয়ে বিলুপ্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত শত শত বছর ধরে এ ব্যবস্থা এত চমৎকারভাবে কেন এবং কিভাবে কাজ করেছে সে বিষয়টি উপলব্ধি করা। এগুলো স্পষ্ট হয়ে যাবার পরই আমরা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখব কেন ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণা বর্তমানে এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। বস্তুত তখনই আমরা চিহ্নিত করতে পারব, নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামী রাষ্ট্র অতীতের সে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী রাষ্ট্রের কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে পারছে কি-না, যে বৈশিষ্ট্যগুলো আত্মস্থ করতে পারলে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা ঠিক মত কাজ করতে পারবে এবং সফল হবে। সবচেয়ে বড় কথা, আমরা তখন নতুন ইসলামী রাষ্ট্রটির সামনে কী কী চ্যালেঞ্জ আসতে পারে তা চিহ্নিত করতে পারব। এই চ্যালেঞ্জই নতুন রাষ্ট্রটির নিজ নাগরিক এবং বাকি বিশ্বের সাথে তার আচরণ কেমন হবে তার প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেবে।

ইসলামের শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের নতুন ব্যাখ্যা

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন এবং এর অভাবিত পুনর্জন্ম বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। অবশ্য কেবল ঐতিহাসিক দিক থেকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বরং ইসলামের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থা একটি তুলনামূলক ব্যাখ্যা তুলে ধরতে চাই যা মুসলিম বিশ্বের সরকার সম্পর্কে আমাদের বর্তমান অবস্থান এবং আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা স্পষ্ট করবে। ভবিষ্যত ইসলামী রাষ্ট্র কেমন হবে সেটা একান্তই গঠনের পর্যায়ে রয়েছে। তবে এর অতীতও তাই, এত দীর্ঘ সময় পার হলেও যার গঠন প্রক্রিয়া

www.pathagar.com

শেষ হয়নি; যেহেতু এর অর্থ কী তা নিয়ে এখনও বিতর্ক হচ্ছে এবং এর ফলাফল কী তা এখনও স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়নি।

এ অর্থে আমি সেসব মুসলিমের যুক্তি ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করি, যারা সমসাময়িক প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সফল হওয়ার মত শক্তিসম্পন্ন এক ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনর্গঠিত করতে চেষ্টা করছেন। এদের কাছে ইসলামী রাষ্ট্রের অতীত মৃত নয় বরং জীবন্ত; যার উপর ভিত্তি করে নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্মিত হবে বলে তারা আশা করেন। এদের মতে, মধ্যযুগের বিদ্বান পণ্ডিতেরা, যাঁদের চিন্তাধারা (Idea) সম্পর্কে আমি বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করব; এতটাই দীপ্তিমান ছিলেন যেন তাঁরা আজও জীবিত; তাঁদের রচনা ও জীবন এদের কর্মের দিকনির্দেশনা দান করে চলেছে।

ইসলামের শাসনতান্ত্রিক অতীতের সাথে বর্তমানের মুসলিমের এরূপ সক্রিয় ও সার্বক্ষণিক সম্পর্ক বা যোগাযোগ মুসলিমদের কাছে নতুন কিছু নয়। শুধু মুসলিম কেন, আমেরিকার কথাই ধরা যাক। ম্যাডিসন, জেফারসন ও হ্যামিলটন তাঁদের মৃত্যুর পরও সে দেশের শাসনতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে আজও সার্বক্ষণিকভাবে রূপদান করে যাচ্ছেন। এ সব প্রতিষ্ঠাকালীন ব্যক্তিত্বকে বিবেচনায় না রেখে বর্তমান আমেরিকার সংবিধান বোঝা অসম্ভব এবং এ ব্যাপারটি সে দেশে শাসনতান্ত্রিক বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে এমন কথা কেউ চিন্তাও করবে না। তবে এ সব সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কিত বহু গবেষণা ও বিশ্লেণে দেখা গেছে যে, মুসলিমদের ঐতিহাসিক অতীত এবং ভবিষ্যৎমুখী রাজনৈতিক বিশ্লেষণ- এ দুয়ের মাঝে এক ধরনের কৃত্রিম বিভাজন বা ব্যবধান রয়েছে। মুসলিমদের ঐতিহাসিক অতীত পেশাগত ঐতিহাসিকদের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। অন্যদিকে ভবিষ্যৎমুখী রাজনৈতিক বিশ্লেষণ নিয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং চিন্তক শ্রেণী (Think Tank) বা সরকারি বিশ্লেষকদের মাঝে বিভক্তি রয়েছে।

মুসলিম বিশ্বের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে অতীত ইতিহাস ও বর্তমানের মাঝে যে বিভাজন তার অন্যতম কারণ হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন। সন্দেহ নেই, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতনের কারণে অতীতের সঙ্গে সাধারণ মুসলিমদের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটেছে এবং খিলাফত সত্যই বিলুপ্ত হয়েছে। অতীতের সঙ্গে এই সম্পর্কেচ্ছদকেই অনেক সময় 'আধুনিকতা' বলে আখ্যায়িত করা হয়। যা হোক, যেমনটি আমরা আমাদের সামনের আলোচনায় দেখব যে, এভাবে অতীতের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ এবং খিলাফতের বিলুপ্তির ফলে শরীয়া দৃশ্যত তার শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়েছে। পাশাপাশি আলেম বা

www.pathagar.com

ইসলামী পণ্ডিতগণ, যারা ছিলেন আইনের রক্ষক, তাদেরও মর্যাদার অবনতি ঘটানো হয়েছে এবং তাদেরকে কক্ষচ্যুত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পুরনোর স্থলে যে নতুন রাষ্ট্রগুলোর উদ্ভব হয়েছে সেগুলো তাদের পূর্বসূরীদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার কথাও ঘোষণা করেছে।

আমাদের এ বইটিতে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ও পুনরুত্থান কাহিনীর বর্ণনায় উপরের এ সমস্ত ঘটনা মূল ভূমিকা পালন করবে। এ আলোচনায় ইতিহাসের অমোঘ বিধান 'মৃত সাম্রাজ্য পুনর্জীবিত হয় না' এ কথাটি যদি আমরা চূড়ান্ত বলে ধরে নেই, তাহলে নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দিকটি রয়েছে অর্থাৎ পুরনো ইসলামী রাষ্ট্রের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করার আকাঙ্ক্ষার দিকটি হয়ত আমরা ধরতে পারব না। এ আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নতুন ইসলামী রাষ্ট্রকে অতীত ও বর্তমানের মাঝের বিভাজনকে কাটিয়ে আরো সামনে অগ্রসর হতে হবে। নতুন ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবক্তারা এ ধরনের রাষ্ট্রের কথাই ভেবেছেন।

আমি প্রথম অধ্যায় শুরু করেছি এ প্রশ্ন রেখে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা তাদের কাছে কেন এত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠল যাদের পূর্বপুরুষরা একে ব্যর্থ অতীতের স্মৃতিচিহ্ন বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এর ব্যাখ্যায় আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে, শরীয়া আইনে ফিরে যাওয়ার ডাক বা অন্য কথায় এর প্রতি উৎসাহী হওয়ার ব্যাপারটি একটি জটিল ও বহুমুখী বিষয়; এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের ভূমিকা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সেক্যুলার স্বৈরতন্ত্রের ব্যর্থতা অন্যতম। এ ছাড়া এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রয়েছে বর্তমান অনিশ্চিত বিশ্বে সামাজিকভাবে রক্ষণশীল ধর্মের আবেদন এবং আধ্যাত্মিক প্রাণ-সঞ্চারণের জন্য মানুষের তীব্র আকাঙ্ক্ষার। বস্তুত খোদ 'শরীয়া' শব্দটিই অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান এবং যৌন আচরণ বিশেষত মহিলাদের যৌন আচরণের ক্ষেত্রে নৈতিক বিধিনিষেধ আরোপ করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণশীলতার ভাব-ব্যঞ্জনাকে নিজের মধ্যেই ধারণ করে রেখেছে। বলা বাহুল্য, শরীয়া আইন বাস্তবায়নের পক্ষে যারা কথা বলেন তাদের অনেকেই এ বিষয়গুলো অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত। তবে এখানে যে ব্যাপারটি কমই লক্ষ্য করা হয় সেটা হচ্ছে, অতীত ইসলামের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থেকে মূলত শরীয়া আইনের মূল কথাটি বা মূল সুরটিকেই শরীয়ার আদর্শ তার নিজের মধ্যে ধারণ করে রেখেছে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানত একটি শরীয়াভিত্তিক রাষ্ট্র যা আইনি শৃঙ্খলার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।[৪] যে

৪. নাথান ব্রাউন (Nathan Brwon), *The Rule of Law in the Arab World : Courts in Egypt and the Gulf* (ক্যামব্রিজ : ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৭),

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রটি ক্লাসিক্যাল বা ঐতিহ্যগত ইসলামী শাসনতন্ত্রের আওতায় ঐতিহাসিকভাবে সুবিন্যস্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, (যে শাসনতন্ত্রটি ইংল্যান্ডের শাসনতন্ত্রের মতই ছিল অলিখিত ও ক্রমবিকাশমান), সেটি 'আইনসম্মত' কথাটির উভয় অর্থেই একটি আইনসম্মত রাষ্ট্র ছিল।[৫] কেননা রাষ্ট্রব্যবস্থাটি ছিল আইন দ্বারা সমর্থিত এবং এটি আইনেরই অধীনে মৌলিক সরকার পরিচালনা করেছিল।[৬]

পৃ. ১১ (ইসলামী শরীয়া প্রয়োগের আহ্বানের যে জনপ্রিয়তা তা আইনের শাসনের প্রতি নানাভাবে সৃষ্ট সার্বক্ষণিক আকর্ষণ থেকে সরাসরি উদ্ভূত হয়েছে)

৫. টার্মিনোলজি (Terminology) বা পরিভাষা কথাটি একাডেমিক বিতর্কের একটি বিষয় এবং এটি এর পরিধির মধ্যেই মূলত সীমিত। আরো গভীরভাবে বলতে গেলে এটি হচ্ছে পিরিওডাইজেশন (Periodization) বা সময়কাল নিরূপণের বিষয়, যে বিষয়টি একান্তই ইতিহাসবিদদের বিচরণস্থল। তবে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ও বিকাশ সম্পর্কিত কোন গ্রন্থে এ সব বিষয় সম্পূর্ণ এড়ানো যায় না। এতে আরো বাড়তি কিছু সংযোজন করার কোন ইচ্ছা আমার নেই। আমি যখন ঐতিহ্যবাহী বা ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বলেছি, তখন আমি এমন এক শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বলতে চেয়েছি যা বহু শতাব্দীর পথ পরিক্রমায় পরিবর্তিত হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করেছে এবং যা এখনও কোথাও কোথাও কিছুটা হলেও চালু আছে। কখন এ শাসনতন্ত্র স্বীকৃতি পাওয়ার মত অবস্থায় উন্নীত হয়েছিল তা বলা মুশকিল। নিশ্চিতভাবে আব্বাসী খলীফাগণ একে পরিষ্কার স্বীকৃতি দিয়ে থাকবেন এবং সম্ভবত উমাইয়া খলীফাগণও এ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এর পূর্বের একেবারে প্রাথমিক পর্যায় সম্পর্কে গঠনমূলক ও সুবিন্যস্ত কিছু বলা কঠিন। দেখুন : পি ক্রোন ও মার্টিন হিন্ডস্, *God's Caliph : Religious Authority in the First Centuries of Islam* (ক্যামব্রিজ : ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৬); দেখুন : পি ক্রোন, *God's Rule : Government and Islam* (নিউইয়র্ক : কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৪), পৃ. ৩-৪৭।

আমি এটিকে মধ্যযুগীয় ইসলামী শাসনতন্ত্র বলতে পারতাম। কিন্তু এটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর হতে পারত; কেননা ১৯২৪ সন পর্যন্ত উসমানিয়া সাম্রাজ্য স্বীকৃতিযোগ্য তবে কিছুটা ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসহ এ ধরনের একটি শাসনতন্ত্র চালু রেখেছিল। তাছাড়া সৌদি আরবও বর্তমানে কিছুটা এ ধরনের শাসনতন্ত্র চালু রেখেছে। 'ক্লাসিক্যাল' কথাটি এ ক্ষেত্রে ইসলামের একজন আনুষ্ঠানিক ছাত্রের জন্য বিভ্রান্তিকর হতে পারে। কেননা শব্দটি ইসলামের ইতিহাসের একটি বিশেষ সময় বোঝাতে অনেক সময় ব্যবহৃত হয় যার মেয়াদ মোটামুটি ৬৯২ থেকে ৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল। দ্রষ্টব্য : মার্শাল জি এস হাডসন, *The Venture of Islam* (শিকাগো : ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, ১৯৭৪), ১ : ২৩১-৪৯৬। যদিও আমি 'ক্লাসিক্যাল' শব্দটি অনেক বৃহত্তর অর্থে ব্যবহার করেছি, আধুনিক ইসলামী যুগের নতুন ইসলামী শাসনতন্ত্র থেকে অনাধুনিক বা পুরনো যুগের ইসলামী শাসনতন্ত্রকে আলাদা করে বোঝানোর জন্য যখন এ শব্দটি ব্যবহার করা হয় এতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাব-ব্যঞ্জনা বিদ্যমান থাকে। অনেক সময় প্রাচীন শাসনতন্ত্র বিষয়ক ইংলিশ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলিয়ে প্রাচীন ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বলতে আমি আগ্রহ বোধ করেছি- cf. J.G.A. Pocock, *The*

www.pathagar.com

এই শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর উভয় উপাদান ছিল শাসকের কর্তৃত্ব এবং স্বয়ং আইন-এ দু'য়ের মাঝে ভারসাম্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ঐ আইন কোন বিমূর্ত সংক্ষিপ্ত বিষয় ছিল না; বরং এ ছিল এমন আইন যাকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এর বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে, বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়েছে, নানা দিক আবিষ্কৃত হয়েছে এবং (যেমনটি বাইরের একজন অমুসলিম বলতে পারে) বিশেষ সামাজিক-রাজনৈতিক গোষ্ঠী, যারা বিদ্বান পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত, আরবীতে যাদেরকে বলা হয় উলামা, সে গোষ্ঠী কর্তৃক তৈরি হয়েছে। এ বিদ্বান ও পণ্ডিত শ্রেণী থেকে কেবল ধর্মতত্ত্ববিদ ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবী শ্রেণীই সৃষ্টি হয়নি, এদের থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বিচারক শ্রেণী যারা সুনির্দিষ্ট মামলায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দিতেন। এ বিদ্বান শ্রেণী থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল স্বাধীন জুরিস্ট বা আইনজ্ঞ যারা আইনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মতামত দিয়ে ব্যাখ্যা করতেন। এভাবে আইনি বিষয়ে প্রায় একচেটিয়া যোগ্যতার বলে এ সব বিদ্বান ও পণ্ডিতের মধ্যে বিশেষত যারা আইনের বিষয়টিতে অধিকতর মনোযোগী[৭] তারা

Ancient Constitution and the Feudal Law : A Study of English Historical Thought in the Seventeenth Century (ক্যামব্রিজ : ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭)- তবে এখানে 'Ancient' বা 'প্রাচীন' শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এটি নিজেও ইংলিশ শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি বিশেষ অর্থবোধক বা টেকনিক্যাল শব্দ। ইসলামী পরিপ্রেক্ষিতে পিরিওডাইজেশন বা টারমিনোলজি ব্যবহারে যে বিরাট সমস্যা রয়েছে তা বোঝার জন্য তালিকা দেখুন হাডসনের *The Venture of Islam* বইটিতে, ১:২৩৪।

৬. ইসলামী শাসনতন্ত্রের একটি ব্যবহারিক সংজ্ঞা পাওয়া যাবে পি ক্রোনের *God's Rule* বইটির ২৮ পৃষ্ঠায় : 'একগুচ্ছ বিধিবিধান যা সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি ও অফিসের জন্য কাজ, ক্ষমতা এবং দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছে এবং যা এসব এজেন্সি ও অফিসের সাথে জনসাধারণের সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করে দিয়েছে।' ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতন্ত্র এবং এতে আইনের স্থান সম্পর্কে জানতে দেখুন : শ্যারম্যান এ জ্যাকসন, *Islamic Law and the State : The Constitutional Jurisprudence of Shihab al-Din-al-Qarafi* (লেইডেন : ই. জে. ব্রাইল, ১৯৯৬)। এটি ক্লাসিক্যাল ইসলামী আইন এবং ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতান্ত্রিক বিন্যাস এর মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে অতি সাম্প্রতিক লেখাগুলোর অন্যতম। গিব, কুলসন (Coulson), ওয়াট, ল্যাম্বটন ও রোজেনথালের গুরুত্বপূর্ণ রচনাসহ ইসলামী শাসনতান্ত্রিক চিন্তাধারা বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরনো প্রাচ্যবিদদের রচনা যা জ্যাকসন পর্যালোচনা করেছেন তার জন্য দেখুন xxxv-xl. আরো দেখুন হাডসনের *The Venture of Islam*, ১ : ৩১৫-৫৮, যেটিকে তিনি 'শরয়ী ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি' বলে দাবি করেছেন, যা স্বীকৃতিযোগ্য শাসনতান্ত্রিক চিত্র তুলে ধরে।

৭. আইন বিষয়ে জ্ঞানী বোঝাতে যে শব্দটি ইসলামী পরিভাষায় ব্যবহৃত হয় সেটি হচ্ছে 'ফকীহ' (বহুবচনে ফুকাহা)। এই বইটিতে আমি 'Scholars' শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে ফকীহগণ যে সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সে শ্রেণীকে বোঝাতে ব্যবহার করেছি। যখন আমি সংকীর্ণ বা ক্ষুদ্র অর্থে আইনজ্ঞ বোঝাতে চেয়েছি তখন 'Jurist' শব্দটি ব্যবহার করেছি।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের (যে রাষ্ট্রে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর আইন সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল) শাসকের জন্য শক্তিশালী ও কার্যকর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামী শাসনতন্ত্রে ক্ষমতার ভারসাম্য ছিল কি-না, যে কোন আইনগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র কার্যকর ও টেকসই হবার জন্য যা জরুরি, তা দেখার জন্য কেন এটি ব্যর্থ হয়েছিল তার উপর জোর না দিয়ে বরং এটি যতদিন টিকে ছিল ততদিন কিভাবে এটি এমন দর্শনীয়ভাবে সফল হয়েছিল সে বিষয়টির উপর জোর দেয়া উচিত।

যা হোক, কেন এই শৃঙ্খলাপূর্ণ প্রাচীন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি তা আমার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব্যাখ্যা করেছি। আমার মতে, উনিশ শতকের মধ্যভাগে উসমানিয়া সাম্রাজ্য প্রথম বাস্তব সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল, যখন তারা উপলব্ধি করল যে, পশ্চিমা দেশগুলো প্রথমবারের মত রাষ্ট্র বিনির্মাণে তাদের পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোকে ছাড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। তবে এ সংকটই ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার একমাত্র কারণ ছিল না। কোন সন্দেহ নেই যে, এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য যা কিছু করার দরকার ছিল; উসমানিয়া সাম্রাজ্যের কর্তৃপক্ষ তা করেও ছিল। সাম্রাজ্যের সংস্কারক কর্তৃপক্ষ, যারা পরিবর্তনের সূচনা করেছিল, যার প্রতীকী নাম ছিল 'তানযিমাত', তারাও সঠিক পথেই এগোচ্ছিল; কেননা তারা ভেবেছিল রাজনৈতিক উদারিকরণ এবং অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব গ্রহণই সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে এবং এভাবে সাম্রাজ্যকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অবস্থান থেকে উদ্ধার করা যাবে। কিন্তু সংস্কার কার্যক্রম ছিল অসম্পূর্ণ। সমস্যাটি এখানেই নিহিত ছিল।

সংস্কারের অসম্পূর্ণতাই ছিল বিপর্যয়ের মূল কারণ। একমাত্র সংস্কার যেটি সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ছিল সেটি হচ্ছে আলেম সমাজের কাছ থেকে কার্যকর আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সরিয়ে নিয়ে সাধারণ শরীয়া আইনের পক্ষে লিখিত বিধান চালু করা। প্রায় একই সময়ে আইনসভা বা পার্লামেন্টের বিধানসহ একটি শাসনতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। এ দুটো ব্যবস্থার সমন্বয়ের কারণে বলা যায় যে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য শরীয়া এতকাল যে ক্লাসিক্যাল ভূমিকা পালন করে এসেছে শাসনতন্ত্রের আইনি কর্তৃপক্ষ সে ভূমিকা পালন করতে পারত। আইনসভা শাসকের কর্তৃত্বের উপর প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারত এবং এভাবে শাসকের নির্বাহী কর্তৃত্বকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে আলেমগণ এতকাল যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে এসেছেন তার অনুরূপ হতে পারত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আইনসভা এ ধরনের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারেনি; যেহেতু সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ সংবিধান ও আইনসভা

www.pathagar.com

দু' প্রতিষ্ঠানকেই স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে দেননি এবং এক পর্যায়ে তিনি দুটোই বিলুপ্ত করেন। এর ফলে আইনি বিধানগুলো বাতিল হয়ে যায়; যে বিধানগুলো মূলত সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে তৈরি হয়েছিল। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইচ্ছাকে আলেমরা স্বাধীনভাবে যা ব্যাখ্যা করতেন তাও সংরক্ষণ করা হয়নি। এভাবে সংবিধান ও আইনসভা বিলুপ্ত করার ফলে এবং আইনের উপর আলেমদের নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে দেয়ার ফলে সুলতানের উপর আর কোন নিয়ন্ত্রণই অবশিষ্ট থাকেনি।[৮]

ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ অবিকৃত রেখে এক মুসলিম রাজ পরিবারের পরিবর্তে আরেক রাজপরিবার ক্ষমতায় এসেছে এবং উসমানিয়া সরকারের অসম্পূর্ণ সংস্কার পুরো উদ্যোগটিকেই ব্যর্থ করে দিয়েছে। যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানিয়া সাম্রাজ্য পরাজিত হয়, তখন সেখানে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক প্রভাবাধীন সরকারসহ যে সরকারগুলো আসে, তারা উসমানিয়া সরকারের বিধিবিধানগুলোর জরুরি অংশগুলো বহাল রাখে এবং আলেম সমাজকে শেষদিকের উসমানীয় শাসকরা যে ছোটখাটো ও কম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কাজে

---

৮. তুলনার জন্য দেখুন, রিচার্ড বুলিয়েট (Richard Bulliet), *The Case for Islamo-Christian Civilization* (নিউইয়র্ক : কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৪), পৃ. ৬৪, বুলিয়েট শরীয়াকে শাসকের জন্য এক ধরনের বিধিনিষেধ বা সীমারেখা হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যে বিধিনিষেধের চালিকা শক্তি হচ্ছে আলেম সমাজ বা ইসলামী আইনজ্ঞ সমাজ। দেখুন পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬। আরো গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ দিক রয়েছে বুলিয়েটের কথায়। তাঁর ভাষায় এন্টিক্লারিক্যাল (Anticlerical) বা ধর্মীয় নেতাদের বিপরীত সরকারি প্রয়াস স্বৈরতন্ত্রের উত্থানকে সহায়তা করেছে। যেমন তিনি বলেছেন, 'তত্ত্ব এটা নিশ্চিত করেছে যে, শরীয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত শাসকরা চরম ক্ষমতা চাইত এবং তারা সর্বদা এ প্রত্যাশা নিয়েই জীবনযাপন করত।' (পৃ. ৭৩, মূল লেখায় জোর দেয়া হয়েছে)। তিনি এ ক্ষেত্রে উসমানিয়া শাসকদের আইনের ধারা বা সার-সংকলনের কথা উল্লেখ করেছেন। দেখুন পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫। অবশ্য আইনের দ্বারা শাসকের জন্য বাধ্যবাধকতা বা সীমারেখা ঠিক করে দেয়ার বিষয়টি যদি কেবল ঐতিহাসিকভাবে তক্বগত ব্যাপার হয়ে থাকে, তবে তাদের উপর আলেমদের প্রভাব নষ্ট হয়ে যাওয়াটা কেন গুরুত্বপূর্ণ হবে বুলিয়েট তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক আলোচনায় এ কথাটি বলেননি। তিনি পরিচিত সে ধারণাটিই পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে, 'যেমনটি ইসলামের প্রতিটি ঐতিহাসিক জানেন, দুঃখজনকভাবে বাস্তবে আলেম সমাজ খুব কমই শাসকদের স্বৈর আচরণ বা জুলুম প্রতিহত করতে পেরেছে।' এই বইটিতে আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে এ রকম, আমি মনে করি, শক্তিশালী ক্লাসিক্যাল শাসনতান্ত্রিক কাঠামো কিছু সুবিদিত ব্যতিক্রম ছাড়া অনেকটাই কার্যকর ও সফল ছিল। তবে কেবল আলেম বা ফকীহদের নয়, সামগ্রিক শাসনতন্ত্র ভিত্তিক শাসনামলের (আলেম সমাজ যার গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ ছিল) শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হওয়াটাই আমি মনে করি পরবর্তী প্রভাবশালী নির্বাহী ক্ষমতা সৃষ্টির কারণ ও তার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারে।

www.pathagar.com

নিয়োজিত করে তাদের মর্যাদার অবনতি ঘটিয়েছিল সে ধারা অব্যাহত রাখে। সাবেক উসমানিয়া সাম্রাজ্যের বাইরেও একই ধরনের আইনি ধারা পরিলক্ষিত হয়, যার মাধ্যমে সেখানকার আলেম সমাজকেও আইনি ব্যবস্থা সৃষ্টিতে তাদের যে ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা ছিল সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। ফলাফলও তার একই রকম হয়। আলেম সমাজ ও শরীয়া কখনোই বৈধ শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্বের উৎস হিসেবে পূর্বের সে হৃত অবস্থান আর পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। এভাবে ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে যায়।

ইসলামী রাষ্ট্রের পতন সম্পর্কিত এ বিবরণের আলোকে আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে পুরনো ইসলামী রাষ্ট্রের স্থানে যে আধুনিক রাষ্ট্রগুলো সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং এগুলোর কারণ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। এ সব দেশের সরকারগুলো নিজ নিজ সীমানার মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে রাজনৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষা করতে দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে। তবে নিজ নিজ নাগরিকরা সরকারগুলোকে নৈতিকভাবে বৈধ বলে মনে করবে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ তাদের দরকার ছিল রাজনৈতিক মৌলিক সুবিচার নিশ্চিত করা; অর্থাৎ সাধারণ নাগরিকদের মনে এ ধারণা দেয়া যে, তাদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাই নেয়া হয়েছে; অন্যান্য দেশের নাগরিকদের যে সুযোগ থাকে, তাদেরকে সে ধরনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়নি বা অর্থনৈতিক প্রাপ্তিতে তাদের ন্যায্য অংশগ্রহণ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়নি।

আমি মনে করি, এ সব আধুনিক দেশ আইন দ্বারা তাদের যথার্থতা প্রমাণিত এবং আইন দ্বারা তারা পরিচালিত- এ উভয় অর্থে তারা আইনত বৈধ রাষ্ট্র -এ বিষয়টি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এ সব দেশে রাজনৈতিক সুবিচার না থাকা এ ব্যর্থতারই ফল। এ সব রাষ্ট্রের শাসকদের বৈধতা প্রমাণের পথে না যাওয়ার সচেতন কারণ ছিল। তবে এ সব রাষ্ট্রের অধিকাংশের আইনত অবৈধ চরিত্রের এটাই একমাত্র কারণ নয়। এখানে সমান গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি কারণ রয়েছে; সেটি হচ্ছে এ সব দেশের আইনজ্ঞ ও বিচারক শ্রেণী তাদের নিজ নিজ দেশের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক শ্রেণী বা শক্তিতে পরিণত হতে পারেনি।

এ ব্যর্থতার কারণ জটিল প্রকৃতির; বিশেষত মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের সামরিক বাহিনী ও গোপন পুলিশি শক্তি এবং পাশাপাশি তেল সম্পদের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বিকৃতির সাথে এ ব্যর্থতার কারণ জড়িত। বিষয়টি এ সব দেশের

www.pathagar.com

আলেম সমাজের সাথেও জড়িত, যে আলেম সমাজ ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রে আইনের অভিভাবক ছিলেন। এ সব দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমানের আইনজ্ঞরা এ শ্রেণীকে অনুকরণ করতে বা তাদের স্থলাভিষিক্ত হতে চায়নি। পূর্বের ক্লাসিক্যাল ব্যবস্থায় আলেম সমাজ অনেক সময় রাষ্ট্রকে সেবা দিয়েছেন এবং তারা এই সেবা দিয়েছেন আইনের নামে ও আইনের মাধ্যমে। বিপরীতক্রমে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বর্তমান আধুনিক মুসলিম বিশ্বে আইনজ্ঞ শ্রেণী বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আইনের ব্যাপারে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির ধারক এবং এভাবে তারা মূলত রাষ্ট্রের নামে আইনকে সেবাদান করে অর্থাৎ রাষ্ট্রের নামে আইন প্রয়োগ করে; আইনের নামে রাষ্ট্রকে সেবাদান করে না।

মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশগুলোতে আধুনিক রাষ্ট্রের যে ব্যর্থতা দেখা যায় সে ব্যর্থতাই গত সিকি শতাব্দীকাল ধরে শুধু ধর্ম হিসেবে নয় বরং শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তিরূপে কিভাবে ইসলামের বিস্ময়কর রেনেসাঁ সম্ভব হল তার কারণ ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে। বইটির তৃতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এটি ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা গেছে যে, সমসাময়িক ইসলামী রাজনীতির সপক্ষে যুক্তির অন্যতম বিষয় হচ্ছে ন্যায়বিচার বা সুবিচারের দাবি। প্রশ্ন হচ্ছে এ দাবির উদ্ভব কিভাবে হয়েছে? এর উত্তর হচ্ছে যুগপৎ পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ন্যায়বিচারের অভাব- এ দুয়ের প্রেক্ষিতে এ দাবির সৃষ্টি হয়েছে। তবে যে বিষয়টি এখানে লক্ষ্য করা হয়নি সেটি হচ্ছে, মানুষের ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষা এবং শরীয়া প্রতিষ্ঠার মূল ইসলামী রাজনৈতিক লক্ষ্যের মাঝে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। পশ্চিমাদের, এমন কি কিছু সংখ্যক সেক্যুলার মুসলিমের ধারণা হচ্ছে, 'শরীয়ার অর্থ হচ্ছে নারীদের পর্দা দিয়ে ঢেকে ফেলা এবং চোর ও ব্যভিচারীকে কঠোর শারীরিক শাস্তি দেয়া।' কিন্তু আমার মতে, শরীয়ার সঠিক অর্থ হচ্ছে আইন; যে কোন আইন নয় বরং সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে পাওয়া আইন, যে আইন শতাব্দীর পর শতাব্দী ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে সফলভাবে পরিচালিত করেছে।

উপরের বক্তব্যের ভিত্তিতে বলা যায়, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বানের অর্থ হচ্ছে প্রথমত ও প্রধানত আইন প্রতিষ্ঠার আহবান; অন্য কথায় আইনের দ্বারা যথার্থতা প্রমাণিত এবং আইন দ্বারা শাসিত- এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান। নতুন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রবক্তারা প্রায়ই বলে থাকেন, ইসলামী আইনব্যবস্থা বাতিল করে দেয়ার ফলেই পূর্বের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন হয়েছে। যদিও এ কথাটি আংশিক সত্য, তবে এর পাশাপাশি

www.pathagar.com

এটাও সত্য যে, সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আইনের যে অবস্থান ছিল তা বাতিল করে দেয়ার ফলে আধুনিক অনৈসলামী রাষ্ট্রগুলো রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। যা হোক, যদিও ব্যক্তিগত জীবনে হয়তো তারা নিখুঁতভাবে ইসলামী জীবনযাপনে ততটা আগ্রহী নয়, তথাপি মুসলিম বিশ্বে বিপুল সংখ্যক লোক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বানে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সাড়া দেয়ার কারণ হচ্ছে, তারা এ কথা বুঝতে পেরেছে, 'আইনই শাসক তৈরি করে, এর দ্বিতীয় কোন পথ নেই'- এই ধারণাকে নতুন করে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করাই তাদের স্ব স্ব রাষ্ট্রের ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার একমাত্র উপায়। অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রে আইন যেমন শাসককে তৈরি করত এবং নিয়ন্ত্রণ করত, সেরূপ এখনও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইনই শাসক তৈরি করবে -এ ধারণাকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করলেই ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠা যাবে।

তবে আইনের মাধ্যমে শরীয়াতে প্রত্যাবর্তনের যে উপায়ের কথা বলা হল তার সমস্যা হচ্ছে আইন সদাসর্বত্র উপস্থিত এমন কোন বিষয় নয় যাকে এক শব্দে প্রকাশ করা যায়। বরং আইন হচ্ছে এক গুচ্ছ সামাজিক আচরণ, ভাষা ব্যবহারের বিশেষ এক পদ্ধতি এবং শক্তি প্রয়োগের উপলক্ষ। মানুষ সমষ্টিগতভাবে যে আচরণ নিয়মিত এবং বারবার করে এ ধরনের আচরণের সাহায্যে আইনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এ ধরনের সমন্বিত দলীয় বা সমষ্টিগত আচরণকে আমরা বলি প্রতিষ্ঠান।[৯] এর মধ্যে আছে আদালতের মত আনুষ্ঠানিক সরকারি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে বিভিন্ন মত ও পথ আলোচিত হয়, চর্চা হয় এবং পরস্পরে মতামত আদানপ্রদান হয়। এতে আরো অন্তর্ভুক্ত আছে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক অফিস যেখানে অভ্যাস ও অনুশীলন শিখানো হয়। যদিও এ সব প্রতিষ্ঠান আইনি ধারণা (Legal Idea) ও মূল্যবোধের বিকল্প নয়। এগুলোর অবর্তমানে আইন ঠিকানাহীন হয়ে পড়ে এবং পরিণতিতে আইনের কোন অস্তিত্বই থাকে না।

---

৯. ডগলাস নর্থ, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (ক্যামব্রিজ : ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯০), অথবা এই সারগ্রাহী সংজ্ঞাটি লক্ষ্য করুন: 'প্রতিষ্ঠান হচ্ছে শ্রেণী ও এজেন্টের মধ্যকার সম্পর্কের কাঠামো তৈরির টেকসই গাঁথুনি। প্রতিষ্ঠান যোগাযোগের সামাজিক নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করে দেয়, যা একটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত প্রতীক প্রদান করে, পাশাপাশি এটি অনুশীলনের বা প্রয়োগের স্থান চিহ্নিত করে এবং কিছুটা নিশ্চয়তা প্রদান করে, যা মানুষের সম্পর্কের সামাজিক দায় কমিয়ে আনে।' পি ও'হারা, মার্ক্স, *Veblen and Contemporary Institutional Political Economy* (চিল্টেনহ্যান : এডওয়ার্ড এলগার, ২০০৩), পৃ. ৩৭

www.pathagar.com

অতএব যারা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহবান জানায় তাদেরকে অবশ্যই কী কী প্রতিষ্ঠান এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থায় গড়ে উঠতে এবং বিকাশ লাভ করতে পারে সে সব প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করতে হবে, যেগুলো তারা যে সব ইসলামী আইন নবায়ণ করতে আগ্রহী সেগুলোর প্রয়োগ ঘটাবে। সউদী আরবে আলেম সমাজ তাদের পুরনো ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা কিছুটা হলেও পালন করছেন, তবে তা এমন ব্যবস্থায় যা তেল সম্পদের কারণে পুরনো ঐতিহ্যবাহী ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেমন ছিল তা থেকে একেবারে ভিন্ন। তবে সউদী আরবের বাইরে আলেম সমাজকে এককালে সুন্নী মুসলিম বিশ্বে যেমন ছিল, সে অবস্থান থেকে একেবারে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।[১০] ফলে বর্তমানে আলেম সমাজকে আইনের রক্ষক বা অভিভাবক হিসেবে তাদের পুরনো ঐতিহ্যবাহী ভূমিকায় ফিরিয়ে আনা হবে -এ কথা ঘোষণা করাই অসম্ভব। শিয়া ইরানে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী আলেম-উলামাভিত্তিক প্রচুর নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন যখন তিনি সেখানে বিপ্লবী ইসলামী রাষ্ট্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর দেশে এভাবে উলামাদের পুরনো মর্যাদা পুনরুজ্জীবিত করতে গিয়ে এ ধরনের সমস্যায় পড়েছিলেন।[১১] তবে শাসক ও উলামাদের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে তিনি এ দুটি আলাদা প্রতিষ্ঠানকে একিভূত করে একক সর্বোচ্চ আইনজ্ঞ শাসকের অধীনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। এই অতি আত্মম্ভরিতার ফলেই ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান ব্যর্থ হয়েছে।

এ কারণেই আজকের ইসলামপন্থীরা, যারা নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করতে চায়, তারা উলামার কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলে না। সুন্নী বিশ্বে তারা উলামাকে যেমন দুর্বল, আপোসকৃত এবং একই সঙ্গে জালিম শাসক কর্তৃক নখদন্তহীনে পর্যবসিত অবস্থায় দেখছে সেভাবেই তাদেরকে দেখে। অন্যদিকে সংখ্যাগুরু শিয়া অধ্যুষিত ইরাকে তাদের ভয় হচ্ছে সেখানকার আলেমরা ইরানের মত সেখানেও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে বহুদূর চলে যাবে। তার চেয়ে বড় কথা, যদিও সমসাময়িক ইসলামপন্থীরা আল্লাহর আইনের ব্যাপারে আগ্রহী ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ,

---

১০. এ কথা বলছি সমসাময়িক মুসলিম সমাজে আলেম সমাজের বর্তমান জটিল ভূমিকাকে অস্বীকার করার জন্য নয়। মুহাম্মদ কাসিম যামান তাদের এ ভূমিকা সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর পর্যালোচনা করেছেন। দেখুন *The Ulama in Contemporary Islam : Custodians of Change* (প্রিন্সটন : প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০২) বিশেষত দেখুন পৃ. ১৪৪-৯১। আমি বলি, নির্বাহী ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষাকারী হিসেবে আলেমদের এক সময় যে ভূমিকা ছিল সে ভূমিকা এখন আর তাদের নেই।

১১. দেখুন শিবলি মালাত (Chibli Mallat), *The Renewal of Islamic Law* (ক্যামব্রিজ : ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৩)

www.pathagar.com

তবুও তাদের অনেকেই গণতান্ত্রিক নীতিগুলোও পাশাপাশি ধরে রাখতে চায় এবং তাদের কাছে খুব পছন্দনীয় মনে না হলেও অনির্বাচিত কিছু আলেমের কাছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় রাজনৈতিক ক্ষমতাও অর্পণ করতে চায়।

যে সব সরকার নিজেদেরকে নতুন ইসলামী সরকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছে, তারা এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদারনৈতিক শাসনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সাথে ইসলামী মূলনীতিকে মিশ্রিত করার চেষ্টা করছে। এভাবে তারা তাদেরকে ইসলামীকরণ করার চেষ্টা করছে। যেমন, ইরাক ও আফগানিস্তানের কথা বলা যায়। এ দুটি দেশের লিখিত শাসনতন্ত্র নারী-পুরুষের সমতার নিশ্চয়তা দিয়েছে। পাশাপাশি এগুলো আইন প্রণয়ন ক্ষমতাসহ নির্বাচিত আইনসভার ব্যবস্থাকেও নিশ্চিত করেছে। উভয় দেশ কোন আইন সংবিধান লঙ্ঘন করছে কি-না সে ব্যাপারে রুলিং-এর ক্ষমতাসহ হাইকোর্টের বিধান রেখেছে। আবার উভয় দেশ ও দেশের শাসনতন্ত্র ইসলাম বা ইসলামী আইনকে নিজ নিজ দেশের আইনের প্রধান উৎসের মর্যাদা দিয়েছে।[১২]

শরীয়া আদালতের কাছে সমস্ত আইনি ক্ষমতা অর্পণ করার বিধান থেকে বর্ণিত ব্যবস্থাটি অনেকটাই ভিন্ন। ইরাক বা আফগান কোন শাসনতন্ত্রই সমস্ত আইনি ক্ষমতা শরীয়া আদালতের কাছে অর্পণ করেনি। বরং মুসলিম বিশ্বের অন্যত্র যে ধারা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, অর্থাৎ শরীয়া আদালতকে শুধু ব্যক্তিগত বিষয় যেমন বিয়ে, তালাক বা সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে; সে ধারাই তারা অনুসরণ করেছে। অন্য কথায়, ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রে আলেম সমাজ যে প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন নতুন ইসলামী রাষ্ট্রগুলো আলেম সমাজের সে ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায় না; বরং তারা বর্তমানে আইনসভায় শরীয়ার আলোকে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করে শরীয়াকে গণতান্ত্রিক করার পরীক্ষামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। এ ব্যবস্থায় একবার কোন আইন গৃহীত ও অনুমোদিত হয়ে গেলে সেগুলোর যথার্থতা ও আইনি ক্ষমতা কার্যকর হবে এবং বহাল থাকবে এ জন্য যে, এগুলো আইনসভা অনুমোদন করেছে; এ জন্য নয় যে, এগুলো আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে, (যা এখনও প্রক্রিয়াধীন; যা এখনও পরিপূর্ণতা লাভ করেনি) এ সব দেশে আইনসভাকে এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যা আইনের আদর্শের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত থাকবে; কেবল ক্ষমতার প্রয়োগের সাথে নয়।

---

১২. মিসর ও পাকিস্তানের সংবিধানে ইসলামী আইনকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করার বিধান রয়েছে।

www.pathagar.com

একইভাবে, ইরাক ও আফগানিস্তানের বর্তমান শাসনতন্ত্রে নিজ নিজ দেশের আইনসভাকে এমন আইন প্রণয়ন করতে নিষেধ করা হয়েছে যা ইসলামের মূলনীতি ও বিশ্বাসের পরিপন্থী হয়। এ উদ্যোগটি এ সব দেশে কার্যত শরীয়াকে শাসনতান্ত্রিক রূপ দিয়েছে। এ দুটি দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে এ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, নিজ নিজ দেশের আইনসভায় অনুমোদিত কোন সাধারণ আইন শাসনতন্ত্রের মূলনীতির পরিপন্থী হয়েছে কি-না সে বিষয়ে আদালত যেমন সিদ্ধান্ত বা রুলিং দিতে পারে, তেমনি আইনসভায় অনুমোদিত কোন সাধারণ আইন ইসলামের পরিপন্থী কি-না আদালত সেটিও ব্যাখ্যা করে মতামত দিতে পারবে। এভাবে এ সব দেশে মূলত সর্বোচ্চ আদালতকে ইসলামী আইনের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করা হচ্ছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে আদালতের দায়িত্ব পরোক্ষ ধরনের। কেননা ইসলামী আইনের কোন্‌টি প্রয়োজন আর কোন্‌টি প্রয়োজন নয় সে সম্পর্কে বলা আদালতের কাজ নয়। বরং আইনসভায় গৃহীত কোন আইনকে যখন কেউ চ্যালেঞ্জ করে তখন ঐ আইন শরীয়ার নির্দেশনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি-না সে বিষয়ে আদালত শুধু তার মতামত দেয়। এটিই হচ্ছে এ সব দেশে এ ব্যাপারে আদালতের উপর অর্পিত দায়িত্ব। শাসনতন্ত্রে আদালতকে অনুরূপ দায়িত্ব দেয়া আছে বলেই এ সব দেশের আদালতকে এ দায়িত্ব পালন করতে হয়; এ জন্য নয় যে, এ দায়িত্ব আদালত শরীয়া থেকে লাভ করেছে।

নতুন ইসলামী রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ দেশে শরীয়ার গণতন্ত্রায়ণ ও শাসনতান্ত্রিকীকরণের যে উদ্যোগ নিয়েছে সেটি হচ্ছে আইনসম্মত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন শাসনতন্ত্র ও আদালত ইত্যাদি, এগুলোর মাধ্যমে নিজেদেরকে আইনসম্মত এবং আইনি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার একটি প্রয়াস। কেননা তাদের চিন্তাধারা হচ্ছে, এ সব প্রতিষ্ঠান এ সব রাষ্ট্রকে আইনগত দিক থেকে যথার্থ বলে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং আইন দ্বারা পরিচালিত হতে সাহায্য করবে। তবে এ সব রাষ্ট্র এ কাজ করতে গিয়ে নতুন এক জটিলতার আশঙ্কা তৈরি করেছে, যে জটিলতা পূর্বের ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রে প্রচলিত শাসনতান্ত্রিক চিন্তাধারায় দেখা যায়নি। সমস্যাটি হচ্ছে স্রষ্টার আইন বনাম মানব রচিত আইনের মাঝে সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টির আশঙ্কা। আলেম সমাজ, যারা ক্লাসিক্যাল শাসনতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে রূপায়িত করেছিলেন, তারা মানবরচিত বিদ্যমান আইনের অস্তিত্ব সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। আলেম সমাজ জানতেন মানুষের তৈরি আইন সমাজে প্রচলিত রয়েছে। তারা স্বীকার করতেন যে, কোন

www.pathagar.com

বিষয় শরীয়ার পরিপন্থী না হলে সে ক্ষেত্রে শাসকের আইন বা বিধিবিধান ও বিধিনিষেধ তৈরির অধিকার রয়েছে। গোত্রীয় আইন ও প্রথাগত আইনের অস্তিত্ব সম্পর্কেও তারা খুব ভালভাবেই অবগত ছিলেন, (যে আইন কোন কোন স্থানে প্রাত্যহিক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিবিধানের উৎস হিসেবে কাজ করত)। কিন্তু তাদের শাসনতান্ত্রিক তত্ত্বের মূল কথটি ছিল এ রকম যে, শরীয়াই এ সব অন্যান্য আইনকে কর্তৃত্ব দিয়েছে এবং আলেম সমাজ শরীয়ার যেভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এ সব আইন কোন অবস্থাতেই তার বিপরীত বা তার সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। এভাবে আলেম সমাজ মৌলিক আইনের একমাত্র ব্যাখ্যাকারী হিসেবে নিজেদের ক্ষমতা ঠিক রেখে একাধিক প্রকারের আইনের অস্তিত্ব মেনে নেন, যে মৌলিক আইন অন্য আইনগুলোকে কর্তৃত্ব দিয়েছে।

নতুন ইসলামী রাষ্ট্রে যা ঘটছে তা আরো জটিল প্রকৃতির। শরীয়াভিত্তিক আইনি পদ্ধতিকে পরিপূর্ণ করে তোলার দিক থেকে বলা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রের লিখিত শাসনতন্ত্র শরীয়াকে সর্বোচ্চ আইন বলে স্বীকৃতি দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ শাসনতন্ত্র বৈধ ও আইনসম্মত বলে স্বীকৃতি পাবে। এভাবে অতীতের ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রের যৌক্তিক কাঠামোর সাথে নতুন ইসলামী রাষ্ট্রকাঠামোটির মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রেক্ষিত থেকে চিন্তা করলে দেখা যায় এখানে বিষয়গুলো অনেকটাই অস্পষ্ট। কেননা শরীয়ার অর্থ কী হবে তা এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের আইনসভা ও আদালতের আওতাধীন করা হয়েছে।[১৩] অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় আইনসভা ও আদালত শরীয়ার অর্থ ঠিক করে দেবে। ফলে এ অবস্থায় 'রাষ্ট্রের আগে শরীয়া এসেছে না কি শরীয়ার আগে রাষ্ট্র এসেছে' এ প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। উদারনৈতিক রাষ্ট্রগুলোতে শাসনতন্ত্রকেন্দ্রিক এ ধরনের একটি সমস্যা রয়েছে যার সাথে এ সমস্যাটি মিলে যায়। আমেরিকায় নাগরিকদের 'জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পদের অবিভেদ্য অধিকার' সে দেশের শাসনতন্ত্রের আগে এসেছে না কি শাসনতন্ত্র থেকেই এগুলোর উৎপত্তি হয়েছে- এ প্রশ্নের পরিপূর্ণ উত্তর আমেরিকাবাসী কখনো দিতে পারেনি। এ ধরনের জটিল ও সার্বক্ষণিক বিতর্কমূলক সমস্যার সমাধান না করেই যে কোন আইনি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখা মোটেও অসম্ভব নয়।

কে বা কোন্ প্রতিষ্ঠান শরীয়া কথাটির সংজ্ঞা নির্ধারণ করবে এবং কোন্ কর্তৃত্ববলে তা করবে তার অনিশ্চয়তাই নতুন ইসলামী শাসনতন্ত্রের সবচেয়ে

---

১৩. জ্যাকসন (Jackson), *Islamic Law and the State*, পৃ. xiv-xv

www.pathagar.com

বড় সমস্যা। পূর্বের ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে এই ভূমিকায় ছিলেন আলেম সমাজ এবং তাদের কর্তৃত্বের উৎস ছিল স্বয়ং শরীয়া। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এখন কে থাকবে এই ভূমিকায়? জনসাধারণ কি এই ভূমিকায় থাকবে যারা আইনসভার সদস্যদের নির্বাচিত করে? যদি তাই হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে তাদেরকে সামগ্রিকভাবে আল্লাহর আইন ব্যাখ্যা করার কর্তৃত্ব কে দিবে? অথবা শাসনতন্ত্র দ্বারা কর্তৃত্ব লাভ করে আইনসভা নিজেই কি এই ভূমিকা পালন করবে? হাইকোর্টের বিচারকদেরইবা কী ভূমিকা হবে? সবশেষে, আলেম সমাজের কথাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না; তাদের ভূমিকা কী হবে। কেননা আজও তারা আছেন, যদিও আজকাল অতি সীমিত পরিমণ্ডলে তাদের ভূমিকা রয়েছে।

খ্রিস্টিয় ২০০৩ সনে ইরাকে আমেরিকান বাহিনী প্রবেশের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে আমি যুক্তি দেখিয়েছিলাম যে, যুগপৎ ইসলামী ও গণতান্ত্রিক এমন একটি শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম ও গণতন্ত্রের মাঝে যে টানাপোড়েন তা নীতিগতভাবে সমাধান করা সম্ভব।[১৪] ইরাকের বর্তমান শাসনব্যবস্থা যে ধরনের বিপর্যয়করই হোক না কেন কিংবা আফগানিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের সীমাবদ্ধতা যাই থাকুক না কেন এ দুটি দেশের শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এটি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বাস্তবিক একটি ইসলামী গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব। আমার এ দাবির যে যৌক্তিক পরিণতি সেটিই এখানে আমার প্রশ্ন, 'নতুন ইসলামী রাষ্ট্রগুলো সফল হতে পারবে কি?'

আমি আমার ভূমিকা বক্তব্যের উপসংহার টানতে চাই এই বলে যে, এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষের অস্তিত্বের উপর যা আইনের নামে নির্বাহী ক্ষমতা চর্চাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। যদি নতুন ইসলামী রাষ্ট্রগুলো এমন কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে যা পূর্বের আলেম সমাজ বা ইসলামী পণ্ডিতসমাজ ঐতিহ্যগতভাবে যে ভূমিকা পালন করে এসেছিলেন তাহলে রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমে আইনি বৈধতা লাভের এ ধরনের রাষ্ট্রগুলোর একটি বাস্তব সম্ভাবনা থাকবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান কোন্‌টি হতে পারে। উত্তর হচ্ছে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান হতে পারে দেশের আইনসভা, যদি তা নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে এসে নির্বাহী ক্ষমতাকে পর্যবেক্ষণ ও সীমিত করতে পারে। অথবা অন্তত

---

১৪. নোয়াহ ফেল্ডম্যান, *After Jihad : America and the Struggle for Islamic Democracy*, (নিউইয়র্ক : ফারার, স্ট্রস ও গিরাক্স (Giroux), ২০০৩)

www.pathagar.com

তত্ত্বগতভাবে দেশের আদালত এ ধরনের প্রতিষ্ঠান হতে পারে, যা শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা করবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিমুক্ত আইনি ব্যবস্থার উপর যার তত্ত্বাবধানমূলক কর্তৃত্ব বজায় থাকবে।

তবে ক্ষমতার অংশীদার হতে ইচ্ছুক ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য উপরের যে কোন ব্যবস্থাই কার্যকর করা হবে অত্যন্ত কঠিন। যদি তারা কোন নির্বাচনে সম্পূর্ণভাবে জিতেও যায়, তবে তারাও অন্যান্য বিজয়ী রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর মত প্রলোভন ও বিকৃতির সম্মুখীন হবে বা হতে পারে। সাধারণত যেমনটি হয়, এরা যদি খণ্ডিতভাবে ক্ষমতাও লাভ করে, তাহলে নিজ দেশের ক্ষমতাবান নির্বাহী বিভাগের দিক থেকে তো বটেই এমন কি পশ্চিমা জাতিগুলোর দিক থেকেও তারা বিরোধিতার সম্মুখীন হবে, যারা এদের অভ্যন্ত রীণ ও বৈদেশিক নীতিতে ইসলামপন্থী নীতির ব্যাপারে সন্দিহান থাকবে।

যদি কোন দেশে ইসলামপন্থীরা সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে কিন্তু ক্ষমতার ভারসাম্যকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করতে এবং আইনের শাসন পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়, তবে নিঃসন্দেহে আমরা সকলেই তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর হয়ে ওঠব। ইসলামপন্থী রাষ্ট্রের কাছে অনেক রকম উচ্চাশা থাকবে। কিন্তু আইনের শাসন পুনরূদ্ধার এবং ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হলে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মত ঐ রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত তার নাগরিকদের হতাশ করবে এবং বাকি বিশ্বকে তার প্রতি বৈরী করে তুলবে। নিঃসঙ্গ এবং ক্রুদ্ধ হয়ে ঐ রাষ্ট্র অবশেষে তার নিজ নাগরিকদের প্রতি কিংবা নিকট বা দূরের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি বৈরী হয়ে ওঠবে। এ মুহূর্তে বহু মুসলিমের কাছে ইসলামপন্থীদের আইনের শাসনের প্রতিশ্রুতিই অর্থপূর্ণ রাজনৈতিক সুবিচারের একমাত্র সম্ভাবনার কথা বলে। এরাও যদি ব্যর্থ হয় তাহলে এদের বিকল্প হিসেবে যারা আসবে তারা আরো খারাপ হতে পারে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

সঠিক কী ঘটেছিল?

নতুন ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ডাক

গত সিকি শতাব্দীকাল ধরে মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশগুলোতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান সম্বলিত এক ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্থানে শুধু পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরাই নয়, মুসলিম বিশ্বের শিক্ষিত শ্রেণীও বিস্মিত। এ ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্থানের কারণ খুঁজতে গিয়ে বলতে হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলিম দেশগুলোতে বহু সরকারেরই সংস্কার অত্যন্ত জরুরি; বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে- যেখানে একনায়কতান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ঐ অঞ্চলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সামরিক প্রতিপত্তি সৃষ্টি করতে এমন কি আইনত বৈধ সরকারের স্বীকৃতি পেতেও ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই করুণ অবস্থা সত্ত্বেও কেন এসব দেশে উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোনরূপ অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠেনি; যেমনটি সাবেক কম্যুনিস্ট পূর্ব ইউরোপে গড়ে ওঠেছিল? এ ব্যাপারে অন্যান্য দেশের সাথে মুসলিম বিশ্বের পার্থক্যটা কোথায়?

সুস্পষ্ট ইসলামী রাজনৈতিক দর্শনের উত্থান কিভাবে হল সেটি একটি রহস্য বটে। আর এ রহস্য আরো গভীর হয়েছে এ জন্য যে, গত বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সময় জুড়ে মুসলিম বিশ্ব এবং এর বাইরের জগতের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত ছিল যে, ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যর্থতার পরও ইসলামী রাজনৈতিক দর্শনের উত্থান কিভাবে হল? এটিই এক রহস্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইসলামই ছিল উসমানিয়া সাম্রাজ্যের মূলনীতি যা একে সংগঠিত রেখেছিল; কেননা ঐ সাম্রাজ্যের মুসলিম রাজবংশের মূলভিত্তি ছিল ইসলাম। অন্য দিকে পশ্চাৎমুখী বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল ঐ সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ। পতনের ফলে এর জনগণ একটি উল্লেখযোগ্য সময় পর্যন্ত লজ্জাজনকভাবে ঔপনিবেশিক শক্তির পদানত হয়ে কাটাতে বাধ্য হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উসমানিয়া সাম্রাজ্যের পতনের পর জাতীয় ভিত্তিতে যে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো খুব ভালভাবে চলেনি এবং তাদের নিজস্ব ধরনের জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রীয় সমাজবাদও

www.pathagar.com

ছিল অবলুপ্তির পথে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এরূপ অবস্থায় সরকারের ধরন প্রশ্নে হতাশাগ্রস্ত জনগণ কেন পশ্চাৎপন্থী হয়ে পড়ল, যে সরকারগুলোর ব্যর্থতায় মুসলিম বিশ্বে এই বিস্ময়কর অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে?

অধিকাংশ পর্যবেক্ষক, যারা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন, তারা 'জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় সমাজবাদের ব্যর্থতার ফলে সেক্যুলারিজম অবধারিত'- মুসলিম বিশ্বের চিন্তক শ্রেণীর এ ধারণার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[১] অর্থাৎ তারা বলতে চেয়েছেন, রাষ্ট্রীয় সমাজবাদের ব্যর্থতার ফলে মুসলিম বিশ্বে সেক্যুলারিজম এসেছে বা আসবে- এটাই স্বাভাবিক। তবে বিংশ শতাব্দী জুড়ে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সেক্যুলারিজম নয় বরং ইসলামে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রতিনিয়ত আহ্বান জানিয়েছেন। তবে বলা বাহুল্য, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। কিন্তু এক পর্যায়ে যখন অন্য সব ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়ে গেল তখন বহু লোক নিজেদেরকে এ প্রশ্ন করল, 'ইসলাম নিয়ে একবার চেষ্টা করেই দেখি না কেন?' এভাবেই ইসলামী রাজনৈতিক দর্শনের উত্থান সম্ভব হয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসলামী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উত্থান সম্পর্কিত অনেক বিষয় সামনে চলে এসেছে। যেমন, কেউ যদি মনে করে গত তেরশ বছর ধরেই মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম প্রভাবশালী রাজনৈতিক বিষয় ছিল; তবে বিংশ শতাব্দী হচ্ছে এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, তাহলে এটা হবে একটি শক্তিশালী যুক্তি। এখন মধ্যপ্রাচ্যের এ সব দেশে ইসলামের পুনরুত্থানকে 'আদর্শে ফিরে যাওয়া' আর সেক্যুলার জাতীয়তাবাদের উত্থানকে 'ঐতিহাসিক ঘটনা' বলেই মনে হয়; তবে 'ঐতিহাসিক ঘটনা' কথাটি এখানে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। ইসলামের ন্যায়বিচারের ভাষা সৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতা ইসলামের বিরাট গুরুত্বের বিষয়টি জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে, যে জনগণ এক কথায় অত্যাচারী সরকারগুলোকে প্রতিহত করতে চায়। কিন্তু এমন সমৃদ্ধ বিবরণও ইসলামপন্থীদের সে লক্ষ্য সম্পর্কে মানুষের সামনে যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারেনি, যে লক্ষ্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বানকারীদের রাজনৈতিক প্লাটফরমে সর্বদা সবার আগে পেশ করা হয়; অর্থাৎ তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী সমাজে শরীয়াকে তার মূল ভূমিকায় ফিরিয়ে নেয়া।[২] এ লক্ষ্য সম্পর্কে উপরের সমৃদ্ধ বিবরণও সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি।

---

১. আমিও এর বাইরে নই। দেখুন, নোয়াহ ফেল্ডম্যান, *After Jihad*, পৃ. ২০, তবে এখানে আমার মূল দাবিটি হচ্ছে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রাজনৈতিক ইসলামের গুরুত্বারোপই এর সফল হবার কারণ। দেখুন, পৃ. ৫০

২. উদাহরণ হিসেবে দেখুন, 'হামাসের আইনসভা নির্বাচন কর্মসূচি'। সেখানে বলা হয়েছে : 'ফিলিস্তিনে ইসলামী আইন হবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উৎস এবং সরকারের তিনটি শাখা

www.pathagar.com

ইসলামপন্থীদের বক্তব্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বলা যায়, বাস্তবিক শরীয়া হচ্ছে এমন বিষয় যা সত্যিই রাষ্ট্রকে ইসলামীকরণ করে। ইসলামপন্থী আন্দোলনকারীদের সরলতম কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী শ্লোগানটি লক্ষ্য করুন, 'ইসলামই সমাধান' (Islam is the Solution)। পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা না করেও বলা যায়, এ শ্লোগানটি বেশ আকর্ষণীয়, তবে অপরিপক্ক।[৩] কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে রাজনৈতিক অকার্যকারিতা ও অর্থনৈতিক স্থবিরতার যে গভীর সমস্যা তা ইসলাম একা কিভাবে পরিবর্তন করতে পারবে?

ইসলামপন্থী এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত দর্শক-শ্রোতা বা সমর্থকদের কাছে জীবনের সকল দিক নিয়ে একটি সর্বব্যাপী কাঠামোভিত্তিক শরীয়াই হচ্ছে ইসলাম। এই কাঠামো যথার্থই বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ককে নির্দেশ করে এবং পাশাপাশি অর্থনৈতিক সুবিচারও ত্বরান্বিত করে। বিষয়টিকে সহজ করার জন্য কোন কোন ইসলামপন্থী এভাবে বলেন, 'ইসলামই আমাদের সংবিধান'। এই দাবি কিছুটা বোধগম্য হবে যদি 'ইসলামই আমাদের সংবিধান' কথাটিকে এ বিষয়ে ইসলামপন্থীদের বিস্তারিত বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার হিসেবে দেখা হয়। অর্থাৎ এ দাবি সম্পর্কে ইসলামপন্থীদের দীর্ঘ ব্যাখ্যা এবং যৌক্তিকতার পক্ষে বিস্তারিত বক্তব্য রয়েছে। সে দীর্ঘ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সংক্ষিপ্তসার হিসেবে কোন কোন ইসলামপন্থী সংক্ষেপে এ শ্লোগানটি দিয়ে থাকেন।

তবে শরীয়াকে শাসনতান্ত্রিক ভিত্তিমূল হিসেবে দেখতে গেলে গত কয়েক শতাব্দীব্যাপী বিস্তৃত সমৃদ্ধ ও জটিল সাংবিধানিক আইন এবং শাসনতান্ত্রিক তত্ত্বের বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হবে। তবেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বানের অর্থ হচ্ছে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার আহ্বান। আমরা যদি একবার এ আহ্বানকে পর্যালোচনার জন্য

যথা আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ স্বাধীন হবে।' http://www.ikhwanweb.com/ lib/Hamas_Program.doc. আরো দেখুন 'শুরা কাউন্সিল ২০০৭ এর জন্য মুসলিম ব্রাদারহুডের নির্বাচনী কর্মসূচি', http:// www. ikhwanweb.com/ Article.asp?ID=822&LevelID=1&SectionID=116; আরো দেখুন আরবীতে লিখিত 'হু আর উই' নামক বিবৃতি যেখানে ইসলামী শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহের তালিকা রয়েছে, http://www.icmkw.org /about_us. aspx

৩. তবু এটা মুসলিম ব্রাদারহুডের অফিসিয়াল শ্লোগান, যদিও এর সঠিক অর্থ কী হবে তা নিয়ে ব্রাদারহুডের নিজেদের মধ্যেই দীর্ঘ বিতর্ক রয়েছে। 'শুরা কাউন্সিল ২০০৭ এর জন্য মুসলিম ব্রাদারহুডের নির্বাচনী কর্মসূচি'-এর ভূমিকায় কেন এ শ্লোগান গ্রহণ করা হয়েছে তার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ইসলাম কেন সমাধান সে প্রশ্নেরও উত্তর দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

আন্তরিকভাবে গ্রহণ করি, তাহলে আমাদের কাছে এ বিষয়টি পরিষ্কার হতে শুরু করবে যে, কেন মুসলিম বিশ্বের এত বিপুল সংখ্যক লোক ইসলামী রাজনীতির প্রতি আগ্রহী। তাদের নিজেদের দেশগুলোর দিকে তাকালে তারা পরিষ্কার দেখতে পায় যে, আইন নয়; ক্ষমতাই এ সব দেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলে। পাশাপাশি তাদের রাষ্ট্রগুলোর ভঙ্গুর অবস্থাও তাদের কাছে লক্ষণীয়। এ পরিস্থিতিতে তাদের কাছে আইনকেই মনে হয় এগুলোর সমাধান। তার চেয়ে বড় কথা, আইনকেই তাদের কাছে তাৎপর্যময় এবং প্রতিশ্রুতিশীল বলে মনে হয়। কেননা মুসলিম বিশ্বের সামষ্টিক ধ্যান-ধারণায় আজও এটি ক্ষীণভাবে হলেও মনে করা হয় যে, পূর্বের ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্র এমন রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল যা আইন দ্বারা শাসিত এবং আইনের মাধ্যমেই পরিচালিত হতো। কিন্তু বর্তমানের মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ক্ষমতা দ্বারা শাসিত; আইনের দ্বারা নয় এবং ক্ষমতাই এগুলোর মূল নিয়ন্ত্রক।

ইসলামী আইনের উৎপত্তি

পশ্চিমা এমনকি পশ্চিমাদের প্রভাবাধীন শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক মুসলিমের কাছেও এটা বিস্ময়কর শোনাবে যদি বলি, উসমানিয়া সাম্রাজ্য এবং এর আগের বিভিন্ন রাজবংশ দ্বারা শাসিত ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাটি মৌলিকভাবে আইনসম্মত ও আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পশ্চিমা লেখকরা বহু শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাপকভাবে মুসলিম বিশ্বকে 'প্রাচ্যের স্বৈরশাসকদের দেশ' বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে, পশ্চিমা শাসকরা যতটুকু সীমাবদ্ধতা বা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকে শাসন করেছে প্রাচ্যের এ সব শাসক এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ থেকেও মুক্ত ছিল। সত্যি বলতে কি, অত্যন্ত জ্ঞানী ও আইনকে পছন্দ করেন এ ধরনের পশ্চিমা চিন্তাবিদদের অনেকেই (যেমন মন্টেস্কো এ ক্ষেত্রে সুবিদিত উদাহরণ) সম্ভাব্য নিকৃষ্টতম আইন-বহির্ভূত শাসন সম্পর্কে তাঁদের যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সে দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে মুসলিম প্রাচ্যের চিত্রকে ব্যবহার করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, মুসলিম প্রাচ্য হচ্ছে সম্ভাব্য নিকৃষ্টতম আইন বহির্ভূত শাসনের দৃষ্টান্ত।[৪]

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা এ ধরনের কাজ ঘৃণা বা বিষাক্ত মন নিয়ে করেননি; করেছেন এ কারণে যে, যে কোন উত্তম রাজনৈতিক প্রতীকের জন্য ইউটোপিয়া (কাল্পনিক সুখের রাজ্য) ও ডাইসটোপিয়া (কাল্পনিক খারাপ রাজ্য)-এ দুয়ের মাঝে তুলনা দরকার হয়। এমন কি জার্মানীর নাম করা সমাজতত্ত্ববিদ ম্যাক্স ওয়েবারের মত সূক্ষ্ম চিন্তাবিদও ইসলামকে অনেকটা এভাবেই ব্যবহার

৪. দেখুন, মন্টেস্কো, *Letters Persans, in Montesquieu, Oeuvres Completes,* সম্পাদনা : কোর্টনী ও অন্যান্য, খ. ১, (অক্সফোর্ড : ভলতেয়ার ফাউন্ডেশন, ২০০৪)

www.pathagar.com

করেছেন। তিনি যখনই আইনি ভিত্তি ছাড়া কোন বিচারের রায় দেয়ার উদাহরণ বর্ণনা করতে চেয়েছেন তখনই তিনি খেজুর গাছের নিচে বসে মুসলিম কাজী বা বিচারক তার কাছে যেমনটি সঠিক মনে হয় সেভাবে বিচারের রায় দিচ্ছেন এমন একটি চিত্রকে ব্যবহার করেছেন।[৫]

কিন্তু তাঁরা যা বলেছেন তার চেয়ে বড় সত্যের অপলাপ আর কী হতে পারে?[৬]

---

৫. দেখুন, ওয়েবার, *Kadijustiz* (qadi justice), ম্যাক্স ওয়েবার, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, সম্পাদনা : গুয়েন্থার রথ এবং ক্লজ উইটিক, অনুবাদ : এফরেইম ফিশফ (Ephraim Fischoff) ও অন্যান্য (বার্কলী ও লসএঞ্জেলস : ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৭৮), খ. ৩, পৃ. ৯৭৬; ব্রায়ান টারনার, *Weber and Islam* (লন্ডন : রাউটলেজ ও কেগান পল, ১৯৭৮), পৃ. ১০৯-২১। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য দেখুন, ব্যাবার জোহানসেন, *Contingency in a Sacred Law : Legal and Ethical Norms in the Muslim Fiqh* (লেইডেন : ব্রিল, ১৯৯০), পৃ. ৪৭-৫১, বিশেষ সংখ্যা ১৮৩, যেখানে তিনি বলেছেন, পরিভাষাটি ওয়েবারের আবিষ্কার নয়; এটি রিচার্ড স্মিদ (Richard Schmidt) এর আবিষ্কার। ফেলিক্স ফ্রাঙ্কফুর্টার ওয়েবারের ইমেজ আমেরিকার আইনি তালিকার মধ্যে এনেছেন। দেখুন, *Terminiello v. City of Chicago*, ৩৩৭, ইউএস ১, ১১ (১৯৪৯) (ফ্রাঙ্কফুর্টার, জে. ভিন্নমত করেন) ('কাজী যেমন গাছের নিচে বসে ব্যক্তিগত বাস্তবতা বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার করতেন আমরা এভাবে বসি না।')

৬. দেখুন, ডেভিড এস. পাওয়ারস, *Law, Society and Culture in the Maghrib, 1300-1500* (ক্যামব্রিজ : ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০২), পৃ. ২৩-৫২: এবং আরো দেখুন, *Dispensing Justice in Islam : Qadis and Their Judgments* - এ সম্পাদকদের ভূমিকা আলোচনা, সম্পাদনা : মুহাম্মদ খালিদ মাসুদ, রুডল্‌ফ পিটারস এবং ডেভিড পাওয়ারস (লেইডেন : ব্রিল, ২০০৬), পৃ. ১-৪৪। আরো দেখুন বুলিয়েট, *The Case*, পৃ. ৬৫-৬৬ (লক্ষ্য করেছেন যে, 'ওয়েবার যেভাবে কাজিকে চিহ্নিত করেছেন আলেম সমাজ সবিস্তার পুনঃপুন তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।') এর অর্থ এই নয় যে, ইসলামী দুনিয়ায় পূর্বে বা আজকে এমন দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক নেই যারা আইনি উপাদানের সংক্ষিপ্ত কিংবা বিস্তারিত রেফারেন্স ছাড়া কোন মামলার/বিষয়ের বাস্তব তথ্য সংগ্রহ এবং বিচার করে রায় দানের মাধ্যমে সমাধান করে। বিংশ শতাব্দীতে এর উদাহরণ দেখার জন্য দেখুন লরেন্স রোজেন এর নৃতত্ত্ব বিষয়ক রচনা, বিশেষত *Anthropology of Justice : Law as Culture in Islamic Society* (ক্যামব্রিজ : ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৯)। তবে এ ধরনের আদালত আইনের শাসনের নীতিকে বা ইসলামী আইনি ব্যবস্থার কাঠামোকে দুর্বল করে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ভিত্তিক আদালত বা স্টেট সালিশী আদালত আইনের শাসনকে যেভাবে দুর্বল করে এ ধরনের আদালত তা করে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ সব আদালত বা সালিশী ব্যবস্থা বিচারিক কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে এক ধরনের দায়সারা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং এভাবে সে দেশে আইনের শাসনকে কিছুটা হলেও অনিশ্চিত করে তুলেছে। বস্তুত যে কোন আইনি ব্যবস্থা হচ্ছে জটিল

www.pathagar.com

বাস্তবতা হচ্ছে, ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রে আইন বহির্ভূতভাবে নয়, বরং মুসলিম বিচারক বা কাজিগণ সুস্পষ্ট আইনের ভিত্তিতে রায় দিতেন। যখন আইনে উদাহরণ না পেতেন তিনি একজন যোগ্য জুরিস্ট বা আইনজ্ঞের কাছে যেতেন তাঁর সহায়তার জন্য। ঐ জুরিস্ট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফতওয়া বা আইনি ব্যাখ্যাস্বরূপ[৭] তাঁর মতামত দিতেন। বিচারক ও জুরিস্টের ভূমিকা কী হবে তা সে যুগে আইন ও প্রচলিত সামাজিক রীতি দ্বারা সতর্কতার সাথে চিহ্নিত ও সংজ্ঞায়িত করা হতো। বিচারক বা কাজী একজন সরকারি কর্মকর্তা দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন, যে এ নিয়োগদান কাজের জন্যই নিযুক্ত হতো। ঐ কর্মকর্তা সরাসরি খলীফার কাছে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করত আর খলীফা সুন্নী ইসলামী রাষ্ট্রের আইনি কাঠামোর সর্বোচ্চ অবস্থানে অবস্থান করতেন। অন্যদিকে জুরিস্ট বা আইনজ্ঞ 'মুফতি' উপাধি লাভ করতেন, যার মাধ্যমে তিনি 'ফতওয়া' দেয়ার আইনি অধিকার অর্জন করতেন। তাঁর চেয়ে উচ্চস্তরের বয়োজ্যেষ্ঠ ইসলামী পণ্ডিতদের কাছে ব্যাপক পড়াশোনা করার মাধ্যমে তিনি এ যোগ্যতা অর্জন করতেন। ঐ বয়োজ্যেষ্ঠ পণ্ডিত ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁদের ছাত্রদেরকে এ ধরনের আনুষ্ঠানিক আইনগত বিষয়ে অনুশীলনের ব্যাপারে কর্তৃত্ব প্রদানের অধিকার সংরক্ষণ করতেন।[৮]

ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রে আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ, দক্ষ এবং স্ব-নিয়ন্ত্রিত বা সংযত ইসলামী পণ্ডিত বা আলেম সমাজ আইনি ব্যবস্থার ঠিক ততটাই অংশ

প্রকৃতির; সাধারণত এটি অনেকগুলো অংশ বা উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং বিচারিক রায় দিতে গিয়ে প্রায়ই নানা রকম পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। যা হোক, ইসলামী আইন বিষয়ে রোজেনের বেশির ভাগ একাডেমিক সমালোচনামূলক নিবন্ধে ব্যবহারিক দিকের চেয়ে তত্ত্বের দিকটিতে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারটাকে ততদূর টেনে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না যাতে এটা আইনী প্রতিষ্ঠানের একটি আংশিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে নতুন ওয়েবারিয়ান পরিভাষায় ইসলামী আইনের অধীনে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে।

৭. কোথাও কোথাও দূরবর্তী অঞ্চলে অযোগ্য বিচারক ছিল যাদের বিচার সম্ভবত ওয়েবারের ভাষায় 'কাজির বিচার' এর মত ছিল। কিন্তু ইসলামী আইনজ্ঞ সমাজ যখনই তাদের সম্পর্কে জানতে পেরেছেন তারা আইন বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিকে সেখানে বিচারক হিসেবে পাঠানোর চেষ্টা করেছেন। উদাহরণ হিসেবে দেখুন: বারনার্ড হেইকেল, *Revival and Reform in Islam* (ক্যামব্রিজ : ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৩), পৃ. ১২৭, (তিনি শাওকানীর উদাহরণ দিয়েছেন, যিনি অযোগ্য বিচারকদেরকে সরিয়ে তাদের পরিবর্তে উপযুক্ত লোক নিয়োগ দেয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।)

৮. মুফতী বিষয়ে দেখুন, *Islamic Legal Interpretation : Muftis and Their Fatwas,* সম্পাদনা : মুহাম্মদ খালিদ মাসুদ, ব্রিঙ্কলি মেজিক ও ডেভিড এস পাওয়ারস (ক্যামব্রিজ : হারভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৬), বিশেষত দেখুন, পৃষ্ঠা ৩-৩২

www.pathagar.com

ছিলেন যতটা ছিলেন বিচারক বা কাজীগণ। বিচারকরা সাধারণত অভিজ্ঞদের মধ্য থেকেই নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন। খলীফা কর্তৃক নিয়োগ পেয়ে এবং সরকারি তহবিল থেকে সম্মানী পেয়ে বিচারকরা রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ হয়ে যেতেন। কিন্তু আলেম সমাজের কেউ এভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ হতেন না বিধায় তাদের কেউ সরকারের লোক বলেও গণ্য হতেন না, বরং তারা পণ্ডিত ও বিদ্বান হিসেবে সামাজিক স্বীকৃতি পেতেন তাদের শিক্ষা ও নিজ নিজ জ্ঞানের শাখায় যোগ্যতা দ্বারা এবং তাদের সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হতো অন্যান্য আলেমের কাছে তাদের খ্যাতি ও সম্মানের ভিত্তিতে।[৯] শুধু তাই নয়, বিচারক নয় বরং আলেম সমাজই সে যুগে আল্লাহর আইনের ব্যাখ্যা করার একচেটিয়া অধিকার ভোগ করতেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ ধরনের ব্যবস্থা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল? যে আলেম সমাজের খুব সামান্যই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল, যাদের সৈন্যবাহিনী ছিল না, ছিল না কোন সরকারি পদ ও পদবী, তারা কিভাবে শরীয়ার একমাত্র রক্ষক হয়ে গেল এবং এর মাধ্যমে শাসকের ক্ষমতার একমাত্র কার্যকর নিয়ন্ত্রক হল? এর উত্তর ইসলামী রাষ্ট্রের পাশাপাশি ইসলামী আইনের উদ্ভব ও বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ স. তাঁর জীবদ্দশায় মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনে কিছু আইনের কথা আছে যেগুলো মূলত ধর্মীয় আচার (নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি) এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কিত। তবে পবিত্র কুরআন কোন আইনের গ্রন্থ নয়; হিব্রু বাইবেলে যে ধরনের আইনের বিশদ বিবরণ রয়েছে আইনের সে রকম বিশদ বিবরণ এতে নেই। যে ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে কোন প্রত্যক্ষ নির্দেশনা পাওয়া যায় না, মুসলিমদের প্রথম প্রজন্ম অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের এরূপ কোন বিষয়ে যখন নির্দেশনার প্রয়োজন দেখা দিত, তারা সরাসরি রাসূল স.-এর কাছে সে বিষয়ে জানতে চাইতেন। এ সব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ স. কখনো নিজে থেকে উত্তর দিতেন; সেটাও আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত অপ্রত্যক্ষ অহীর মাধ্যমে পাওয়া নির্দেশনা অনুযায়ী করতেন; আর যদি তিনি নিশ্চিত না হতেন তবে নতুন প্রত্যক্ষ প্রত্যাদেশ বা অহীর মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে নির্দেশনা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতেন অথবা সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন।

---

৯. যামানের *The Ulama in Contemporary Islam*, পৃ. ১৯৩, নং-৩ –এ আলেম সমাজের উপর ব্যাপকভিত্তিক রচনার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসূত্র দেখুন।

www.pathagar.com

নবী মুহাম্মাদ স.-এর তিরোধানের সাথে সাথে মুসলিমদের কাছে অহী আগমনের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। তখন ধর্মীয়-রাজনৈতিক নেতৃত্বের মর্যাদা পরপর খলীফাদের উপর ন্যস্ত হয়, যাঁরা রাসূলুল্লাহ স.-এর স্থলাভিষিক্ত হন। আরবী 'খালীফা' (خليفة) শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত (Caliph হচ্ছে শব্দটির ইংরেজি সংস্করণ)।

মনে হয় প্রথম দিকের কোন কোন খলীফা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রতিনিধি বলে ভাবতেন।[১০] ফলে এটা তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কথা বলার ব্যাপক কর্তৃত্ব দিয়েছিল বলে মনে হয়; যদিও তাঁরা নবুওয়াত পাওয়ার দাবি কখনো করেননি। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, খলীফা হচ্ছেন আল্লাহর বাণীবাহক মুহাম্মদ স.-এর প্রতিনিধি; আল্লাহর নয়। এর ফলে কোন জটিল আইনি বিষয়ের সমাধানের প্রশ্ন যখন খলীফাদের সামনে আসে, তাঁরা নাজুক ও জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। তাঁরা রাসূলল্লাহ স.-এর কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব পেয়েছেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ স. প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর কাছ থেকে যে প্রত্যাদেশ বা অহী লাভ করতেন সে সুযোগ তাঁদের ছিল না। এ অবস্থায় এই বিষয়টি মুসলিম সমাজকে এক ধরনের বাধার সম্মুখীন করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি কোন বিষয়ে পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে কিছু না বলে তাহলে সে বিষয়ে কিভাবে আইন প্রণীত বা উদ্ভাবিত হবে?

এ প্রশ্নের উত্তর ইসলামী শাসনের প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তৈরি হয়েছে। সেটি হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ স.-এর জীবদ্দশায় তিনি যে কথা বলেছেন বা কাজ করেছেন, যাকে এক কথায় সুন্নাহ বলা হয়, সেটা কুরআনে যে প্রত্যক্ষ অহী রয়েছে তার সম্পূরক হতে পারে। এ সব কথা ও কাজ মৌখিক বিবরণীর মাধ্যমে একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে, যার সূচনা হয়েছে এমন একজনের মাধ্যমে যিনি প্রথমে ঐ কথা সরাসরি রাসূলুল্লাহ

---

১০. ক্রোন ও হিন্ডস, *God's Caliph*, আরো দেখুন, *God's Rule*; (খুলাফায়ে রাশিদীনের কেউ নিজেকে আল্লাহর প্রতিনিধি বলে ভাবতেন এটি কোন নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থ বা সাহাবীদের জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যায় না। বরং প্রথম খলীফা আবু বকর রা.-কে সকলে খলীফাতুর রাসূল বা রাসূলের প্রতিনিধি বলত। বাকীদেরকে খলীফাতুল মুসলিমীন বা মুসলিমদের প্রতিনিধি বলা হতো। তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে কথা বলতেন ব্যাপারটি এমনও নয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে কথা বলতেন। অন্যদিকে খলীফা মুহাম্মাদ স.-এর প্রতিনিধি; আল্লাহর নয়- এ বিষয়টি সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে কয়েক শতাব্দী লাগেনি; আরো অনেক কম সময়ের মধ্যেই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়-অনুবাদক)।

www.pathagar.com

স.-এর কাছে শুনেছেন অথবা ঐ কাজ সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন। তবে কোন একটি নির্দিষ্ট বাস্তব ঘটনার প্রেক্ষিতে উদ্ভূত কোন হাদীস এমন বহু আইনি বিষয়ের সরাসরি সমাধান দিতে পারে না, যে আইনি সমাধানগুলো ভবিষ্যতে উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত। এ কারণে এক বাস্তব পরিস্থিতিকে আরেক বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে (কিয়াস করে) সিদ্ধান্তে পৌঁছা জরুরি হয়ে পড়ে। এ ছাড়া কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কী করণীয় হবে সে বিষয়ে আলেমদের সকলের বা অধিকাংশের ঐকমত্যও (ইজমা) সমাধানের অন্যতম উপায় বলে পরিগণিত হয় এবং এর যথেষ্ট গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতাও ছিল।

পবিত্র কুরআন, রাসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস বা সুন্নাহ, কিয়াস ও ইজমা এ চারটি বিষয়ের সমন্বয়ে ইসলামী আইনি ব্যবস্থার মূল ভিত্তি গড়ে উঠেছে।[১১] কিন্তু কে বলতে পারবে এ চারটি মূলনীতি কিভাবে সমন্বিতভাবে ব্যবহৃত হবে? কার এ কর্তৃত্ব রয়েছে যার বলে তিনি বলতে পারবেন এই বিষয়গুলোই আইনের উৎস; অন্য কিছু নয়? প্রথম চার খলীফা, যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে রাসূলুল্লাহ স.-কে জানতেন, যাঁরা দ্রুত সম্প্রসারণশীল এক সাম্রাজ্যকে নেতৃত্ব দিয়েছেন- যে সাম্রাজ্যে শাসন ব্যবস্থার চেয়ে দেশ বিজয়ের প্রতি বেশি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে-, তাঁরা হয়ত নিজেদেরকে এই যোগ্যতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী বলে দাবি করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের পর যাঁরা খলীফা হয়েছেন তাঁরা ক্রমবর্ধমান হারে এমন একদল লোককে পেয়েছিলেন যারা ইসলামী আইনের বিদ্যমান উৎসগুলো থেকে সামষ্টিকভাবে আইন উদ্ভাবন করতে পারবে বলে দাবি করত। মানবেতিহাসে প্রতিটি আইনি ব্যবস্থার উদ্ভবকালে এমন একটি পর্যায় সামনে এসেছে, যখন অবশ্যই কাউকে না কাউকে এটি জোর দিয়ে বলতে হয়েছে যে, আইন কী বা কোন্‌টি তিনি সে বিষয়ে বলার যোগ্যতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। কিন্তু এ ধরনের লোক সংখ্যায় অল্প ছিল। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইন কোন্‌টি বা আইন কী তা নির্ধারণে কর্তৃত্ব রয়েছে বলে যারা দাবি করত এমন স্ব-

---

১১. নাট ভিকারের (Knut Vikor), *Between God and The Sultan : A History of Islamic Law,* (অক্সফোর্ড : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৫) এই সাম্প্রতিক গ্রন্থটি প্রশংসনীয়ভাবে গত কয়েক দশকের ইসলামী আইন বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা বা আলোচনাকে একিভূত করেছে এবং এখন সম্ভবত এটি এন. জে. কুলসনের সাধারণ ইতিহাসের ভূমিকা স্বরূপ লিখিত *A History of Islamic Law,* (এডিনবার্গ : এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৪) এর স্থান দখল করতে পারে।

(আইনের মূলনীতি বিজ্ঞান বা আইনের চার উৎসের উৎপত্তি এবং এগুলোর পারস্পরিক ব্যবহার কয়েক শতকে নয়, রাসূলুল্লাহ স.-এর মৃত্যুর এক দু দশকের মধ্যেই উদ্ভূত হয়-অনুবাদক)।

www.pathagar.com

নিয়োজিত দলটিই বিদ্বান বা আলেম বলে পরিচিতি লাভ করে। বলা বাহুল্য, কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত এ দলটি একটি বিশালায়তনের মুসলিম সাম্রাজ্যে সুসংগঠিত আইনি ব্যবস্থার প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করেছে। এভাবে তাদের এ অবদানের ফলে মুসলিম খলীফারা তাদেরকে নিজ নিজ দেশে আইনের অভিভাবক বলে স্বীকৃতি দেন।

রাসূলুল্লাহ স.-এর উত্তরাধিকারী

যে প্রক্রিয়ায় আলেম সমাজ আইনের একটি স্বতন্ত্র ধরন হিসেবে যুগপৎ ইসলামী আইন উদ্ভাবন করেছেন এবং এ আইনের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাকারী হিসেবে নিজেদেরকেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন সে প্রক্রিয়া সত্যিই কিছুটা জটিল।[১২] অবশ্য যে কোন আইনি ব্যবস্থার উৎস বা সূচনা বর্ণনার ক্ষেত্রে এটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। আইনি ব্যবস্থার ইতিহাস প্রায়ই ধোয়াশাচ্ছন্ন। কাজেই যারা আইন নিয়ন্ত্রণ করে তাদের উচিত এমনভাবে কাজ করা যেন তারা আইন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। ইংলিশ সাধারণ আইনের (English Common Law) বিচারকরা আইনের উৎসমূল নিয়ে এ ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করতে গিয়ে দাবি করেছেন যে, মানুষের স্মরণাতীত কাল থেকে ঐ আইনের সূচনা হয়েছে।[১৩] এভাবে ঐ আইনের উৎস বা সূচনা নিয়ে যে সমস্যা ছিল তারা তার সমাধান করেছেন। ইসলামী পণ্ডিত অর্থাৎ আলেমদের ক্ষেত্রে বিষয়টি ছিল বিপরীতধর্মী। এ ক্ষেত্রে তাদের স্মৃতি স্মরণাতীত কাল নয় বরং পিছনের দিকে নির্দিষ্ট একটি কাল অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগ পর্যন্ত সীমিত ছিল। বস্তুত স্মৃতিশক্তিই ছিল রাসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাহ বা তাঁর জীবনাচার সম্পর্কে প্রমাণ স্বরূপ যে সমস্ত উক্তি রয়েছে সেগুলো জানার গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

যা হোক, রাসূলুল্লাহ স.-এর জীবনাবসানের পর থেকে ইসলামী আইনি সমাধান লাভের সহজতম যে পন্থাটি ছিল সেটি হচ্ছে, প্রথম দিকের একদল আলেম ছিলেন যারা রাসূলুল্লাহ স.-এর আচরণ সম্পর্কিত বিবরণ সংগ্রহ করতেন

---

১২. ওয়েল বি. হালাক (Wael B. Hallaq), *The Origins and Evolution of Islamic Law,* (ক্যামব্রিজ : ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৫), পৃ. ৬৩-১০১ এ বিষয়ে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে ভালো রূপরেখা পেশ করেছে। আরো দেখুন ওয়েল বি. হালাক, *A History of Islamic Legal Theories : An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh,* (ক্যামব্রিজ : ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৭), পৃ. ১-৩৫

১৩. এডওয়ার্ড কক, *Reports,* 3:vi-vii. জন সেলডেনের সন্দেহবাদিতাসহ আলোচনার জন্য দেখুন, জে. ডব্লিউ. টাব-এর *The Common Law Mind : Medieval and Early Modern Conceptions,* (বাল্টিমোর : জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০০), পৃ. ১৪১-৫৪

www.pathagar.com

এবং এসব বিবরণ দেখে যুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে বিভিন্ন আইনি সমাধান উদ্ভাবন করতেন। বাস্তবতা হচ্ছে এ রকম ক্ষেত্রে এমনটিই হওয়ার কথা; কেননা মানুষ সব সময় বাস্তব সমস্যা বা মতদ্বৈততার সমাধান খুঁজে। সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ বা মতদ্বৈততা, যেমন, রাসূলুল্লাহ স.-এর কন্যা ফাতিমা রা. ও প্রথম খলীফা আবু বকর রা.-এর মাঝে এ সম্পর্কিত আইনি নীতিমালা নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল[১৪], স্বাভাবিকভাবেই আলেম সমাজ এ ধরনের মতবিরোধের বিষয়গুলো অনুধাবন করতে পারতেন।

আলেম সমাজ অপরিপক্কের মত রাসূল স. সম্পর্কে যাই বলা হয় তাকেই সত্য বলে মনে করেনি। তুলনামূলকভাবে ইসলামের প্রথম দিকের ইতিহাসে দেখা যায়, তারা হাদীসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা এবং ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে বানানো হাদীসের মাঝে পার্থক্য করতে শুরু করেন। যখন রাসূল স.-এর মৃত্যুর পর এক সময় হাদীস সম্পর্কিত এ সব বর্ণনা ক্রমবর্ধমান বিশেষজ্ঞ বর্ণনাকারীর মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে এবং অগণিত মানুষ এগুলো স্মৃতিতে ধারণ করে, খারাপ বা ভুল বর্ণনাগুলো থেকে সঠিকগুলোকে বাছাই করে বের করে নিয়ে আসাও তখন ততটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।[১৫]

পরিণতিতে এভাবে কথিত হাদীসের মধ্যে কোন্‌টি সঠিক ও কোন্‌টি নয় তা বাছাই করার জন্য কিছু নিয়ম ও নীতি তৈরি হয়। এ নিয়ম-নীতিগুলো মূলত এক বর্ণনাকারী কর্তৃক আরেক বর্ণনাকারীর কাছে হাদীস বর্ণনার যে ধারাবাহিকতা তাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়। অতঃপর বর্ণনাকারীর ধারাবাহিকতার বিবরণ (অর্থাৎ সনদের বিবরণ) মূল হাদীসের বর্ণনার পাশাপাশি সংযুক্ত করা হয় এবং সেগুলো মুখস্থ করারও রীতি গড়ে ওঠে। যখন সংগৃহীত হাদীসগুলো লিখে ফেলা হচ্ছিল (প্রাথমিকভাবে লিখে ফেলার পর তিন

---

১৪. মদীনার নিকটবর্তী ফাদাক বিষয়ে বিতর্ক সম্পর্কে দেখুন Encyclopedia of Islam, দ্বিতীয় সংস্করণ, q. v. 'Fadak'

১৫. সাধারণভাবে হাদীসের বর্ণনার যথার্থতার প্রশ্নটি (অর্থাৎ উসূলে ফিকহ ও আসমাউর রিজাল) ইসলামী আইন বিষয়ক স্টাডি বা গবেষণায় একটি আকর্ষণীয় বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। সবচেয়ে সন্দেহবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল জোসেফ শাখ্‌ত (Joseph Schacht) এর লেখায়, *An Introduction to Islamic Law*, (অক্সফোর্ড : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৪)। সাম্প্রতিক আরো কিছু পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাকর্মে এ বিষয়ে আরো তথ্য-উপাত্ত রয়েছে বলে জানা যায়। আমি যে বিষয়টি বলতে চাই সেটি হচ্ছে, প্রথম যুগের ইসলামী পণ্ডিত বা আলেমদের কাছেই ভুল বা ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনা থেকে সঠিক বর্ণনাগুলোকে আলাদা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল।

www.pathagar.com

শতকেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর) হাদীসের মূলনীতি বিজ্ঞান অর্থাৎ উসূলে হাদীস (Jurisprudence of Hadith) বলে জ্ঞানের একটি শাখা তৈরি হয়ে যায়, যা বর্ণনাকারীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাদের নির্ভরযোগ্যতা এবং সর্বোপরি বর্ণনা বা সনদের যে ধারাবাহিকতা তার যথার্থতা নিরূপণ করে। রাসূলুল্লাহ স.-এর হাদীসের অবস্থা এভাবে পর্যালোচনা করার বিষয়টি ক্রমে ইসলামী আইন বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণাকর্মের একটি অচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গড়ে ওঠে। তবে আলেমদের পরিপ্রেক্ষিত থেকে যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, আইনি বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন সমাধান খুঁজে বের করা যেমন একান্তই তাদের কাজ ছিল, বর্ণিত এই বিষয়টির চর্চাও তেমনি একান্তই তাদের কাজ ছিল।

আইনের উপাদানগুলো (যেমন পবিত্র কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীসের অংশ) সংগ্রহ ও সংকলন করা এবং এগুলো ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব পালন করার কারণে এক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আলেমদেরকে যথার্থই নবীদের উত্তরসূরী বলা যায়।[১৬] তাত্ত্বিকভাবে বললে বলতে হয়, আলেমগণ আইন তৈরি করতে পারেন না; কেবল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই তা পারেন। অন্যদিকে কেবল নবীগণই বলতে পারেন যে, তিনি অমুক কাজ করেছেন বা করেননি। মুসলিমদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত এক ব্যাপকভিত্তিক ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী মুহাম্মাদ স. নবুওয়াতের ধারা সমাপ্তকারী বা শেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না বা অহী আসবে না। এর ফলে আলেমদেরই আল্লাহর আইন ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করতে হয়েছে। তত্ত্বগতভাবে আলেমগণ যে প্রক্রিয়ায় আইন উদ্ভাবন করেছেন তা ইংলিশ বিচারকরা যেভাবে প্রাচীন দৃষ্টান্ত দেখে যুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে ইংলিশ সাধারণ আইন উদ্ভাবন করেছেন বলে দাবি করেছেন তা থেকে একেবারে ভিন্ন নয়। বাস্তবে উভয় ধরনের বিচারকরা (ইংলিশ ও মুসলিম) এমন যোগ্য ছিলেন যেন তারাই আইন তৈরি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ নতুন আবিষ্কার করে নয়, বরং ব্যাখ্যা করার অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিদ্যমান আইনি উপাদান থেকেই তারা আইন উদ্ভাবন করেছেন।

সময়ের বিবর্তনে ইসলামী পণ্ডিত বা আলেমদের মাঝে অনুসৃত আইনের বিভিন্ন চিন্তাধারা তথা মাযহাব কয়েকজন নির্দিষ্ট প্রধান ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় এবং ইসলামী শাসনাধীন বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে

---

১৬. 'ইন্নাল উলামা-আ ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া'... হাদীসটির জন্য দেখুন সুনানে আবু দাউদ, অধ্যায় : ২৫, হাদীস নং- ৩৬৩৪

www.pathagar.com

তাদের প্রভাব বিস্তৃত হয়।[১৭] যে কোন পরিণত আইনি ব্যবস্থার নিদর্শন হচ্ছে ঐ আইনি চিন্তাধারার এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র থাকে, যা এর পথিকৃৎ ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক গভীরতা থেকে জন্ম লাভ করে। একজন তরুণ আলেম যে কোন মাযহাবের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করতে পারত; যার অর্থ ছিল ঐ তরুণ উক্ত মাযহাব শিখবে এবং বাস্তব কোন বিষয়ে আইনি মতামত দেয়ার সময় উক্ত মাযহাব অনুসরণ করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে।

এক মাযহাবের অনুসারী সে সময় অন্য মাযহাব সম্পর্কেও অবগত ছিল। তারা সাধারণত নিজ নিজ মাযহাবকে সরাসরি কোন আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা দিয়ে প্রকাশ না করে পরোক্ষ ভাষায় একে সংজ্ঞায়িত করত। সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ আলেম ও পণ্ডিতগণ নিজে যে মাযহাবের অনুসারী নয় সে মাযহাবের শিক্ষা অনুযায়ী অথবা কোন মাযহাবকেই বিবেচনায় না রেখে মূল উৎস কুরআন ও হাদীস দেখে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবার অধিকার সংরক্ষণ করতেন। তবে অন্যান্য সাধারণ আইনজ্ঞের নিজ নিজ মাযহাবের সীমার মধ্যে থাকার বাধ্যবাধকতা ছিল, যা তাদের ক্ষেত্রে এক ধরনের নিয়মানুবর্তিতা ও নিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছিল। যা হোক, যে বিষয়টি কোন একটি আইনি ব্যবস্থা বা মাযহাবকে কার্যকর ও আইনসম্মত করে তুলে সেটি হচ্ছে আইন ব্যাখ্যাকারী (অর্থাৎ মাযহাবের ইমাম) দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর ধরন ও প্রকৃতি। উপস্থিত যে সমস্ত আইনি উপাদান তাঁর হাতের কাছে রয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতে এবং খোদ আইনি ব্যবস্থায় স্বীকৃত ব্যাখ্যাদানের কর্তৃত্বমূলক কৌশল দ্বারা নির্ধারিত হয়।

উলামা ও খলীফা

মাযহাবের মত কোন আইনি প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক শূন্যতার মাঝে সৃষ্টি হয় না। নিছক তত্ত্বগত দিকের বিপরীতে কোন আইন বাস্তব জীবনে কার্যকর ও প্রাসঙ্গিক হতে হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা চর্চার প্রক্রিয়ার সঙ্গে এর অবশ্যই একটি সম্পর্ক থাকতে হবে। যদিও পূর্বতন ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী আইন ছিল 'আইনজ্ঞদের আইন'; কেননা এর বিষয়বস্তু নির্ধারিত হতো রাষ্ট্রের পরিবর্তে আইনজ্ঞ-আলেমদের[১৮] দ্বারা। এ আইনই ছিল রাষ্ট্রীয় আইন, যার

---

১৭. প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাযহাব সম্পর্কে দেখুন, জর্জ মাকদিসি'র *The Rise of the Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West* (এডিনবার্গ : এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮১); জ্যাকসন, *Islamic Law and the State*, পৃ. ৬৯-৭৩; ১০৩-২৩; ভিকর, *Between God and the Sultan*, পৃ. ৮৯-১১৩

১৮. এই সূত্রবদ্ধ বিবৃতির ক্লাসিক উৎস হচ্ছে, শাখ্ত (Schacht)-এর *Introduction of Islamic Law*, পৃ. ৫ ('বেসরকারি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এটি প্রণীত ও বিকশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রয়োগ ঘটানোর জন্য রাষ্ট্রের এক ধরনের মেকানিজম বা কার্যপদ্ধতি ছিল; মেকানিজমটি হচ্ছে তৎকালীন বিচার বিভাগ, যেখানে বিচারকবৃন্দ খলীফা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন এবং সরাসরি তারই কর্তৃত্বের অধীনে কাজ করতেন। এ বিচার বিভাগই আইনের প্রয়োগ ঘটাত।

ইসলামী পণ্ডিত বা আলেমরা ইসলামী রাষ্ট্রে কর্ম বিভাজনের বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য গড়ে উঠেছিলেন বলে এক ধরনের তত্ত্ব রয়েছে। এ তত্ত্ব অনুযায়ী 'সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধ' পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশ পালন করার মূল দায়িত্বটি ছিল খলীফার উপর।[১৯] কিন্তু এ কাজ তিনি নিজে থেকে করতে পারতেন না। এর জন্য দরকার ছিল তাঁর দায়িত্ব বিভিন্নজনের মধ্যে ভাগ করে দেয়া, যাদের অন্যতম ছিলেন বিচারকবৃন্দ। আলেম সমাজ আল্লাহর আইন যেভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন বিচারকগণ সেভাবে ঐ আইন প্রয়োগ করতেন। এভাবে খলীফার 'সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধ'-এর দায়িত্ব সম্পাদিত হতো। বিচারক হিসেবে যোগ্য বিবেচিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রয়োজনীয় আইন বোঝা জরুরি ছিল; তবে প্রতিটি জটিল আইনি সমস্যার নিজ থেকে সমাধান দেয়ার যোগ্যতা থাকা তার জন্য জরুরি ছিল না। সে সময় আলেমদের থেকে বিচারকদের বাছাই করার নীতি অনুসৃত হয়েছে। বিচারক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে বিচারকগণ খলীফার আইন মেনে চলার ইচ্ছাকে পরোক্ষভাবে বাস্তব রূপ দিয়েছেন। তবে তারা খলীফার সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করেই দায়িত্ব পালন করতেন। খলীফা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাদেরকে পদোন্নতি দিতে অথবা বরখাস্ত করতে পারতেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, বিচারকরা খলীফার ব্যক্তিগত আইনি ব্যাখ্যা অনুসরণ বা মান্য করতেন। তবে এ নীতি মেনে চলা হতো যে, খলীফা নিজে যে মাযহাবের অনুসারী যতদূর সম্ভব ঐ মাযহাবের লোককে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হতো। এভাবে বিচারকগণ নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন খলীফার পক্ষ থেকে; কিন্তু যে আইন প্রয়োগ করা হতো তা আসত আলেমদের কাছ থেকে।

আলেম সমাজ এবং খলীফার মাঝে ক্ষমতার ভারসাম্যের বিষয়টি বোঝার জন্য উপরের এই সূক্ষ্ম ব্যবস্থাটি আমাদের উপলব্ধি করা খুবই প্রয়োজন। ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতন্ত্রের কোন কোন পণ্ডিত যুক্তি দেখান যে, আলেম

রাষ্ট্র নয়; আইনের মূলনীতি বিজ্ঞানই আইনপ্রণেতার ভূমিকা পালন করে। এ বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ হ্যান্ডবুকগুলোর রয়েছে আইনি শক্তি')।

১৯. মিশেল কুক (Michael Cook), *Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought,* (ক্যামব্রিজ : ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০০)

www.pathagar.com

সমাজ সমসাময়িক শাসকের ক্ষমতার উপর কার্যকর কোন নিয়ন্ত্রণ (Check) প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি; যেহেতু খলীফা বিচারক নিয়োগ দেয়া এবং তাদেরকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা ভোগ করতেন এবং এর মাধ্যমে তাঁর যেমন ইচ্ছা আইনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন।[২০] কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি আইন তৈরির ক্ষমতাসম্পন্ন উপযুক্ত বিচারক বাছাই করার ক্ষমতা সংকুচিত করে তোলে এবং এর মধ্য দিয়ে মামলার ফলাফলকে বা আদালতে উত্থাপিত যে কোন বিতর্কের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করতে চায় বলে মনে হয়।

বিচারকগণ নির্দিষ্ট কোন ঘটনায় যে আইনগত সিদ্ধান্ত দেন, তা থেকে আরো অনেক বেশি কিছু বিশেষত আইনজ্ঞদের আইনে বিদ্যমান রয়েছে। কেননা বিচার বিভাগের বাইরে যে সমস্ত আলেম ও পণ্ডিত রয়েছেন আইনের বিষয়বস্তু এবং আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে তাদের যে মতামত রয়েছে সেগুলোও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বস্তুত আলেমগণ আইন বিষয়ক গবেষণা-গ্রন্থে তাদের মতামত প্রকাশ করতেন অথবা কোন ব্যক্তি যখন তাদের কাছে কোন বিষয়ে জানতে চাইত কিংবা বিচারকরা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে কোন্ আইন প্রয়োগ হবে তা বুঝতে সমস্যায় পড়ে তাদের কাছে ঐ বিষয়ে জানতে চাইতেন তখন ঐ বিষয়ে ফতওয়া দিয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করতেন। অন্যদিকে আইন সংক্রান্ত তাদের রচনাসমূহ বিচারকসহ অন্যান্য আলেম ও পণ্ডিত সমাজের কাছে পরিচিত ছিল। এ অর্থে আইন ছিল প্রায় একটি বাস্তব শক্তি যা পণ্ডিত ও আলেম শ্রেণীর সামষ্টিক অভিজ্ঞতা ও মতামতের সমন্বয়ে গড়ে ওঠেছিল। ফলে যদি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে আইন ভঙ্গ করার জন্য শাসক বিচারকের উপর চাপ প্রয়োগ করতেন, তাহলে তার এ কাজ আলেম সমাজের কাছে পরিষ্কার ধরা পড়ত। কোন বিশেষ ঘটনায় বা মামলায় তার পছন্দ মত ফলাফল পাওয়ার জন্য শাসক চাপ প্রয়োগ করতে পারতেন এবং এ জন্য তার নিয়োগদান ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারতেন। মোটকথা, বিচারকরা ব্যক্তিগতভাবে শাসকের চেয়ে অনেক দুর্বল ছিলেন, যদিও তারা এমন এক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন যারা তাদের চেয়ে ছিলেন অনেক শক্তিশালী। শাসক বিচারের প্রক্রিয়াকে ভুলপথে চালিত করতে পারতেন, তবে তা করা হলে সেটিকে আল্লাহর আইন লঙ্ঘন বলে মনে করা হতো।

---

২০. দেখুন, মন্টোগোমারী ওয়াট, *Islamic Political Thought : The Basic Concepts,* (এডিনবার্গ : এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮), পৃ. ৭৩। ওয়াটের কথা যদি ঠিক মত বলা যায়, তিনিও স্বীকার করেছেন যে, শাসকরা আইন বদলে দিতে পারত না; তবে প্রশাসনিক বিধিবিধান ব্যবহারের মাধ্যমে শাসকরা আইনকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারত (পৃ. ৭৫)। আরো দেখুন টারনার, *Weber and Islam,* পৃ. ১১৫-১৬

www.pathagar.com

আল্লাহর আইন ভঙ্গ করার জন্য যে মূল্য দিতে হতো তা তাচ্ছিল্য করার মত সামান্য ছিল না। আলেম সমাজের ঘোষিত সরকারের তত্ত্ব অনুযায়ী আল্লাহর আইন কার্যকর করাই ছিল শাসকের মূল উদ্দেশ্য এবং তার অস্তিত্বের কারণ। কাজেই কোন শাসকের আইন ভঙ্গ করার অর্থ ছিল ঐ শাসক শাসন করার অযোগ্য। শাসক সাময়িকভাবে কখনো কখনো এ ধরনের অন্যায় করে রেহাই পেয়ে যেতে পারেন। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য যদি সে আইন ভঙ্গ করেই যায় তাহলে তার অর্থ হচ্ছে পৃথিবীতে শাসকের যে দায়িত্ব সে তা পালন করছেন না।

কিন্তু এটা কি শাসকের জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল? প্রশ্নটি উঠেছে, যে কারণে সেটা হচ্ছে, যে শাসক তার শাসন করার যোগ্যতা হারিয়েছে তার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার জন্য আলেমদের কী যোগ্যতা বা ক্ষমতা ছিল? ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রে ক্ষমতার ভারসাম্য সম্পর্কে যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে আমাদের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। এ প্রশ্নের যে একাডেমিক উত্তর প্রায়ই দেয়া হয় সেটা হচ্ছে, শাসকের তুলনায় ইসলামী পণ্ডিত বা আলেমরা মূলত ক্ষমতাহীন ছিলেন এবং তারা বাস্তবতার নিরিখে তাদের এ ক্ষমতাহীন অবস্থাকে মেনেও নিয়েছিলেন।[২১] এটাই ছিল বাস্তবতা। একজন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ সাম্প্রতিক সময়ে এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন যে, যদিও সেকালে শরীয়া শাসনতন্ত্র হিসেবে কাজ করেছিল, 'এ শাসনতন্ত্র প্রয়োগযোগ্য ছিল না'; যেহেতু আলেম শ্রেণী কিংবা সাধারণ জনগণ কেউই তাদের শাসককে

---

২১. এ সম্পর্কিত পরিস্থিতি যথার্থ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বুলিয়েট তাঁর এ মন্তব্যের মাধ্যমে, যেখানে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, 'যেমনটি ইসলামের প্রতিটি ঐতিহাসিক জানেন যে, বাস্তবে আলেম সমাজ খুব কমই শাসকের নিপীড়ন ঠেকাতে পেরেছেন।' *The Case*, পৃ. ৬৪। আরেকজন পণ্ডিত এ বিষয়ে লিখেছেন, 'বাস্তবতা হচ্ছে, এই ঘটনাটি (যে বিষয়ে তিনি আলোচনা করছেন) শাসক ও আলেমদের মধ্যকার এমন অবস্থা প্রতিফলিত করে যাকে এ ক্ষেত্রে নমুনা বা আদর্শ বলা যায় (শাসক আলেমদেরকে তার উপদেষ্টা, পরামর্শক এবং ধর্মীয় আইনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে প্রত্যাশা করে এবং গ্রহণ করে) তবে এ বর্ণনার ঐতিহাসিক সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়।' ম্যারিবেল ফিয়েরো (Maribel Fierro), 'Caliphal Legitimacy and Expiation in al-Andalus'; মাসুদ, ম্যাজিক (Messick) এবং পাওয়ারস, *Islamic Legal Interpretation : Muftis and their Fatwas*, পৃ. ৬১। ভুলটি ফিয়েরোর নয়, যিনি মূলত বলেছেন যে, এখানে যে শাসকের কথা বলা হচ্ছে তিনি দ্বিতীয় আব্দুর রহমান; তিনি আলেমদেরকে সম্মান করতেন এবং তাদের মতামত গ্রহণ করতেন এবং তাদেরকে তিনি 'নবীগণের উত্তরসূরী' বলেই মনে করতেন।

www.pathagar.com

সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে আইনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে বাধ্য করার মত অবস্থানে ছিল না।[২২]

কিন্তু আমি বলব, এ উত্তর কোন সাংবিধানিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা কেন্দ্রিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম চরিত্রকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। এটি খুব কমই দেখা যায় যে, শাসনতন্ত্র বিচারককে বা সরকারের বাইরের অন্য কোন ব্যক্তিকে এমন ক্ষমতা দিয়েছে যার মাধ্যমে বিচারক বা ঐ ব্যক্তি নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারীকে, শক্তির মাধ্যমগুলো যার হাতে রয়েছে, তাকে মান্য করতে বাধ্য করতে পারে। শক্তির এমন মাধ্যম, যার দ্বারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অস্ত্রের জোর ছাড়াই নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারে, এমন মাধ্যম সবসময়ই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। প্রয়োজন ও পরিকল্পনার বিচারে এ ধরনের মাধ্যম সবসময় লেখা ও ধারণার (Idea) মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয় এবং বিকশিত হয়; শক্তির জোরে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে এর উৎপত্তি হয় না। যা হোক, সেকালে প্রকৃতপক্ষে শাসককে সঠিক পথে রাখার জন্য আলেম ও পণ্ডিত শ্রেণীর কাছে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ উপায় ছিল যেগুলো তারা তাদের ইচ্ছা মত ব্যবহার করতে পারতেন। আলেম শ্রেণী প্রকৃতপক্ষে কেমন ছিল তা বোঝার জন্য তারা তাদের কর্তৃত্ব সম্পর্কে নিজেরা যা বলেছেন আর বাস্তব জীবনে তারা যেভাবে আচরণ করেছেন, (যে আচরণ তাদের গ্রন্থে লিখিত বক্তব্যের সাথে কখনো কখনো মিলেনি), এ দুটো দিককেই আমাদের পর্যালোচনা করে দেখা উচিত।

আলেম ও পণ্ডিত শ্রেণীকে বলতে শোনা যায় যে, আইনই তাদেরকে খলীফা নিয়োগ দেয়ার এবং তাকে বরখাস্ত করার অধিকার দিয়েছে। আলেম সমাজের দ্বারা লিখিত শাসনতান্ত্রিক আইন সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলোতে বলা হয়েছে যে, খলীফা হওয়া কোন বংশীয় অধিকার নয়। খলীফাকে তার পূর্বসূরী এ পদের জন্য বাছাই করতে পারেন অথবা একদল নির্বাচক তাকে এ পদে নিয়োগ দিতে পারেন, যারা সামগ্রিকভাবে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখা এবং সমাজের বন্ধন শিথিল করে দেয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং সে অর্থে এ বিষয়ে ক্ষমতা

---

২২. ক্রোন, *God's Rule*, পৃ. ২৮১-৮৩, তারপর ক্রোন বলেছেন, 'কেউ একে সাংবিধানিক সরকার বলতে পারত না, এমন কি যদিও ন্যায় কখনো কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল' (পৃ. ২৮৪), প্রাসঙ্গিক আরেকটি কথা হচ্ছে এই যে, 'আইন যখন শাসকের কর্তৃত্ব এবং জনগণের আনুগত্য করার কর্তব্য- এ দুটো ক্ষেত্রেই সীমারেখা টেনে দিয়েছিল, তখন তা শক্তি প্রয়োগ ছাড়া এমন কোন ব্যবস্থা বা পদ্ধতি অবশিষ্ট রাখেনি যার দ্বারা শাসকের আইন লঙ্ঘন প্রতিরোধ বা চ্যালেঞ্জ করা যেত'। বার্নার্ড লুই, *The Political Language of Islam*, (শিকাগো : ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, ১৯৮৮), পৃ. ১১৩

www.pathagar.com

রাখে। উল্লেখ্য, এ দলটি সেকালে কোন খলীফা পদপ্রার্থী উক্ত পদের যোগ্য কিনা সেটা নিশ্চিত করত। অতঃপর তারা খলীফা পদে মনোনীত ঐ ব্যক্তির সাথে এক ধরনের চুক্তি (বায়'আত) করে তার প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করত। বিনিময়ে তিনি আইন মানতে বাধ্য থাকতেন। কিছু আলেম বলেন যে, কোন খলীফাপ্রার্থীকে তার পূর্বসূরী যদি বাছাই করেও থাকেন তবু তার নির্বাচকমণ্ডলীর অনুমোদন প্রয়োজন ছিল এবং প্রয়োজন রয়েছে। তবে সকল আলেমের মতেই আলেম সমাজই ছিলেন সে যুগে নির্বাচকমণ্ডলী।

সাংবিধানিক আইন সম্পর্কিত গ্রন্থগুলোতে এটাও বলা আছে যে, যদি শাসক ন্যায়বিচার করতে ব্যর্থ হয় অথবা এমনভাবে অক্ষম হয়ে যায় যে, তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে না, তাহলে ঐ শাসক তার দায়িত্ব পালনের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। 'আলেম সমাজ শাসককে অযোগ্য ঘোষণার অধিকার রাখে'-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ঠিক রাখার স্বার্থে এ ধরনের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার ব্যাপারে তারা সতর্ক ছিল। একজন আলেম বলেছেন, 'অনেক লোক বিশ্বাস করে, খলীফা যদি মন্দ কাজ করেন এবং অত্যাচারী হন তবে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা উচিত।'[২৩] তিনি অবশ্য অনেক লোক বলে কাদেরকে বুঝিয়েছেন তা স্পষ্ট করেননি। যা হোক, এই অনুসিদ্ধান্ত বা ইঙ্গিতটি অবশ্য 'ঐক্যবদ্ধ করা ও বন্ধন শিথিল করা'র যে কথা আগে বলা হয়েছে তার মধ্যেই নিহিত আছে। বর্ণিত সময়ে আলেম সমাজের এই কর্তৃত্ব ছিল যে, তারা সমাজকে আনুগত্য করার জন্য ঐক্যবদ্ধ করতে পারতেন। তাহলে এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, সমাজকে বাধ্যবাধকতার বন্ধন থেকে মুক্ত করার ক্ষমতা কার থাকতে পারে বা থাকতে পারত?

বাস্তবে আলেমসমাজ কোন ক্ষমতাসীন খলীফাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অযোগ্য ঘোষণা করেননি। বিশেষত যেখানে আলেম সমাজের নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করার মত কোন সৈন্যবাহিনী ছিল না, সেখানে এ কাজ করাটাও হতো নির্বোধের মত কাজ। কিন্তু এ সত্ত্বেও শাসককে আইনের সীমার মধ্যে রাখার জন্য তাদের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। মধ্যযুগের মুসলিম বিশ্বে শাসন ক্ষমতায় উত্তরাধিকারের রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে এ ক্ষমতার উৎপত্তি হয়েছে। বংশানুক্রমিক স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতার উত্তরাধিকার লাভ করার পদ্ধতিকে আলেম সমাজ সাংবিধানিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেন এবং এ প্রত্যাখ্যানই এই রাজনৈতিক বাস্তবতা সৃষ্টি করে।

---

২৩. ক্রোন, *God's Rule*, পৃ. ২৩০, আল-বাকিল্লানীকে শব্দান্তর করে লিখেছেন।

www.pathagar.com

বংশানুক্রমিক রাজত্বের পদ্ধতিতে, যেমনটি মধ্যযুগের ইউরোপের সর্বত্র বিদ্যমান ছিল, উত্তরাধিকার নির্ধারণের সময় কে উত্তরাধিকারী হবে তার অনিশ্চয়তা কমানোই হচ্ছে মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ধরনের ব্যবস্থা ক্ষমতাসীন রাজার মৃত্যুর পর নতুন রাজা নির্ধারণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেয়। এমন ব্যবস্থায় উত্তরাধিকারী কে হবে তা নিয়ে সংকট তাত্ত্বিকভাবে কেবল তখনই হতে পারে যখন কোন সুস্পষ্ট উত্তরাধিকারী পূর্ব থেকে নির্ধারিত না থাকে অথবা উত্তরাধিকারী নির্ধারিত থাকলেও জারজ বলে সে প্রত্যাখ্যাত হয়। বিপরীতক্রমে যেখানে শাসক হিসেবে কোন ব্যক্তিকে মনোনয়নের ব্যবস্থা থাকে অথবা নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা থাকে সেখানে প্রায় সময়ই শাসক হওয়ার একাধিক দাবিদার থাকে। এ ব্যবস্থায় কয়েকজন ব্যক্তি বা একদল লোকের প্রয়োজন দেখা দেয় যারা অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য যে দাবিদার সাফল্যের সাথে নিজেকে শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তাকে সমর্থন দিয়ে শক্তিশালী করতে পারে।

মধ্যযুগের ইসলামী পরিবেশে ঠিক এভাবেই ব্যাপারগুলো ঘটত। ক্ষমতাসীন রাজার ক্ষমতাশালী পুত্ররা বা আত্মীয়স্বজন তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য হয়ত প্রাসাদ ষড়যন্ত্র করত। শাসক হওয়ার সম্ভাব্য প্রতিটি দাবিদার একজন আরেকজনকে পরিহার করে চলত। অন্যদিকে প্রাসাদের বাইরে হয়ত অন্য চ্যালেঞ্জকারীও থাকত, যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষায় থাকত কিংবা এমন কি শক্তি প্রয়োগ করে রাষ্ট্র দখলের চেষ্টা করত।

পরবর্তী শাসক কে হবে এ ব্যাপারে এ ধরনের অনিশ্চয়তার কারণে সে সময় আলেম সমাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। একজন নতুন শাসকের জন্য প্রথম যে বিষয়টির প্রয়োজন হতো সেটি হচ্ছে তার শাসনক্ষমতা গ্রহণের আইনগত বৈধতার ব্যাপারটি নিশ্চিত করা। এটি প্রাসাদ অভ্যন্তরের অন্য হতাশ দাবিদারদের পক্ষ থেকে আসা যে কোন চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে তার কর্তৃত্বকে দৃঢ় করতে সাহায্য করত। একবার যখন তার ক্ষমতা দৃঢ় হয়ে যেত, তখন ক্ষমতাসীন শাসকের জন্য প্রয়োজন হতো নতুন চ্যালেঞ্জকারী বা রাষ্ট্র দখলকারীকে নিরুৎসাহিত করা এবং দূরে সরিয়ে রাখা। এটি করার জন্য তার শাসনের আইনগত বৈধতাকে প্রতিনিয়ত নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমসাময়িক আলেম সমাজের উপর নির্ভর করার যোগ্য হতে হতো। আর যেখানে শাসক রাষ্ট্র বেদখল হয়ে যাওয়ার মত চরম অবস্থার সম্মুখীন হতো সেখানে তার রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য আত্মরক্ষামূলক জিহাদে অংশগ্রহণের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা আলেমদের মাধ্যমে ঘোষণা করানোর প্রয়োজন হতো। এ ধরনের

www.pathagar.com

চ্যালেঞ্জ ও সংকটের সময় আলেম সমাজকে সহায়ক হিসেবে পাওয়া শাসকের শক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিত এবং এর ভিত্তিতে শাসককে আইন মান্যকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো।

বাইরে থেকে আসা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে এমন এক শাসককে সমসাময়িক আলেমের সমর্থন দেয়ার সুবিদিত উদাহরণ হচ্ছে তাকীউদ্দিন ইবনে তাইমিয়া (১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.) যিনি তাঁর জীবনে সমসাময়িক শাসককে এ ধরনের সমর্থন দিয়েছেন। তিনি ছিলেন আলেম হিসেবে ইসলামী জ্ঞানের সৃজনশীল এক আইকন (Icon), যিনি জীবনে অন্তত তিনবার তিনটি ভিন্ন সময়ে তাঁর ধর্মীয় ও আইনগত বিষয়ে ভিন্নমতের জন্য বিচারের মুখোমুখি হয়েছেন, দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং কারাদণ্ড ভোগ করেছেন (এবং শেষ পর্যন্ত তিনি কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেছেন)। সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইবনে তাইমিয়া রহ. মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে দামাস্কাস নগরীর প্রতিরক্ষার বিষয়টিকে এবং তৎকালীন মামলুক শাসককে একনিষ্ঠ সমর্থন দিয়েছেন। মোঙ্গলরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে দামাস্কাস নগরী ধ্বংস করে দেয়ার হুমকি দেয়। তখন ইবনে তাইমিয়া রহ. এই সমর্থন দেন। তিনি সে সময় রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার পক্ষে ছিলেন। বর্ণিত আছে, ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি দামাস্কাস নগরীর বাইরে মোঙ্গলদের সাময়িক পরাজয়ের মুহূর্তে সরকারি বাহিনীর পক্ষে একজন ধর্মীয় নেতা হিসেবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

উপরিউক্ত ঘটনায় রাষ্ট্রের সুরক্ষায় ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ভূমিকার যেটি তাৎপর্যময় দিক সেটা হচ্ছে মোঙ্গল হুমকির বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডার মাধ্যমে শরীয়ার পক্ষে গৃহীত তাঁর ভূমিকা। মোঙ্গলরা ইসলামে বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করত। কাজেই যদি তারা বিজয়ী হতো তাহলে বিজিত দেশ শাসনের দাবির হয়ত তাদের সুবর্ণ সুযোগ থাকত। এ অবস্থায় একজন বয়োজ্যেষ্ঠ আলেম হিসেবে ইবনে তাইমিয়া তাঁর অবস্থান অনুযায়ী মোঙ্গলদের ইসলামের প্রতি ন্যূনতম আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে অবিশ্বাসী কাফের হিসেবে ফতওয়া ঘোষণা করেন।[২৪]

---

২৪. দ্রষ্টব্য হেনরী লোস্ট (Henri Laoust), *Essai sur les doctrines socials et politiques d'Ibn Taimiya,* (কায়রো : আইএফএও (IFAO), ১৯৩৯), ই. আই. জে. রোজেনথাল, *Political Thought in Medieval Islam,* (ক্যামব্রিজ : ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৮), পৃ. ৫১-৬১; অ্যান কে. এস. ল্যাম্বটন, *State and Government in Medieval Islam,* (অক্সফোর্ড : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮১), পৃ. ১৩৮-৫১; এবং খুব সাম্প্রতিক ও বিতর্কিত, নাতানা জে দেলং-বাস

www.pathagar.com

মোঙ্গলদের শরীয়ার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে ব্যর্থতাই ছিল তাদেরকে অবিশ্বাসী কাফের বলার পক্ষে ইবনে তাইমিয়ার পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মূল উপাদান। বিশেষত তাদেরকে মুসলিম হিসেবে অনুমোদন না করার কারণ ছিল তারা ইসলামী আইনের পরিবর্তে তাদের ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত আইন ব্যবহার করত, যা ছিল শরীয়ার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি সরাসরি হুমকি। এ ক্ষেত্রে ইবনে তাইমিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এ রকম, যে শাসক আলেমদের আইনি নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয় সে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ 'তোমাদের মধ্যে যে কর্তৃত্বের অধিকারী তার আনুগত্য কর' এই নির্দেশনা দ্বারা সমর্থিত নয়।[২৫] বস্তুত ইবনে তাইমিয়ার মতে, শরীয়ার প্রতি অনানুগত্য মোঙ্গলদের মুসলিম হওয়ার দাবিকে দুর্বল করে দেয় এবং এ কারণে আইনগত বৈধতার যে কোন দাবি থেকে তারা বঞ্চিত হবে। এ ফতওয়ার পরেই জিহাদের অংশ হিসেবে মোঙ্গলদের প্রতিরোধ করা হয়, যা অমুসলিমের বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের শামিল ছিল। এভাবে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার ফলে তা সর্বত্র মুসলিমদেরকে এই প্রতিরোধ যুদ্ধে সমর্থন করতে বাধ্য করে এবং তাদের সাথে যে কোন ধরনের আপসরফা থেকে নিষেধ করে। ইবনে তাইমিয়া নিজে বিশ্বাস করতেন, মুসলিমদের নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক যুদ্ধ নিষিদ্ধ এবং এ ধরনের যুদ্ধ কোন মুসলিমের সমর্থন পেতে পারে না। কিন্তু জিহাদ হচ্ছে বিপরীত; জিহাদ সর্বসম্মতভাবে মুসলিমের স্বীকৃত দায়িত্ব।

মোঙ্গলদের ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়ার অবস্থানের সঙ্গে সব আলেম একমত ছিলেন না। বিভিন্ন কারণে আমি সংক্ষেপে আলোচনা করে দেখাব, মোঙ্গলদের হাতে যদি সত্যিই দামাস্কাসের পতন হতো তবে সেখানে তাদের শাসন মেনে নিতে অনেক আলেম প্রস্তুত ছিলেন। ইবনে তাইমিয়া নিজে এ কথার স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত ছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়া মান্য করে একজন মূলত গোঁড়া

(Natana J DeLong-Bas), *Wahhabi Islam : From Revival and Reform to Global Jihad,* (অক্সফোর্ড : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৪), পৃ. ২৫০-৫৬

২৫. পবিত্র কুরআন, ৪ : ৫৯; ইবনে তাইমিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানতে দেখুন, তাঁর *'আস-সিয়াসাহ্ আশ-শার'ঈয়্যাহ ফি ইসলাহির রা'য়ি ওয়ার রা'য়িয়্যা,* (কায়রো : দারুশ শা'আব, ১৯৭১) এবং এর পরবর্তী আরো বহু সংস্করণ; ইংরেজিতে দেখুন, *Ibn Taimiyya on Public and Private Law,* অনুবাদ : উমর এ ফাররুখ (বৈরুত : খাইয়াত, ১৯৬৬); আরো দেখুন, কামাল এ ফারুকি, *The Evolution of Islamic Constitutional Law and Practice from 610-1926,* (করাচি : ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউজ, ১৯৭১), পৃ. ৬২-৬৬

www.pathagar.com

শাসককেও মেনে নেয়া যায় যদিও তার কিছু ধর্মীয় বা অন্যান্য ভুলভ্রান্তি থেকে থাকে এবং সে ক্ষেত্রে আলেমরা তাকে তিরস্কার করবে এবং সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে। কিন্তু যে সত্যিকারের অবিশ্বাসী- এর মধ্যে শরীয়া যে বাস্তবে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয় সেও অন্তর্ভুক্ত- তার সঙ্গে কোন আপসরফা করা যাবে না।

ইসলামের যে কোন যুগে শাসকের আইনি বৈধতার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করার জন্য আলেম সমাজ ঐ শাসকের শরীয়ার প্রতি আনুগত্যকে কারণ হিসেবে বিবেচনা করেছে। অন্যদিকে আইনকে শাসকের অবজ্ঞা করা এবং আইনের রক্ষক আলেমদেরকে প্রকাশ্যে অপমান ও অবজ্ঞা করে থাকলে সে তার প্রয়োজনের সময় আলেমদের সাহায্য না পাওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আলেমসমাজ প্রয়োজনের সময় নিশ্চুপ থেকে কিংবা দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় শাসকের আইনি বৈধতার কথা ঘোষণা করে তার ক্ষতি করতে পারত; তাদের সে ক্ষমতা ছিল। আরো চরম ক্ষেত্রে আলেমসমাজ ক্ষমতাসীন শাসককে বাদ দিয়ে বিকল্প দাবিদারের আইনি বৈধতার কথা ঘোষণা করতে পারত।[২৬] এ ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ করে শাসককে ক্ষমতাচ্যুতির পাশাপাশি তার আইনি অবৈধতার ফতওয়াও তারা ঘোষণা করতে পারত।[২৭] তবে স্বাভাবিকভাবে ঐ বিকল্প দাবিদার বিজয়ী হওয়ার মত অবস্থায় না থাকলে এ ধরনের ফতওয়া দেয়ার উদ্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ হতো। একজন নতুন শাসক ক্ষমতা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিছু না বলাই আলেমদের জন্য যথেষ্ট ছিল। নতুন শাসক ক্ষমতা গ্রহণ করার পর তারা ঐ শাসককে বৈধ বলে ঘোষণা করতে পারত এমনভাবে যে, ঐ শাসক আইন মান্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং এর মাধ্যমে শাসন করার আইনগত বৈধ কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছে। তখন নতুন করে ঘটনাপ্রবাহ আবর্তন শুরু করত। এভাবে নিজস্ব কোন বাহিনী ছাড়াই আলেম সমাজ সুদীর্ঘকাল ইসলামী সাংবিধানিক কাঠামোতে ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে।

মোটকথা, শাসককে আইনি বৈধতা দেয়ার যে ক্ষমতা আলেম সমাজ ভোগ করত তা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা একজন শাসকের শাসনকালের পর তার

---

২৬. উদাহরণ স্বরূপ বিবেচনা করুন: খ্রিস্টিয় ৮০৫ সনে আল-হাকাম প্রথম এর বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ হয়েছিল সেখানে আন্দালুসি আলেম সমাজ জড়িত ছিল।

২৭. দেখুন এইচ এ আর গিব, "Al-Mawardi's Theory of the Caliphate," তাঁর *Studies in the Civilization of Islam*, যা স্ট্যানফোর্ড জে. শ. এবং উইলিয়াম আর. পক সম্পাদনা করেছেন (বোস্টন : বীকন প্রেস, ১৯৬২), পৃ. ১৬১

www.pathagar.com

উত্তরাধিকারী কে হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে এ ক্ষেত্রে আইনি বৈধতার নিশ্চয়তা দরকার ছিল। তবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, আলেমদের দ্বারা সৃষ্ট সাংবিধানিক আইন কখনোই কাউকে বংশানুক্রমিকভাবে উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার দেয়নি; যদিও সন্দেহ নেই কিছু কিছু শাসক ঠিক সেটাই চাইত। নিঃসন্দেহে খলীফা নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে আলেমদের নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে বলে তাদের যে জোরালো বক্তব্য তা তাদেরকে অধিকতর ক্ষমতা দিয়েছে।

শাসক কর্তৃক তার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন দেয়াকে সমসাময়িক আলেমদের অনুমোদন দেয়া প্রকারান্তরে শাসকের ক্ষমতা এবং তার রাজবংশ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে কিছুটা ছাড় দেয়ার শামিল ছিল। তবে এই ছাড় দেয়া আলেমদের নিজেদের জন্য যতটুকু যা প্রয়োজন ছিল তার অধিকাংশই নিশ্চিত করে। মনোনয়নদানের এই ব্যবস্থায় কিছুটা অনিশ্চয়তার সুযোগ ছিল। কেননা মনোনীত উত্তরাধিকারীকে যে কোন মুহূর্তে পরিবর্তন করার সুযোগ ছিল। (আধুনিক যুগে জর্ডানের বাদশাহ হুসেন তাঁর মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন পূর্বে ভাইয়ের পরিবর্তে তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।) মনোনয়নের এ ব্যবস্থাকে জন্ম পরম্পরায় শাসক হওয়ার ব্যবস্থার চেয়ে, (যে ব্যবস্থা বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রে সাধারণভাবে অনুসৃত হয়ে থাকে), অনেক সহজে চ্যালেঞ্জ করা যেত। মনোনয়ন পদ্ধতিতে উত্তরাধিকারী ঠিক করার প্রক্রিয়ায় কিছুটা হলেও অনিশ্চয়তা থাকার কারণে শাসক ও তার মনোনীত সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীদের- সে যেই হোক- আলেম সমাজের সমর্থন ও তাদের দ্বারা বৈধতা প্রাপ্তির প্রয়োজন হতো।

আইনগত বৈধতাদানের বিনিময়ে আলেম সমাজ শাসকের কাছে কেবল একটি বিষয়ই প্রত্যাশা করত; সেটা হচ্ছে আইনের শাসনের প্রতি শাসকের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা। এখানে যে কথাটি আমি বলতে চাই তা হচ্ছে, ইসলামী সাংবিধানিক কাঠামোর ব্যাখ্যা অনুসারে আলেম সমাজ এ প্রত্যাশা বা দাবি করতে গিয়ে সম্পূর্ণ স্বার্থহীনও ছিল না, আবার অস্বস্তিকর মাত্রায় স্বার্থান্ধও ছিল না। এ ক্ষেত্রে তারা তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকা পুনঃনিশ্চিত করত; অন্যদিকে তারা আইনের প্রতি শাসকের আনুগত্যকে শক্তিশালী করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

একদিকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অঙ্গীকার করে শাসকরা প্রকারান্তরে আলেমদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অঙ্গীকার করত; পাশাপাশি সমাজে তাদের অবস্থানের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অঙ্গীকার করত। এ ধরনের গ্যারান্টি আদায় করতে গিয়ে আলেম সমাজ ইসলামী সমাজে তাদের কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

www.pathagar.com

পালনকারীর অবস্থানকে স্থায়ী করে তাদের নিজেদের সামষ্টিক স্বার্থই পূরণ করত। বিচারকদের মাধ্যমে, যাদেরকে আলেম সমাজ থেকেই বাছাই করা হতো, রাষ্ট্রের আইনি ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও পরিচালনার বিষয়টি শাসকরা আলেম সমাজের হাতেই অর্পণ করত।

অন্যদিকে এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, আইনের সাথে আলেম সমাজের আত্ম-পরিচয় ছিল পরিপূর্ণ ও আন্তরিক। তারা কোন সম্পদেরও দাবি করত না, তাদের নিজস্ব বিশেষাধিকার পূরণের জন্য তাগিদ দিতে গিয়ে তারা শাসককে দুর্বল করারও চেষ্টা করত না, যেমনটি রানিমেড (Runnymade)-এর ব্যারনরা (Baron) করেছে। আইনকে আল্লাহর আইন হিসেবে উপলব্ধি থেকেই আইনের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি উৎসারিত হয়েছে, যা শাসকের চেয়ে এমন কি তাদের নিজেদের চেয়েও মহৎ ছিল। আলেম সমাজের আইনি সিদ্ধান্তকে শাসকের শক্তি বা ক্ষমতাসহ সমর্থন দেবার প্রতিশ্রুতি দানের মাধ্যমে আইনকে ব্যক্তিগত খেয়ালখুশির চেয়ে উচ্চে স্থান দেয়া হয়। এভাবে এই শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আইনকে সর্বোচ্চে স্থান দেয়। এমনকি এটাও বলা যায় যে, এভাবে এটি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

আইন সংরক্ষণ : সংকট ও সমাধান

পারস্পরিক বৈধতাদানের কাঠামো (যেখানে শাসক আইনের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য নিশ্চিত করে, অন্যদিকে আইন শাসকের আইনি বৈধতাকে স্বীকৃতি দেয়) যে কোন বিচারে একটি আকর্ষণীয় বিষয়। তবে এখানে একটি ঝুঁকি সব সময় থেকে যায়। সেটা হচ্ছে, শাসক মনে করতে পারে সে যথেষ্ট শক্তিশালী; আইনি দায়িত্বের প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে তার বৈধতা অর্জনের প্রয়োজন নেই। কাজেই আইন মান্য করার মূল্যের চেয়ে আইন ঠিকমত মান্য না করার সুবিধাই বেশি হবে। মধ্যযুগের ইসলামী বিশ্বে এরূপ বৈধতাদান কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করতে যে বড় সংকট প্রথম সামনে এসেছে তার শুরু হয় যখন খিলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থাৎ খলীফা (যিনি নির্বাহী দায়িত্ব এবং আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার বা অনুমোদন- এ উভয় বিষয়ের ঐক্যবদ্ধ প্রতীক বলে গণ্য হতেন) প্রকৃত ক্ষমতার উপর তার নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করেন।

বাগদাদের একদা শক্তিমান আব্বাসী খিলাফত খ্রিস্টিয় এগারো শতকের মাঝামাঝি নাগাদ গভীর সংকটের মুখোমুখি হয়। কাস্পিয়ান সাগর তীরবর্তী অঞ্চলের বুয়াইহিদ আক্রমণকারীরা দশম শতাব্দীর শেষের দিকে আব্বাসী সাম্রাজ্যের বিশাল ভূখণ্ডের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে নেয় এবং খলীফাদের

www.pathagar.com

উপর অব্যাহতভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এ সময় সেলজুক তুর্কিরা বাগদাদকে হুমকি দিতে থাকে এবং এক পর্যায়ে ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে তাদের হাতে বাগদাদের পতন হয়। খলীফা হারুনুর রশীদ ও অন্যান্য শাসকের সিংহাসন ছিল হুমকির মুখে। এ অবস্থায় খিলাফতের অবলুপ্তি ছিল মূলত আইনেরই অবলুপ্তি। কাজেই একটি অপরটির সাথে ছিল খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।

এ ধরনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত আলেম আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী (৯৭২-১০৫৮ খ্রি.)। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ আইন বিশেষজ্ঞ। তিনি বহু সংখ্যক খলীফার পক্ষে একইভাবে বুয়াইহিদ ও সেলজুকদের সাথে সমঝোতার জন্য কূটনৈতিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্বপালন করেছেন। মাওয়ারদী সাংবিধানিক যে মূল সমস্যাটির মুখোমুখি হন সেটি হচ্ছে খিলাফত ব্যবস্থার হারানো গ্রহণযোগ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত করা। হাদীস ও আইন অনুযায়ী খলীফা তাঁর বাস্তব নির্বাহী ক্ষমতা চর্চা করবেন বলে ধারণা করা হতো, যেমনটি রাসূলুল্লাহ স. ও খুলাফায়ে রাশিদীন করেছেন। কিন্তু বুয়াইহিদদের অধীনে- যেমনটি সেলজুকের অধীনেও হয়েছে- এই ব্যাপারটি ক্রমশই অবাস্তব ও অসম্ভব হয়ে ওঠে। এরা (বুয়াইহিদ ও সেলজুক) খিলাফতকে হয়ত কিছুটা সম্মান করতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু খলীফাকে স্বাধীনভাবে শাসন করতে দিতে প্রস্তুত ছিল না।

মাওয়ারদী এ সমস্যার আইনি সমাধান দেন। The Ordinances of Government (সরকারের অধ্যাদেশসমূহ) নামে একটি গ্রন্থে এ সমাধানের সারসংক্ষেপ লেখা হয়। এ গ্রন্থটি শাসনতান্ত্রিক আইনের উপর লিখিত সম্ভবত প্রথম ও এখনও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসিক্যাল ইসলামী রচনা।[২৮] এ গ্রন্থটি যে সময়ে রচিত হয় সে সময়টি লেখার জন্য নির্বাচন কোন দৈব ঘটনা ছিল না। সে সময় খিলাফত ব্যবস্থা এক ধরনের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত সাংবিধানিক ভারসাম্যের মডেল অপরিবর্তিত ছিল তখন পর্যন্ত খিলাফত কী হবে তা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর জন্য এ ধরনের কোন গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল

---

২৮. আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী, *Al-Ahkam al-Sultaniyya wa-l-wilayat al-diniyya, (আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ্ ওয়াল ভিলাইয়্যাতুত দীনিয়্যাহ), The Ordinances of Government,* অনুবাদ : ওয়াফা এইচ ওয়াহবা (রিডিং : গ্যারেট পাবলিশিং, ১৯৯৬); অগ্রাধিকারের প্রশ্নে দেখুন, ডোনাল্ড পি লিট্‌ল, A New Look at al-Ahkam al-Sultaniyya, *The Muslim World,* ভলিয়ুম-৬৪, প্রথম সংখ্যা (জানুয়ারি ১৯৭৪), পৃ. ১-১৫

www.pathagar.com

না। কিন্তু বিশৃঙ্খলা অনিশ্চয়তা ডেকে আনে। এ কারণেই মাওয়ারদী শাসনের নামে কী হচ্ছে এবং কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করা প্রয়োজন বলে মনে করেছেন।

মাওয়ারদী তাঁর গ্রন্থে সে অবস্থাটি পর্যালোচনা করেছেন যেখানে খলীফাকে অন্য এক ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ করত। ঐ ব্যক্তিই মূলত নির্বাহী ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করত। মাওয়ারদী যুক্তি দেখান, যতক্ষণ পর্যন্ত *ডি ফ্যাক্টো* শাসক ধর্ম ও আইনের মূলনীতিগুলো মেনে চলবে ততক্ষণ খলীফা পরিস্থিতি যেভাবে চলছে তা অব্যাহত রাখতে দিতে পারেন।[২৯] তিনি একজন প্রাদেশিক গভর্নরের ঘটনা বিশ্লেষণ করেছেন, যে খলীফার মনোনয়ন লাভের মাধ্যমে নয় বরং শক্তি প্রয়োগ করে গভর্নরের পদ দখল করেছিল। মাওয়ারদী জোর দিয়ে বলেন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে স্বঘোষিত গর্ভনরকে খলীফা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে আইনত মনোনীত করতে পারেন এবং বাস্ত ব শাসনকাজের দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করতে পারেন।[৩০]

তবে বাস্তব অবস্থা ছিল ভিন্ন। খলীফাকে নিয়ন্ত্রণকারী মূল শাসক-ব্যক্তিটির মত খলীফার তাত্ত্বিক কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দিতে স্বঘোষিত গভর্নরও প্রস্তুত ছিল। এ ধরনের পরগাছারা খিলাফতের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বাস্তবে যদি নাও থাকে একে বাস্তব ও সত্য হিসেবে ধরে নিয়ে তা অব্যাহত থাকতে দিতে প্রস্তুত ছিল এবং এ ক্ষেত্রে সাধারণত প্রস্তুত থাকে। এ প্রসঙ্গে মাওয়ারদী বলেন, এত কিছুর পরও শরীয়া মান্য করা হচ্ছে কিনা খলীফাই ছিলেন তা নিশ্চিত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। অন্যদিকে খলীফার মনোনীত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির অবস্থান মেনে নিয়ে *ডি ফ্যাক্টো* শাসককে অবশ্যই খলীফার কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দিতে হতো।[৩১] এ কাজ করতে গিয়ে মাওয়ারদী শরীয়া অনুযায়ী শাসন-কার্যের উদ্যোগ নেন। মাওয়ারদী যুক্তি দেখান, এক অর্থে খলীফা এত কিছুর পরও বাস্তব কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেছেন- যেমনটি হাদীসের বিধান অনুযায়ী দরকার- তবে তিনি এ কাজটি করেছেন কেবল একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে। মাওয়ারদী কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, বাস্তব প্রয়োজনেই *ডি ফ্যাক্টো* শাসককে অনুমোদিত ক্ষমতার ব্যবহার করতে দেয়া হয়। আর সে প্রয়োজনটি হচ্ছে, খলীফার কর্তৃত্বের অনুপস্থিতিতে জনগণের স্বার্থের ক্ষতি হতো; কাজেই উপরিউক্ত ব্যবস্থা মেনে নেয়া হয়।

---

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

www.pathagar.com

মাওয়ারদী কেবল একজন প্রাদেশিক গভর্নরের সূত্র দেখিয়ে তাঁর মডেলের রূপরেখা ব্যাখ্যা করেছেন; তিনি খলীফার স্থানেই তাঁর নির্বাহী ক্ষমতা বেদখল হয়ে যাওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য প্রতিনিধি মনোনীতকরণ (deputization)-এর মডেল স্পষ্ট করে হাজির করেননি।[৩২] কিন্তু পরবর্তী আলেমগণ, বিশেষত উচ্চ স্তরের আইন, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক লেখক আবু হামিদ আল-গাজালী (১০৫৮-১১১১ খ্রি.) মাওয়ারদীর দৃষ্টিভঙ্গিকে একটি যৌক্তিক পরিণতির দিকে নিয়ে যান। তিনি সেলজুক শাসনাধীন বাগদাদে বাস করতেন। তিনি *ডি ফ্যাক্টো* শাসকের মাধ্যমে খলীফা কর্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত করার প্রক্রিয়ার উপরিউক্ত ধরনকে সুস্পষ্ট ভাষায় অনুমোদন দেন।[৩৩]

তবে আধুনিক ভাষ্যকারগণ মাওয়ারদীর কড়া সমালোচনা করেছেন। কেননা তিনি প্রয়োজনীয়তার নীতির উপর নির্ভর করেছেন এবং তারপর তিনি যা বাস্তব নয় তাকে বাস্তব বলে ধরে নিয়েছেন যা খলীফাকে প্রকৃত শাসকের স্থান থেকে এক ধরনের মুসলিম পোপের পর্যায়ে নামিয়ে আনে যার কোন বাস্তব শাসন ক্ষমতা বলে কিছু নেই। অন্যদিকে যাদের হাতে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ছিল তিনি তাদেরকে আশির্বাদ দিয়েছেন। খ্রিস্টিয় ১৯৩০ এর দশকের শেষের দিকে যখন জার্মানীর আইনি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো নাৎসিদের দখলে চলে যায়, প্রখ্যাত ব্রিটিশ ইসলাম বিশেষজ্ঞ হ্যামিলটন গিব লেখেন যে, 'যুক্তি খুঁজে পেতে তাঁর যে আগ্রহ, যে যুক্তি দিয়ে অন্তত আইনগত বৈধতার দিকটি ঠিক রাখা যায়, সে আগ্রহ দেখাতে গিয়ে মাওয়ারদী সব ধরনের আইনের ভিত্তিকেই খাটো করেছেন তা তিনি বুঝতে পারেননি।'[৩৪]

যদি আলেম সমাজ ও শাসকের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের দিক থেকে দেখা হয়, তাহলে মাওয়ারদীর শাসনতান্ত্রিক আপসরফাকে পরাজয়মূলক নয়

---

৩২. গিব তাঁর "Al-Mawardi's Theory of Caliphate" -এ বলেন, 'মাওয়ারদী ইঙ্গিতে কেন্দ্রে এ ধরনের ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়েছেন' (পৃ. ১৬৩)। তবে খলীফার স্বাধীনতা সীমিত করার বিষয়টি মাওয়ারদী যেভাবে দেখেছেন তা গিব কিভাবে পড়েছেন তার উপর ভিত্তি করে এটি প্রকৃত পক্ষে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন (দেখুন, পৃ. ১৫৯-৬০), এবং মাওয়ারদী হয়ত তাঁর মডেল খোদ খিলাফতের জন্যই প্রয়োগযোগ্য বলে ভেবে থাকবেন।

৩৩. দেখুন, ল্যাম্বটন, *State and Government in Medieval Islam*, পৃ. ১০৭-২৯; ক্রোন, *God's Rule*, পৃ. ২৩৭-৪৭; লিওনার্ড বিনডার (Leonard Binder), "Al-Gazali's Theory of Islamic Government", *The Muslim World*, ভলিয়ুম-১৪, তৃতীয় সংখ্যা (জুলাই ১৯৫৫), পৃ. ২২৯

৩৪. গিব, "Al-Mawardi's Theory of Caliphate", পৃ. ১৬৪

www.pathagar.com

বরং উচ্চাভিলাষী বলেই মনে হয়। খলীফার ক্ষমতা সংরক্ষণ করা আলেমদের উদ্দেশ্য ছিল না- সে জন্য তার শক্তিমান সৈন্যবাহিনীই ছিল। বরং মাওয়ারদী এমন একটি উপায় সন্ধান করেছেন যার মাধ্যমে শাসকের উপর শরীয়ার নিয়ন্ত্রণ রাখার নীতিটি ঠিক রাখা যায়। বাস্তবে যে ব্যক্তি *ডি ফ্যাক্টো* শাসক ছিল তাকে খলীফার প্রতিনিধি বানানোর মাধ্যমে আইনের কাছে ঐ শাসকের আত্মসমর্পণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়। এ ধরনের ব্যবস্থা নতুন ধরনের *ডি ফ্যাক্টো* শাসককে কিছুটা সে ধরনের আইনি বৈধতা দেয় খলীফা নিজে যার অধিকারী ছিলেন। তবে *ডি ফ্যাক্টো* শাসক শরীয়া মেনে চলবে- এ শর্তে সে এ বৈধতা পায়।

ডি ফ্যাক্টো শাসকের শরীয়াকে মেনে চলার প্রতিশ্রুতি বা স্বীকৃতিদানের ফলাফল হয় এই যে, এটা শাসকের ক্ষমতার ভারসাম্য হিসেবে আলেম সমাজের ভূমিকা পুনঃনিশ্চিত করে। যখন খলীফার বাস্তব ক্ষমতা খর্ব করে ফেলা হয়, সে সময় আলেম সমাজের আইনকে আইন হিসেবে ঘোষণা দেয়ার কর্তৃত্ব এবং তাদের মধ্যে শরীয়ার প্রতীকী মূর্ত প্রকাশ আগের মতই অক্ষতভাবে সংরক্ষিত থাকে। প্রকৃতপক্ষে মাওয়ারদীর পরিকল্পনা আলেম সমাজকে রক্ষার জন্য খলীফার ক্ষমতাকে খর্বকরে। শরীয়ার স্বার্থের প্রতি আলেম সমাজ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেমনটি সব সময়ই ছিল- এই একটি দিক এখানে লক্ষণীয়, যা মাওয়ারদীর এ উদ্যোগকে গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় করার পেছনে মূল কারণ। কেননা এ ব্যবস্থায় খিলাফতের পতনকে পাশ কাটিয়ে শরীয়া টিকে যায়, যে খিলাফতের পরিকল্পনা করা হয়েছে শরীয়ার সেবার জন্যই; আর আলেম সমাজও এ ব্যবস্থায় পূর্বের উন্নত মর্যাদা নিয়ে আবির্ভূত হতে সক্ষম হন, যে মর্যাদা তাদের পূর্বে ছিল।

গাযালী খলীফার প্রতিনিধি মনোনয়নকে মেনে নিয়ে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা উপরিউক্ত ব্যাখ্যার প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে। তাঁর মতে, সমস্ত আইনগত কাজের বৈধতার জন্য খিলাফত হচ্ছে প্রয়োজনীয় আইনি পূর্বশর্ত আর খিলাফত হচ্ছে কর্তৃত্বের আধার, যেখান থেকে শরীয়ার বাস্তব অনুশীলনের উৎপত্তি হয়েছে। গাযালী যুক্তি দেখান, খিলাফত যদি অবলুপ্ত হয় তাহলে আইন নিজেও কাজ করবে না; অকার্যকর হয়ে পড়বে। আদালতের চুক্তি, বিচারিক রায়, সাক্ষ্যদান ইত্যাদি কোন কিছুরই আইনি ভিত্তি বা শক্তি থাকবে না। এ ধরনের অবস্থা অবশ্যই কাম্য নয় এবং তা মেনে নেয়া যায় না। খিলাফতের পতনের মুখে আইনি ব্যবস্থা সংরক্ষণের প্রয়োজনে বাস্তবে না হলেও অন্তত দৃশ্যত খিলাফত সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল এবং প্রয়োজন হয়। কাজেই এটা আইনের ভিত্তিকে মোটেও দুর্বল করেনি বরং *ডি ফ্যাক্টো* শাসককে বাস্তবে না হলেও

www.pathagar.com

খলীফা কার্যত কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন বলে মেনে নেয়ার মাধ্যমে আইনের ভিত্তিকে, (খলীফার মাধ্যমে না হোক আলেম সমাজের মাধ্যমে হলেও), যথার্থভাবেই সংরক্ষণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

গাযালীর বিধৃত মাওয়ারদীর আপোসরফাকে ক্ষমতার প্রতি আলেমসুলভ ছাড় দেয়া বলা যায় না, বরং এটা হচ্ছে এমন বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলী পরিকল্পনা, যা সুশৃঙ্খল সরকার সুরক্ষার দায়িত্ব পালনে খিলাফতের ব্যর্থতা সত্ত্বেও আইনকে সংরক্ষণ করতে পেরেছে এবং আলেম সমাজকে তাদের সাংবিধানিক অবস্থানে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

যদি বুওয়াইহিদ বা সেলজুকরা আইনের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার না করে ক্ষমতা নিয়ে নিত তাহলে হয়ত সবকিছুই হারাতে হতো। মাওয়ারদীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে শরীয়াই হচ্ছে সবকিছু; খিলাফতের পূর্বশর্ত। কাজেই সে হিসেবে এটা ছিল শরীয়া ও আলেম সমাজের বিজয়, যারা শরীয়াকে সংরক্ষণ করেছে। খিলাফতের পতনোন্মুখ অবস্থা নিয়ে আক্ষেপ করলে কিংবা ক্ষমতা বেদখলকে অনুমতি দিয়েছেন বলে মাওয়ারদীকে সমালোচনা করা হলে তিনি যে শরীয়াকে সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নিয়েছেন সে ব্যাপারটি দৃষ্টির আড়ালে থেকে যাবে। তর্ক হিসেবে বলা যায়, মাওয়ারদীর বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তিই ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতন্ত্রের ক্ষমতার ভারসাম্যকে পরবর্তী আরো সাত শ' বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছে।

আইন শৃঙ্খলা

প্রশ্ন হল আইনের বিষয়বস্তুর উপর আলেম ও ইসলামী পণ্ডিত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ কেন ও কিভাবে ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রের কার্যকারিতাকে সহজতর করেছে? এ প্রশ্নের তিনটি অংশ রয়েছে যার প্রতিটি স্বতন্ত্র কিন্তু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং প্রতিটি অংশ নিয়ে আলাদা আলোচনা হতে পারে।

প্রথম অংশ : আত্মবিশ্বাসী ও স্ব-সংজ্ঞায়িত এলিট শ্রেণী, যারা আইনকে সুবিদিত ও সুস্থিরিকৃত নিয়মবিধি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে, তারা অধিকাংশ মানুষের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ সম্পত্তির বণ্টনের বিষয়ে সময়ের পরিক্রমায় এক ধরনের নিশ্চয়তা ও স্থিরতা সৃষ্টি করতে চেয়েছে। নিশ্চয়তা ও স্থিরতা দীর্ঘমেয়াদী যে কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করেছে।

দ্বিতীয় অংশ : আইন নিয়ন্ত্রণ করে আলেম ও পণ্ডিত শ্রেণী নির্বাহী ক্ষমতাধর ব্যক্তির সাধারণ নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখলে নেয়ার বা অধিগ্রহণের ক্ষমতাকে সীমিত করে দেয়। এর ফলে নির্বাহী শাসককে রাজস্ব আদায় করার জন্য আইনের সীমার মধ্যে কর নির্ধারণের উপর নির্ভর করতে

www.pathagar.com

হয়েছে। আর এ ব্যাপারটি শাসকদেরকে তাদের নাগরিক বা প্রজাদের স্বার্থের বিষয়ে দ্রুত সাড়া দিতে বাধ্য করেছে।[৩৫]

তৃতীয় ও শেষ অংশ : আলেম ও পণ্ডিত শ্রেণীর আইনের উপর নিয়ন্ত্রণ সরকার ব্যবস্থার উপর এক ধরনের আইনি বৈধতার সূক্ষ্ম আভা ছড়িয়ে দেয়; (অন্যভাবে বলা যায়, সরকার ব্যবস্থাকে আইনি বৈধতা দান করে)। এ বৈধতা সামগ্রিক আইনি ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকারি বিধিবদ্ধ আইনের শক্তিকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

মধ্যযুগে উপরিউক্ত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বৈশিষ্ট্যেগুলোর যে স্পষ্ট ফলাফল ছিল তার প্রতিফলন প্রতিভাবান সমাজ চিন্তাবিদ ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রি.)-এর গ্রন্থে পাওয়া যেতে পারে। সরকারি আইনের কাজ বা ভূমিকা সম্পর্কে পশ্চিমা কিছু কিছু বর্ণনার মোটামুটি সমান্তরালে থেকে ইবনে খালদুন বলেন, সরকারের দখল থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষায় ব্যর্থতা মানুষের উৎপাদনের উৎসাহ নষ্ট করে ফেলে। 'যখন সম্পত্তি অর্জন ও লাভ করার উৎসাহ চলে যায়, মানুষ কোন সম্পদ অর্জনের জন্য আর চেষ্টা করে না।'[৩৬] তিনি ব্যাখ্যা করেন, স্বল্প উৎপাদনশীলতা সৃষ্টির সবচেয়ে নিশ্চিত উপায় হল অন্যায্য ও জুলুমবাজ শাসন। আর এ ধরনের পরিস্থিতি পরিণামে একটি সভ্যতাকে পর্যন্ত ধ্বংস করে দেয়।

ইবনে খালদুন আরো বলেন, 'কোন ক্ষতিপূরণ বা কোন কারণ ছাড়াই মালিকের মালিকানা থেকে অর্থ বা অন্যান্য সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা নিঃসন্দেহে অবিচার বা জুলুমের শামিল।' তিনি আরো বলেন, অপর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণসহ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা দখল করা, বাধ্যতামূলক শ্রম, অযৌক্তিক আইনি দাবি, শরীয়া অনুযায়ী প্রয়োজন নেই এমন কোন শুল্ক এবং অযৌক্তিক কর চাপিয়ে দেয়া প্রভৃতি আচরণও অবিচার ও জুলুমের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ স. যখন অবিচার ও জুলুম করা থেকে নিষেধ করেছেন তিনি মূলত জুলুমের পরিণাম অর্থাৎ সভ্যতার ধ্বংস ও বিনাশকে মনে মনে প্রতিহত করতে চেয়েছেন। সে কারণেই শরীয়া বিচক্ষণতার সাথে সাধারণভাবে পাঁচটি বিষয়কে প্রয়োজনীয় বলে লক্ষ্য স্থির করেছে। পাঁচটি বিষয় হচ্ছে- ১) দ্বীন (ধর্ম) সংরক্ষণ করা; ২)

---

৩৫. মধ্যযুগের ইসলামী চিন্তাধারায় প্রাপ্ত ন্যায়বিচার এবং রাষ্ট্র শাসন সম্পর্কে শাসকের প্রতি উপদেশমূলক রচনায় এর নিয়মিত চর্চা এবং পুনরাবৃত্তির সাথে তুলনা করুন। দ্রষ্টব্য বুলিয়েট, *The Case*, পৃ. ৬২ ('ন্যায়বিচার ও মিতাচারের ফলে মানুষ অধিক পরিমাণে উৎপাদন করবে, কর রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং রাষ্ট্র ধনী ও ক্ষমতাবান হবে'।)

৩৬. ইবনে খালদুন, *The Muqaddimah : An Introduction to History*, অনুবাদ : ফ্রান্জ রোজেনথাল (নিউইয়র্ক : প্যানথন বুকস্, ১৯৫৮), খ. ২, পৃ. ১০৬

www.pathagar.com

আত্মা বা জীবন রক্ষা করা; ৩) মেধা বা ধীশক্তি সংরক্ষণ করা; ৪) সন্তান-সন্ততিকে রক্ষা করা; এবং ৫) সম্পত্তি রক্ষা করা।'[৩৭]

ইবনে খালদুন এই পাঁচটি বিষয়ের কথা তুলে এনেছেন আইনের গ্রন্থ থেকে, যেখানে লেখকগণ প্রচলিত গতানুগতিক ধারায় 'শরীয়ার লক্ষ্যসমূহ' বর্ণনা করেছেন। ইবনে খালদুনের বক্তব্য অনুযায়ী, সরকারি লুণ্ঠন থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করার মাধ্যমে সভ্যতাকে সংরক্ষণ করা শরীয়ার অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। আইন হচ্ছে মৌলিক নীতিমালা যার উপর সভ্যতা টিকে থাকে। আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে শাসককে অন্যের সম্পদ দখল করা বা শোষণ করার প্রলোভন থেকে নিবৃত্ত করা।

আইনের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ক্রিয়ার জোরালো বর্ণনা সত্ত্বেও দৃশ্যত ইবনে খালদুন মাধ্যম হিসেবে আইনকে পরিচালনায় ইসলামী পণ্ডিত বা আলেম সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেননি; যে ব্যবস্থার মাধ্যমে আলেম সমাজ ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। বস্তুত রাসূলুল্লাহ স.-এর উত্তরাধিকারী হিসেবে আলেম সমাজ গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক ভূমিকা পালন করেছেন বলে তাদের যে দাবি সে ব্যাপারে ইবনে খালদুন সন্দিহান ছিলেন।[৩৮] কেন তিনি সন্দিহান ছিলেন? ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কিত তাঁর শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক চিন্তাধারাই সম্ভবত এর কারণ। তাঁর চিন্তাধারাটি হচ্ছে এরূপ- 'দলীয় ঐক্য এবং সংহতির ভাব ও চেতনা থেকেই সকল রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সৃষ্টি হয়'। বলা বাহুল্য, ক্ষমতাবানের জন্য তাঁর এ চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে না পারার খুব সামান্যই সম্ভাবনা থাকে। ইবনে খালদুন যথার্থই বলেছেন, 'তবে যেহেতু সে যুগে আলেম সমাজের এ ধরনের কোন ক্ষমতা ছিল না এবং তারা নির্বাহী ক্ষমতাধরের কোন বাস্তব অংশও ছিল না', এখনও নেই, তাদেরকে তাঁর কাছে জরুরি সাংবিধানিক কাঠামোর অংশ বলে মনে হয়নি।

ইবনে খালদুন বলেছেন- আইন শুধুমাত্র আলেমদের সাথে এর সম্পর্কের কারণেই কাজ করতে পারে এ কথা মেনে নিলে, (যে আলেম সমাজ আইনকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেছেন) তা আলেমদের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর (ইবনে খালদুনের) নিজের চিন্তাধারার চেয়ে আরো শক্তিশালী চিন্তাধারা বা দৃষ্টিভঙ্গির উৎপত্তি ঘটায়। আমি এখানে বলতে চাচ্ছি, আইনের উপর আলেম সমাজের নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা সেকালে ছিল তা স্থিতিশীলতা, নির্বাহী ক্ষমতাধর ব্যক্তির আত্ম-

---

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-৭

৩৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫৮-৬১

www.pathagar.com

সংযম ও সংযত আচরণ এবং আইনি বৈধতাকে উৎসাহিত করেছে। এ আলোচনা করতে গিয়ে ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতন্ত্রের আওতায় আইনি ব্যবস্থা কী ভূমিকা পালন করেছে আর কী করেনি আমি সে বিষয়টি ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু করব।

ঐতিহ্যবাহী পুরনো ইসলামী রাষ্ট্রে যে কোন বিতর্ক বা দ্বন্দ্ব বিচারকগণ, (যাদেরকে আলেম সমাজ থেকে বাছাই করে নিয়োগ দেয়া হতো) কেবল মাত্র ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতি দেখে নিরসন করতেন না, বরং এ ক্ষেত্রে একেবারে সাদামাটা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে শুরু করে অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির উসমানিয়া সাম্রাজ্যেও প্রশাসনিক বিধিনিষেধ বা অধ্যাদেশও সর্বদা ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক অংশ ছিল। এ সমস্ত প্রশাসনিক বিধিনিষেধেরও আইনের সমান কার্যকারিতা ছিল এবং আইনের মতই শক্তিসম্পন্ন ছিল। এ সব বিধিনিষেধ শাসক নিজে জারি করতেন অথবা কখনো কখনো তার প্রতিনিধি কর্তৃক জারি করা হতো।[৩৯] এ ধরনের বিধিনিষেধ নানা রকম বিষয়কে কেন্দ্র করে জারি করা হতো। যেমন, কোন দ্রব্যের ওজন বা পরিমাপ সম্পর্কিত বিধিনিষেধের কথা বলা যায়, যা সাধারণত একজন বিশেষ কর্মকর্তা তত্ত্বাবধান করত, যে আলেম নাও হতে পারে। উক্ত কর্মকর্তা বাজারের প্রধানকর্তা হিসেবে পরিচিত ছিল। এ ধরনের আরেকটি বিষয় হচ্ছে করারোপ সম্পর্কিত, যেখানে এমন করও অন্তর্ভুক্ত ছিল যা ক্লাসিক্যাল ইসলামী আইনি উৎস অর্থাৎ পবিত্র কুরআন, হাদীস, ইজমা বা কিয়াস ইত্যাদিতে স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত নেই। এ সব বিষয় দেখাশোনা করত কর কর্মকর্তাগণ। তারাও আলেম সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আরেকটি বিষয় হচ্ছে অপরাধ (ক্রাইম) সংক্রান্ত। এ বিষয়ে যে প্রশাসনিক বিধিবিধান ছিল সেগুলো মূলত শরীয়া নির্ধারিত কিছু শারীরিক শাস্তি বিধান করার জন্য ঐ অপরাধ অত্যন্ত কঠোরভাবে

---

৩৯. অ-শরীয়া ভিত্তিক আদালত এবং এর বিচার ব্যবস্থার ব্যাপ্তি বিষয়ে প্রয়োজনীয় রূপরেখা দেখুন, ভিকর, *Between God and Sultan*, পৃ. ১৮৯-২০৫; এ সমস্ত প্রশাসনিক বিধিবিধানের উসমানিয়া সাম্রাজ্যের সংস্করণ, যাকে কানুন বলা হতো, এর জন্য দেখুন, কলিন ইমবার (Colin Imber), *The Ottoman Empire, 1300-1650: The Structure of Power*, (নিউইয়র্ক : পালগ্রাভ ম্যাকমিলান, ২০০২), পৃ. ২৪৪-৫১। তাযিরের প্রকার 'অনিরূপিত অপরাধের জন্য অনিরূপিত শাস্তি' শাসকের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত সীমার মধ্যে রয়েছে বলে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং এ অর্থে তা শরীয়ার অন্তর্ভুক্ত; (একে সিয়াসাহ্ বলা হয়)। সিয়াসার ব্যঞ্জনা রাষ্ট্রীয় আওতার মধ্যে সে সব কাজের পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত যে কাজগুলোর কথা সরাসরি আইনে নেই এবং যেগুলোকে আমরা নির্বাহী বিশেষাধিকার বলে আখ্যায়িত করতে পারি। জোহানসেন, *Contingency in a Sacred Law*, পৃ. ২১৬

www.pathagar.com

প্রমাণ করার যে শর্ত শরীয়া আরোপ করেছে সে সম্পর্কিত জটিলতা নিরসন করার জন্য জারি করা হয়। অপরাধ বিষয়ক প্রশাসনিক বিধিনিষেধগুলোও আলেম নন এমন কর্মকর্তা দ্বারা শাসকের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হতো এবং এভাবে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তির বিধান করা হতো।

এমন প্রতিটি পরিস্থিতিতে, যেখানে প্রশাসনিক বিধিবিধান জারি এবং বলবৎ হতো, যে কেউ এ কথা বলতে পারত বা এখনও বলতে পারে যে, এ সমস্ত বিধিবিধান শরীয়ার বিধান নয়, যা সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এ বাস্তবতার কারণে ইসলামী আইনের অনেক পণ্ডিত মনে করেন, আইনের পশ্চিমা পরিভাষার অর্থে শরীয়া প্রকৃতপক্ষে কোন আইনি ব্যবস্থা নয়। যতদূর এর শিক্ষা তাতে দেখা যায়- বিশেষত আলেমদের হাতে রচিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দীর্ঘ রচনাগুলোতে- এগুলো সকল ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী কোন বিধানের মত নয়। বস্তুত বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী আইন বিষয়ক পশ্চিমা পণ্ডিতগণ ইসলামী আইন আদৌ কোন আইন কি-না সে সম্পর্কিত তাত্ত্বিক প্রশ্ন নিয়ে বিতর্কে অপরিমিত সময় ব্যয় করেছেন।[৪০]

তবে উপরের এই কথাটি সঠিক নয়- এবং যুগ পরম্পরায় ইসলামী আইনি ব্যবস্থার সাথে যারা জড়িত তারা একে যথার্থ নয় বলে মনে করতে পারে বলেই শুধু এটা ভুল তা নয়। বস্তুত যে কোন জটিল সমাজে আইনের শক্তিসম্পন্ন এমন সব নীতি-আদর্শ থাকে, যেগুলো বিভিন্ন উৎস থেকে সৃষ্টি হয়। এ সব নীতি-আদর্শ কোন সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ আইনি ব্যবস্থার অংশ কি-না সেটা এ সব নীতি-আদর্শকে কোন একটি একক কর্তৃত্বের অধীন হিসেবে মনে করা হয় কি-না তার উপর নির্ভর করে। ক্লাসিক্যাল ইসলামী বিশ্বে মানব জীবনের বিভিন্ন দিককে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক বিধিগুলোকে সকলেই মনে করত এগুলো শরীয়া কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শাসকের কর্তৃত্বে উদ্ভূত হয়েছে। কোন বিধিবিধান কখনোই শরীয়ার বিপরীত হতে পারেনি বা এর স্থান দখল করতে পারেনি।

সংজ্ঞার দিক থেকে দেখলে দেখা যায় সে যুগে শূন্যতা পূরণ করার উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক বিধিবিধান জারি ও প্রয়োগ করা হতো এবং এগুলো সে সব বিষয়কে কেন্দ্র করেই জারি হতো যে বিষয়ে শরীয়া দৃশ্যত কোন বাধ্যতামূলক বিধান দেয়নি। এভাবে দেখা যায়, নীতিগতভাবে প্রশাসনিক বিধিগুলো শরীয়ার

---

৪০. বিশেষত জটিল আলোচনার জন্য দেখুন জোহানসেন, *Contingency in a Sacred Law*, পৃ. ৪২-৭২

www.pathagar.com

কর্তৃত্বের অধীন এবং এ হিসেবে এগুলো আলেম সমাজেরও কর্তৃত্বের অধীন, যারা এককভাবে আইনের বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণ করতেন। তুলনা করে দেখার জন্য যে কেউ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিশাল প্রশাসন-যন্ত্রের কথা চিন্তা করতে পারেন। ফেডারেল সরকারের নির্বাহী বিভাগ সে দেশে আইনের শক্তিসম্পন্ন অজস্র নির্দেশনা জারি করে এবং অগণিত বিচার জাতীয় প্রসিডিংস পরিচালনা করে। তারপরও এ ধরনের কাজ সে দেশের আইনসভার আইন প্রণয়নের কর্তৃত্ব কিংবা আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়েছে বলে মনে করা হয় না; যেহেতু এ সব নির্দেশনা নীতিগতভাবে আইনসভা, আদালত এবং শাসনতন্ত্রকে মেনে সেগুলোর অধীনে করা হয়।

উপরের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে যে কেউ আইনের বিষয়বস্তুর উপর আলেম সমাজের নিয়ন্ত্রণের ফলাফলের দিকে নজর দিতে পারে। আইন এক ধরনের স্থিতিশীলতা ও নিশ্চয়তার (Predictability) সৃষ্টি করতে পারে- এ কথাটি আইনের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে বৃহত্তর সামাজিক স্বীকৃতি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। অন্য কথায়, সামাজিক স্বীকৃতি হচ্ছে যে, আইন এমন বিষয়- (যেমনটি আলেম সমাজের মাঝে মূর্ত হয়ে আছে) যা শাসকসহ সমাজের যে কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে ছাপিয়ে যায় এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যে কোন সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ ধরনের স্বীকৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর ফলে মানুষ বিশ্বাস করে যে, তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক কিছু করতে পারে- তারা ভূমি ও বিভিন্ন দ্রব্য কেনাবেচা করতে পারে; তারা যে কোন অংশীদারিত্বমূলক উদ্যোগে অংশগ্রহণ করতে পারে; অথবা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আইনি সম্পর্কগুলো সৃষ্টি করতে পারে। তাদের চেয়ে ক্ষমতাবান কেউ যে কোন মুহূর্তে তাদের এ সব উদ্যোগের মধ্যে ঢুকে পড়বে এবং সময় ও সুযোগ মত তাদের লাভটুকু চুরি করে নিয়ে যাবে- এ ধরনের কোন তাৎক্ষণিক ভীতি ছাড়াই তারা এ সব করতে পারে।

তবে স্থিতিশীলতা ও নিশ্চয়তা (যাকে ইংরেজিতে Predictability বলা হয়) সে সব সমাজে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যেখানে এক শাসক থেকে পরবর্তী শাসকের কাছে ক্ষমতার পালাবদল বিশৃঙ্খলপূর্ণ এমনকি সহিংস হয়। যদি কেউ মনে করে, বর্তমানে সম্পদের বণ্টনকে যেভাবে সম্মান করা হয়, পরবর্তী শাসক সম্পদের বণ্টনকে সেভাবে সম্মান নাও করতে পারে, তবে সে দীর্ঘমেয়াদী কোন লেনদেনে বা চুক্তিতে তার সম্পদ ব্যবহারের ঝুঁকি নিতে চাইবে না। একইভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানদের কাছে নিজ সম্পত্তি হস্তান্তরের অতি

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেও মানুষ চিন্তিত থাকবে। আলেম সমাজ এ সব উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা হ্রাস করেছেন। কেননা যদি শাসক পরিবর্তিতও হতো, আলেম সমাজ তো ছিলেন এবং তারা তখনো আইন যেন মান্য করা হয় নতুন শাসকের কাছে সে দাবি উত্থাপন করতেন। এভাবে আমরা দেখতে পাব ইতিহাসের যে সময় রাষ্ট্র দখল ও ক্ষমতার পরিবর্তন ছিল নৈমিত্তিক, যেমন একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে আন্দালুসিয়াতে দেখা গেছে, আলেম পরিবারগুলোই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে এবং আইন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেছে।[৪১]

সুতরাং সে সময়ে আলেম সমাজকে আইনের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অব্যাহত রাখা নতুন শাসকের জন্যও দরকার ছিল। কেননা তাদের মাধ্যমেই নতুন শাসক সম্পত্তির অধিকারী জনসাধারণকে এ ইঙ্গিত দিতে সক্ষম ছিল যে, তারা শাসন ক্ষমতায় আসার পূর্বে যেভাবে সম্পদের বণ্টনকে সম্মান প্রদর্শন করা হতো, তারাও বিষয়টিকে সেভাবেই সম্মান প্রদর্শন করবে। অতএব তাদের এ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই।

তাই বলে এ কথা বলা যাবে না যে, নতুন শাসকের নতুন অবস্থান অনুযায়ী আইনে যে নির্দিষ্ট কিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন হতে পারে সেটাও আলেম সমাজ মানতে নারাজ ছিলেন। তবে সত্যি বলতে কি যে কোন স্বাধীন আইনি ব্যবস্থা সমাজের অন্যান্য শক্তির প্রভাব থেকে কখনো সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সে যুগে নতুন শাসকের ইচ্ছায় কোন একটি নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে অনুসৃত কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাব (school of thought on explanation and content of law) পরিবর্তিত হয়ে নতুন মাযহাব চালু হতো। বিশেষ করে যখন রাজকীয় আইনি ব্যবস্থার ব্যাপকতার সাথে সাথে সাংগঠনিক কাঠামো এবং আমলাতান্ত্রিকতা জোরদার হয়েছে তখন এমনটি ঘটতে দেখা গেছে।

উদাহরণ স্বরূপ উসমানিয়া সাম্রাজ্যের কর্তৃপক্ষ যেখানেই বিজয়ী হয়েছে এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণ মজবুত করতে পেরেছে সেখানেই তারা তাদের পছন্দের মাযহাব অর্থাৎ হানাফী মাযহাব চালু করেছে এবং এভাবে পছন্দের মাযহাব চালু করার এই রীতিটি তাদের ক্ষমতারোহণকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই তারা হানাফী মাযহাবের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে যে মাযহাব চালু

---

৪১. দেখুন, যেমন, ডমিনিকা উরভয় (Dominique Urvoy), *Le Monde des ulemas andalus du V/Xle au Vll/Xllle siècle : etude sociologique,* (জেনেভা : ড্রোজ, ১৯৭৮)

www.pathagar.com

ছিল সেটাও সংরক্ষণ করেছেন। যেমন উত্তর আফ্রিকায় তারা বিচারকাজ পরিচালনার জন্য হানাফী ও হানাফী নন এমন মাযহাব অনুসারী বিচারক নিয়োগ দিয়েছেন। হানাফী হোক বা অন্য মাযহাব হোক- যে কোন ক্ষেত্রেই শরীয়ার অবস্থান সংরক্ষণ করা হতো এবং সে যুগে আইনের উপর আলেম সমাজের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যে স্থিতিশীলতা ও নিশ্চয়তা পাওয়া যেত শরীয়া সংরক্ষণের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা হতো।

তবে স্থিতিশীল ও নিশ্চিত আইনগত বিধিবিধানের উপযোগিতা কমে যেত যখন জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন করতে বা নির্দোষকে শাস্তি দিতে কোন স্বৈরশাসক সেগুলোকে নিজের ইচ্ছে মত পাশ কাটাত। ইবনে খালদুন যেমনটি বলেছেন, 'সভ্যতা বিনাশী অন্যায় ও অবিচার একমাত্র তারাই করতে পারে যাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে।'[৪২] বাস্তবে আইনের ওপর আলেম সমাজের নিয়ন্ত্রণ কিভাবে এমন একজন নির্বাহী ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে অন্যের ন্যায্য সম্পদ কেড়ে নেয়া কিংবা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা থেকে সংযত করতে পারে? শরীয়া নিজেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে আপাত শূন্যতা বা ফাঁক রেখে দিয়েছে ঐ শূন্যতা পূরণ করার জন্য শাসকের প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা থাকার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্নটি ওঠে আসে এবং প্রশ্নটি যথেষ্ট স্পর্শকাতর।

এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করতে গিয়ে এ কথা স্বীকার করা দরকার যে, কোন শাসনতান্ত্রিক কাঠামোই কাঠামোগত অপব্যবহার থেকে নিরাপদ নয়। ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রও অবশ্যই এ হিসেবের বাইরে নয়। ইতিহাসে এমন দেখা যায়, ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রে আলেম সমাজের সর্বোচ্চ প্রয়াস সত্ত্বেও দুর্নীতিগ্রস্ত বা অত্যাচারী শাসক জনগণকে লুণ্ঠন করেছে, চুরি করেছে এবং নিপীড়ন করেছে। এখানে প্রাসঙ্গিক অনুসন্ধানের বিষয় হচ্ছে এ সব জুলুম, অত্যাচার বা ধ্বংসলীলা আইনের আওতায় নাকি আইন বহির্ভূতভাবে ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা এবং ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কতখানি কার্যকরভাবে এ ধরনের অত্যাচারী শাসকের সফল হওয়ার সম্ভাবনাকে হ্রাস করেছে সেটিও খতিয়ে দেখা।

শাসককে অবশ্যই শরীয়ার সীমার মধ্যে থাকতে হবে, অন্যথায় আইনি বৈধতা হারানোর ঝুঁকি নিতে হবে- এভাবে চাপ দেয়ার ক্ষমতাই ছিল অত্যাচারী শাসককে প্রতিরোধে সে যুগের আলেমসমাজের ভূমিকার মূল বিষয়। আইনি বৈধতা হারানোর

---

৪২. ইবনে খালদুন, *The Muqaddimah*, খ. ২, পৃ. ১০৭

www.pathagar.com

ঝুঁকি- যার কথা আগে বলা হল- শাসককে তার কাজগুলো তার বৈধ ক্ষমতার আওতায় হচ্ছে এটা প্রমাণে তাৎপর্যপূর্ণভাবে উৎসাহ জোগাতো। কাজেই নিজের সম্পদ বৃদ্ধি কিংবা বিরোধীকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক বিধি জারি করার জন্য শাসক তার ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে পারে- এটা শাসকের কাছে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়েছে। তবে এ সব প্রশাসনিক বিধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এগুলো সরাসরি শরীয়ার পরিপন্থী হতে পারত না বা হতো না।

সম্পত্তির ব্যাপারে এই নীতিটি একটি অর্থপূর্ণ সীমারেখা বা বাধা হিসেবে কাজ করেছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে-(আধুনিক যুগের পূর্বে যে কোন সমাজে সম্ভবত যা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিষয়) শরীয়া পরিবর্তনের তেমন কোন সুযোগ রাখেনি। পবিত্র কুরআন নিজেই উত্তরাধিকারীর অংশ কতটুকু হবে সে বিষয়ে বিধান দিয়েছে। কাজেই শাসক নিজের অনুকূলে সম্পদের বড় অংশ দখল করে নেয়ার জন্য ঐ বিধান সহজে পরিবর্তন করতে পারত না। আইনের সুরক্ষা দৃঢ়তর করার জন্য আলেম সমাজ 'ট্রাস্ট' নামক এক ধরনের আইনগত মতবাদ তৈরি করেন। এর ফলে চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন (দাতব্য প্রতিষ্ঠান) তৈরির মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সম্পদ হস্তান্তরের সুযোগ সৃষ্টি হয় যা আইনগতভাবে স্থায়ী হয় এবং সরকারি হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকে। উপরন্তু এ ব্যবস্থা অধস্তন বংশধরদেরকেও এর দ্বারা উপকৃত হওয়া নিশ্চিত করে।[৪৩] দয়া ও ধূর্ততা- এ দুটোর সংমিশ্রণের কারণে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান উত্তরাধিকারীর পাশাপাশি, (যাদেরকে এ সব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা স্থায়ী করতে চেয়েছে), অনেক সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত আলেম বা পণ্ডিত শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানেরও উপকার করেছে। কাজেই এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করা হলে তা আলেম সমাজকে ক্ষুব্ধ করত যারা তাদের প্রাতিষ্ঠানিক জীবন-জীবিকার জন্য এ সব প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করতেন। যে শাসক তার সবচেয়ে সেরা নাগরিকদের বিপুল পরিমাণ সম্পদ গ্রাস করতে চাইত, তাকে এ ধরনের ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হতো, (যাদেরকে সে সমস্যায় ফেলেছে বা যে কোনভাবে বিরক্ত করেছে) এবং এভাবে নিজের বিপদ ডেকে আনত।

যখন সম্পদ লুণ্ঠনের লোভ ব্যাপক হয়ে যায় শাসককে তখন এ থেকে বাধা দেয়া হয় শরীয়ার এই বিধানের দ্বারা যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দেয়া যাবে

---

৪৩. সাধারণ ভাবে ওয়াকফ বিষয়ে দেখুন, ভিকর, *Between God and the Sultan*, পৃ. ৩৩৯-৪৪; আরো দেখুন, রিচার্ড ভ্যান লিউয়েন (Richard Van Leeuwen), *Waqfs and Urban Structure : The Case of Ottoman Damascus* (লেইডেন : ব্রিল, ১৯৯৯)

www.pathagar.com

না; এটি পবিত্র। পাশাপাশি চুরি বা লুণ্ঠনকেও নিষিদ্ধ করা হয়। সেকালে যে শাসক তার কোষাগার সমৃদ্ধ করার জন্য লুণ্ঠন করতে পারত না সে এ কাজ করার জন্য করারোপের পথ ধরত। এখানে শরীয়া একদিকে কিছু নির্দিষ্ট ধরনের ইসলাম অনুমোদিত বা ক্যানোনিক্যাল করারোপ করার সুযোগ দিয়েছে, যেমন- দরিদ্রদের জন্য ভিক্ষা কর, কুরআনে বর্ণিত আল্লাহকে প্রদত্ত এক পঞ্চমাংশ প্রদেয়; যেগুলো সম্পর্কে আলেমরা ব্যাখ্যা দিয়েছেন এ মর্মে যে, এরূপ এক পঞ্চমাংশ আইনত নেয়া যাবে গনিমত থেকে, খনি থেকে উত্তোলিত সম্পদ থেকে এবং অন্যান্য আরো কিছু আয় থেকে। পাশাপাশি ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের জন্য জিযিয়া কর (poll tax) আদায় করা যাবে।[৪৪] অন্যদিকে ক্যানোনিক্যাল কর যখন সংগ্রহ করা হবে তখনও শরীয়া সরাসরি প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীনে অন্যান্য সম্পূরক কর আদায় করতে নিষেধ করেনি।

তারপরও এ বিধানের আওতায় একজন শাসক কঠোর প্রকৃতির এমনকি সম্পদ অধিগ্রহণমূলক কর আরোপ করতে পারত। এতে সে যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতো সেটা যে কোন অতিমাত্রায় করারোপকারী শাসকেরই হয়ে থাকে। এ সব ক্ষেত্রে জনসাধারণ ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কর পরিশোধ করে। মুসলিম বিশ্বে রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের দ্বারা রাজাদের জন্য লিখিত নির্দেশনামূলক ম্যানুয়াল ছিল; ইবনে খালদুন এই ম্যানুয়াল সতর্কতার সাথে অধ্যয়ন করেছেন এবং তিনি অতি করারোপের তীব্র সমালোচনা করেছেন। এ সব ম্যানুয়ালে স্বাভাবিকভাবেই শাসকদেরকে অতি করারোপের ফলে জনপ্রিয়তা হারানো এবং সম্ভাব্য বিপর্যয়কর অর্থনৈতিক পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। তবে আলেমদের রচনায় ক্যানোনিক্যাল করের ব্যাপারে সবিস্তারে ব্যাখ্যা দেয়া থেকে তারা বিরত থেকেছেন এবং বিশেষ কর নিষেধ করার ব্যাপারেও তারা বেশি কিছু বলেননি, যা শাসকরা কোন না কোনভাবে আরোপ করেছে। রাজস্ব কোন্ কোন্ খাত থেকে কিভাবে আসবে এ ব্যাপারে

---

৪৪. এমন কি ধর্মীয়ভাবে অনুমোদিত বা ক্যানোনিক্যাল কর (Canonical tax) যেমন এক পঞ্চমাংশ দেয়, আরবীতে যাকে বলা হয় খুমুস্, ব্যাখ্যা করাও সংবেদনশীল ছিল। এক বিবরণ অনুযায়ী উসমানীয় জেনিসারি (Janissary) ক্যাডারের সূচনা হয়েছে নতুনধারার আইনি পরামর্শের ভিত্তিতে; পরামর্শটি হচ্ছে যুদ্ধে নিয়ে আসা দাসদের এক পঞ্চমাংশকে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অংশ দেয়া উচিত। দেখুন, কামাল কাফাদার (Cemal Kafadar), *Between Two Worlds : The Construction of the Ottoman State,* (বার্কলী ও লস এঞ্জেলস : ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৯৫), পৃ. ১১২

www.pathagar.com

শরীয়ার প্রকৃত ভূমিকা হচ্ছে, শরীয়া এ ক্ষেত্রে শাসকের অগ্রাধিকার ঠিক করে দেয়, যেন যৌক্তিক করারোপ তার রাজস্ব সৃষ্টির সর্বোত্তম উপায়ে পরিণত হয়। যা হোক, এর ফলে যৌক্তিক আচরণকারী শাসককে তার করারোপের ক্ষমতাকে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে এটি উৎসাহিত করে।

অপরাধমূলক কাজের বিচার ব্যবস্থা (ক্রিমিনাল জাস্টিস) কিছুটা একই পন্থায় কাজ করেছে। মুসলিম শাসকদের সরকারের কাজকর্ম চালানোর জন্য যেমন ইসলাম অনুমোদিত বা ক্যানোনিক্যাল করের অতিরিক্ত আরো করের প্রয়োজন হতো, তেমনি কেবলমাত্র শরীয়া কর্তৃক নির্ধারিত অপরাধের শাস্তির উপর নির্ভর করে সফলভাবে বিচার কাজ পরিচালনা করা যাবে- এটা কোন শাসকই আশা করত না। তাদের সুযোগ যে সীমিত- অর্থাৎ শাস্তিবিধান করা যাবে মাত্র কয়েকটি অপরাধের জন্য- হত্যা, চুরি ও যৌন অনৈতিক আচরণ ইত্যাদির জন্য- সেটাই মূল সমস্যা ছিল না; যেহেতু পূর্ব-আধুনিক যুগের বিশ্বের অধিকাংশ অপরাধমূলক (ক্রিমিনাল) আচরণ সম্পর্কিত আইনের বিষয়গুলোর সবই এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। বরং শরীয়া তার নির্ধারিত শাস্তি বিধান করার পূর্বে অপরাধ প্রমাণ করার জন্য যে উচ্চমান ঠিক রাখার কথা বলেছে সেটা আইন সম্মতভাবে করাটাই ছিল তাদের জন্য সমস্যা।

কঠোর এবং শারীরিক শাস্তি সম্ভবত শরীয়ার সবচেয়ে পরিচিত বৈশিষ্ট্য। ক্লাসিক্যাল ইসলামী আইন অনুযায়ী চুরির অপরাধে চোরের হাত কাটা যাবে। অন্যদিকে ব্যভিচারী পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে। তবে পশ্চিমা পাঠকদের কাছে যে বিষয়টি অজানা সেটা হচ্ছে, যতক্ষণ অতি উচ্চ পর্যায়ের মান ঠিক রেখে অপরাধ প্রমাণ করার পর কোন আদালত কর্তৃক দণ্ডাদেশ না দেয়া হবে, ততক্ষণ এ ধরনের শাস্তি কার্যকর করা যাবে না। আর এ ধরনের উচ্চ পর্যায়ের মান ঠিক রেখে অপরাধ প্রমাণ করা কদাচিৎ সম্ভব হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ব্যভিচারের শাস্তির কথা বলা যায়। কোন ব্যভিচারের ঘটনাকে চারজন চরিত্রবান পুরুষ সাক্ষীর স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতে হবে যারা এই ঘটনার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। তবেই ব্যভিচারের শরীয়া সম্মত শাস্তি বিধান করা যাবে। আর এটা সহজেই অনুমেয় যে, এ ধরনের অবস্থা খুবই দুর্লভ একটি ব্যাপার।[৪৫]

---

৪৫. পাওয়ারস (Powers), *Law, Society and Culture in the Maghrib*, পৃ. ৮২ ('যে কোন অবস্থায় মুসলিম সমাজের কোন সদস্যকে পাথর নিক্ষেপ করা ব্যতিক্রমী ঘটনা হতো।') পাওয়ারস ১৩০০-১৫০০ সনের মরক্কো (Maghrib) সম্পর্কে এ কথা বলেছেন। তবে এ অবস্থাটি আরো দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রযোজ্য বলা যেতে পারে।

www.pathagar.com

আমার মতে, শরীয়া আইনি ব্যবস্থায় চরম পর্যায়ের কঠোর শাস্তির জন্য অপরাধের উচ্চমানের প্রমাণ করার এই ব্যবস্থার অন্যতম কারণ হচ্ছে, এই আইন কার্যকর করা ব্যয়বহুল। আধুনিক যুগের পূর্বে, আমরা যাকে বলি পরিপূর্ণ উন্নত পুলিশ বিভাগ, এমন পুলিশ বিভাগ কোন সমাজেই ছিল না। অন্যদিকে ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেবল অল্প কয়েকজন কর্মকর্তার ব্যবস্থা ছিল, যারা সাধারণ আইন কার্যকর করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। চরম ও দৃশ্যমান শাস্তিসমূহ জনসাধারণকে আইন মান্য করার কথা মনে করিয়ে দেয়। আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, যদি খারাপ বা মন্দ কাজ করার কারণে গ্রেফতার ও শাস্তি পাওয়ার ঘটনা কম হয়- যথাযথ পুলিশ বাহিনী ছাড়া যে কোন সমাজে যেটা হওয়ারই কথা- তাহলে অবশ্যই শাস্তি এমনভাবে দিতে হবে যেন তা অপরাধ করার ব্যাপারে যথেষ্ট মাত্রায় বাধা হিসেবে কাজ করে। শরীয়া নির্ধারিত শারীরিক শাস্তির ব্যবস্থাটি স্পষ্টতই করা হয়েছে মূলত এমন এক সমাজের জন্য যেখানে এগুলোর বাস্তবায়ন খুব কম হবে। এ ব্যবস্থাটি অনেকটাই ইংলিশ সাধারণ আইনের মত যা নরহত্যা বা ডাকাতির মত প্রতিটি অপরাধের জন্য অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করত।

সময়ের বিবর্তনে যখন ইসলামী রাষ্ট্র (বিশেষত উসমানিয়া সাম্রাজ্য) অধিকতর সম্প্রসারিত হয় এবং মানুষের সাধারণ জীবনযাপনের উপর তা ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ ও প্রভার সৃষ্টি করে, তখন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য কেবল অল্প কয়েকটি কঠোর শাস্তির বিধান যথেষ্ট ছিল না। বস্তুত আধুনিক বিশ্বে যেমনটি দেখা গেছে, মানুষের আচরণের ব্যাপক পরিধিকে যখন অপরাধমূলক আচরণের আওতায় নিয়ে এসে তুলনামূলক হাল্কাভাবে প্রমাণ করার মাধ্যমে অপরাধ নির্ণয় করে তুলনামূলক হাল্কা শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে, নিরাপদ ও কার্যকর প্রশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সেটা অধিকতর ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রে এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রশাসনিক বিধিবিধানকে ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও এগুলো শরীয়া নির্ধারিত অপরাধের শাস্তির সমকক্ষ হতে পারেনি, তবে এগুলো শরীয়া নির্ধারিত শাস্তির পাশাপাশি সম্পূরক শাস্তির পর্যাপ্ত ও ব্যাপকভিত্তিক ব্যবস্থাসহ অপরাধ সম্পর্কিত এমন একগুচ্ছ আইন দিতে সক্ষম হয় যেগুলোকে যে কেউ ইসলামী রাষ্ট্রের সত্যিকারের অপরাধ (ক্রিমিনাল) আইন বলে চিহ্নিত করতে পারে। এ সব বিধি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করার জন্য আলেমসমাজের প্রয়োজন ছিল না। উপরন্তু এ সব আইনে একাধিক চরিত্রবান সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের প্রয়োজনীয়তাসহ শরীয়া আদালতের জন্য যে নির্ধারিত মান সেটা সহজ করা বা সে সব শর্ত সম্পূর্ণভাবে

www.pathagar.com

উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল। অবশ্য শাসকরা সাধারণভাবে এ সব অপরাধ নিয়ন্ত্রণমূলক প্রশাসনিক আইন কার্যকর করার জন্য আদালতের উপর নির্ভর করত। ফলে এ ধরনের *ডি ফ্যাক্টো* আইনি ব্যবস্থার কার্যকারিতার ক্ষেত্রে আলেম সমাজেরও কিছুটা ভূমিকা পালনের সুযোগ ছিল। তবে এত কিছুর পরও বাস্তবতা হচ্ছে প্রশাসনিক বিধান কার্যকর করার জন্য একজন শাসকের আদালতকে ব্যবহার করা কৌশলগতভাবে তখন জরুরি ছিল না।

শাসক মন্দ কাজের শাস্তি বিধান করতে গিয়ে শরীয়ার আওতার বাইরে যেতে পারে- এটা যদি ধরে নেয়া হয়, তাহলে আইনের উপর আলেম সমাজের নিয়ন্ত্রণ কিভাবে অপরাধী নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শাসককে সংযত করতে পারে বা সে যুগে শাসককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত? এর আংশিক উত্তর হচ্ছে সে সময় শরীয়া আদালত এবং এর কার্যপ্রণালীর নিয়মানুগ বৈশিষ্ট্য এক ধরনের মাপকাঠি তৈরি করে দেয় যার মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণমূলক প্রশাসনিক বিধিবিধান গঠন ও কার্যকর করার ব্যাপারটি সঠিক ভাবে হচ্ছে কি-না তা যাচাই করা যেত। ক্লাসিক্যাল শরীয়াভিত্তিক অপরাধ (ক্রিমিনাল) আইনে নির্ধারিত শাস্তিগুলো সম্পর্কে অবিরত লেখা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলেম সমাজ বোঝাতে চেয়েছেন যে, সে যুগে যথাযথভাবে কার্যকর বিচার ব্যবস্থা অপরাধমূলক আচরণের প্রমাণকরণ সম্পর্কিত বিধি এবং নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসরণ করেই চলত। সম্ভবত এ কারণেই সে যুগে এত বেশি সংখ্যক শাসক তাদের নিজস্ব আইনি ব্যবস্থা কার্যকর করতে গিয়ে আলেম সমাজ এবং আদালতের উপর নির্ভর করেছেন।

আইনি বৈধতা এবং আমলাতন্ত্র

আইনের উপর ইসলামী পণ্ডিত বা আলেম সমাজের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় তার আরো অগ্রসর এবং সম্ভবত আরো গভীর উত্তর রয়েছে। কেননা শরীয়াকে যেভাবে আলেমসমাজ ব্যাখ্যা করেছেন সেটা চূড়ান্ত বিচারে শাসককে প্রশাসনিক বিধি জারি করার কর্তৃত্ব দিয়েছে। অন্যদিকে আলেম সমাজের এই তত্ত্বগত ধারণা ছিল যে, এ সমস্ত বিধি পরোক্ষভাবে হলেও শরীয়ার পক্ষ থেকে আইনগত কর্তৃত্ব লাভ করেছে এবং সে কারণে তা আলেমদের কাছ থেকেও কর্তৃত্ব লাভ করেছে। বস্তুত আলেমদের এ কথা স্বীকার করা ছাড়া উপায় ছিল না যে, ক্লাসিক্যাল ইসলামী আইনের নিতান্ত সীমিত সংখ্যক অপরাধ সম্পর্কিত বিধিবিধান এবং নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি জটিল শহুরে সমাজ সহজে পরিচালিত হতে পারবে না। কাজেই এর পরিপূরক হিসেবে প্রশাসনিক বিধিবিধান জারি করা জরুরি এবং সে

www.pathagar.com

কারণেই সে যুগে শাসককে তা জারি করতে হতো। এ অবস্থায় এ সব বিধানকে চ্যালেঞ্জ না করে বা এগুলোকে শাসকের একান্তই ব্যক্তিগত খেয়ালখুশির ফসল মনে না করে বরং এগুলোকে শরীয়ার অনুমোদিত বিষয় হিসেবে মেনে নেওয়াই ছিল আলেমদের জন্য উত্তম এবং তারা সেটাই করেছেন।

শাসকের সৃষ্ট প্রশাসনিক বিধিবিধানকে সাধারণভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা ঠিক রাখার জন্য আইনত বৈধতা দেয়াই ছিল আলেমসমাজের এই কৌশলগত সিদ্ধান্তের পরিণাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিংশ শতাব্দীতে প্রশাসনিক স্টেটের উত্থানের সাথে এর একটি কার্যকর তুলনা করা যেতে পারে। সে দেশে নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা ফেডারেল ব্যবস্থায় আদালতের ঐতিহ্যগত, পুরনো এবং একচেটিয়া ভূমিকাকে নানা ভাবে বদলে দিয়েছে। তাদের কর্তৃত্বের প্রতি অবৈধ চ্যালেঞ্জ মনে করে এ সমস্ত নতুন প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যাখ্যান করা অবাস্তব হতো বিধায় সে দেশের বিচারকরা কিছুটা ব্যতিক্রমী উপায়ে হলেও তাদের (প্রশাসনিক স্টেটের) ভূমিকাকে পুনঃপর্যালোচনা করার ক্ষমতা ধরে রেখে তাদেরকে আশীর্বাদই করেছে।[৪৬] ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আলেমসমাজ সর্বদা এমনভাবে কাজ করে গেছেন যেন তারাই সামাজিক ব্যবস্থাটিকে প্রাধিকার দিয়েছেন, যেটা প্রকৃতপক্ষে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় শাসকদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

এ কাজ করতে গিয়ে আলেমসমাজ তাদের নিজস্ব অবস্থানের আনুষ্ঠানিক ভিত্তিকে পুনঃনিশ্চিত করে এবং পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান জটিল ইসলামী রাষ্ট্রের সৃষ্ট নতুন প্রতিষ্ঠানগুলোকে আইনি বৈধতা দেন। তবে রাষ্ট্র যত বেড়েছে ও উন্নত হয়েছে অনিবার্যভাবে আলেমদের গুরুত্ব ক্রমশ ততই কমেছে। তারপরও আলেমসমাজ তাদের আইনগত বৈধতাদানের যে ক্ষমতা ছিল তার মাধ্যমে তাদের মর্যাদা ও গুরুত্ব যথেষ্ট মাত্রায় ধরে রাখতে সক্ষম হন এবং এভাবে তারা বেপরোয়া শাসকের জন্য এক ধরনের ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি করেন। এই জটিল প্রক্রিয়ার স্পষ্ট উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে উসমানিয়া সাম্রাজ্যে আলেমসমাজের ভূমিকাকে ক্রমশ আমলাতান্ত্রিক করা এবং কেন্দ্রীভূত করার প্রক্রিয়ার মধ্যে।[৪৭]

---

৪৬. *Crowell v. Benson*, ২৮৫ ইউএস ২২ (১৯৩২)

৪৭. দেখুন, রিচার্ড রেপ, "Some Observations on the Development of the Ottoman Learned Hierarchy", in *Scholars, Saints and Sufis : Muslim Religious Institutions in the Middle East since 1500,* সম্পাদনা : নিকি কেডি (Nikki Keddi), (বার্কলী ও লসএঞ্জেলস : ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৭২), পৃ. ১৭

www.pathagar.com

যেমনটি আমি ইতোপূর্বে বলেছি, প্রাক অটোমান সুন্নী শাসনতান্ত্রিক আমলে শাসকরা আলেমসমাজ থেকে বাছাই করে বিচারক নিয়োগ দিত। তবে তখন আইনের বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আলেমসমাজের হাতে ছিল, যারা সাধারণত কোন সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। সে যুগে এ সব বেসরকারি আলেম আইন বিষয়ে গবেষণামূলক আলোচনা-গ্রন্থ রচনা এবং শিক্ষাদানের মাধ্যমে আইনের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তবে মূলত যে কোন বাস্তব ঘটনায় জড়িত কোন একটি পক্ষের অথবা বিচারকের আইনি বিষয়ে জিজ্ঞাসার সরাসরি জবাব হিসেবে ফতওয়া দানের মাধ্যমে তারা এ কাজটি করেছেন। উসমানিয়া আইনি ব্যবস্থা যখন বিকাশ লাভ করছে রাজকীয় আদালত তার বিচারক নিয়োগদানের ঐতিহ্যগত ভূমিকা থেকে সরে গিয়ে সরকারি মুফতী বা ফতওয়াদানকারীর সম্মানিত পদ সৃষ্টি করে। কেবল সম্মানজনক পদ হিসেবে সরকারি এই পদটির সূচনা হয়। কিন্তু কালক্রমে এটি আইনগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং সরকারি মুফতী কর্তৃক জারি করা ফতওয়া বাধ্যতামূলক রূপ পরিগ্রহ করে। (ঐতিহ্যগতভাবে প্রাক অটোমান মডেলে ফতওয়া মানার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না এবং কোন বিষয়ে একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী ফতওয়া থাকলে সেখান থেকে কোনটি গ্রহণ করা হবে বিচারক সে বিষয়ে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন।)

যা হোক, অটোমান সাম্রাজ্যে গ্রান্ড মুফতী অধস্তন মুফতী হিসেবে অন্যকে নিয়োগদান বা কর্তৃত্বদানের দায়িত্ব পালন করতেন। এভাবে কালক্রমে গ্রান্ড মুফতীকে কেন্দ্র করে, যাকে শায়খুল ইসলাম বলা হতো, সত্যিকারের একটি আইনি আমলাতন্ত্র গড়ে ওঠে। গ্রান্ড মুফতী পদে অধিষ্ঠিত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম আবুস সউদ আফেন্দী, যাঁর সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। তিনি সুলায়মানের শাসনামলে অগণিত ফতওয়া জারি করেন।[৪৮] এ সব ফতওয়ার অনেকগুলো অনিশ্চিত প্রশ্নের উত্তরে পুরনো দিনের আইনি মতামতের মত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ফতওয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে নির্দিষ্ট মামলার ক্ষেত্রে এর অনেকগুলো আদালতের রায়ের মতই ছিল। আবুস সউদ ও পরবর্তী গ্রান্ড মুফতীগণ বহু সংখ্যক আইন বিষয়ক করণিক নিয়োগ দেন। এ সব করণিক মামলা পর্যালোচনা করত এবং সুপারিশ তৈরি করে দিত। সেগুলো গ্রান্ড মুফতীর স্বাক্ষরে গৃহীত হতো এবং এ সব সুপারিশকে সরকারি রায় হিসেবে

---

৪৮. কলিন ইমবার (Colin Imber), *Ebu's-su'ud : The Islamic Legal Tradition*, (স্ট্যামফোর্ড : স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৭); পদটির আমলাতান্ত্রিকীকরণ সম্পর্কে দেখুন, ইমবার, *The Ottoman Empire*, পৃ. ২৪১-৪২

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত করত। আর এই প্রক্রিয়াটি ক্লাসিক্যাল মুফতীর ব্যক্তিগত বিবেচনা এবং নিজস্ব আইনি যুক্তি প্রয়োগের যে রূপ তার চেয়ে বরং চ্যান্সেরী বা এমনকি আধুনিক আপিল আদালতের কাজের সাথেই বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

উসমানিয়া সাম্রাজ্যের আইনি ব্যবস্থার অন্যান্য দিকের বিকাশের সাথে সাথে গ্রান্ড মুফতীর পদটিও আমলাতান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ করে। অনানুষ্ঠানিক ইসলামী শিক্ষা (আলেমদের শিক্ষা) এবং তাদের আইনগত কর্তৃত্বের পরিবর্তে একটি আনুষ্ঠানিক পেশা গড়ে ওঠে, যার জন্য নির্দিষ্ট পদসোপান ছিল এবং এই পেশায় সরকারি পদ পেতে হলে একজন আলেমকে অবশ্যই এ সব পদসোপান অনুসরণ করতে হতো।[৪৯] এ সময় আলেমসমাজের আইনি কার্যাবলী কেবল সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিষ্ঠিত আলেমদের দ্বারা সম্পাদিত হতে শুরু করে। তখন আইন ক্রমশ রাষ্ট্রের কর্মপরিধির মধ্যে আসতে শুরু করে। তবে ক্লাসিক্যাল আইনি ব্যবস্থায়- (যে ব্যবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত বিচারিক পদ গ্রহণ না করত আলেমসমাজ সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থেকে কার্যকরভাবে মুক্ত ও স্বাধীন ছিলেন)- আইনের যে স্বাধীনতা ছিল, রাষ্ট্রের কর্মপরিধির মধ্যে চলে আসার পর আইন তার কিছু কিছু ক্রমশ হারিয়ে ফেলে।

রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে আলেমদেরকে ক্রমান্বয়ে অনুপ্রবেশ করানোর এই প্রক্রিয়া আলেমসমাজের প্রেক্ষিত থেকে বিবেচনা করলে একটি ঝুঁকিপূর্ণ কৌশল ছিল বলা যায়। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেমনটি দেখব, এ প্রক্রিয়া উসমানিয়া সাম্রাজ্যের সংস্কারে নতুন যুগের সূচনার পথ করে দেয় বটে, তবে এ সংস্কারের মাধ্যমে সুন্নী আলেমদেরকে তাদের প্রায় সকল অধিক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দেয়া হয় এবং তারা শাসকের ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। এই বিপর্যয়কর ঘটনা (অন্তত আলেমদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিপর্যয়কর) এবুস সউদের কর্মজীবনের পরম উন্নতির প্রায় তিনশ বছর পর ঘটে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, উসমানিয়া সাম্রাজ্যের কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে আলেম সমাজের অনেক কিছু লাভ করার ছিল। তা ছাড়া সুদীর্ঘ কালের জন্য তাদের

---

৪৯. রেপ (Repp) একে বলেছেন *cursus honorum*. দেখুন, রেপ, Ottoman Learned Hierarchy, পৃ. ২০; বিধিবিধানের প্রথম যে জ্ঞাত আনুষ্ঠানিকীকরণের (Formalization) ঘটনা তা দেখা দিয়েছিল পনেরো শতকের দ্বিতীয় ভাগে (১৯ এবং সংখ্যা ৫); তবে শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে যখন বয়োজ্যেষ্ঠ আলেমদের সন্তানেরা কেউ কেউ জ্ঞানের দিক থেকে কোন যোগ্যতা প্রদর্শন ছাড়াই পার্থিব উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়ে যায় (৩১)- যা যে কোন পুরনো সুনাম ভিত্তিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

www.pathagar.com

নিজস্ব আলোকে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের এই সম্পর্কের কৌশল সফল ছিল।

একটি বর্ধিষ্ণু কেন্দ্রীয় প্রশাসন সম্বলিত একটি ক্রমবর্ধমান বিশাল সাম্রাজ্যকে সুশৃঙ্খল রাখতে এবং সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে একটি কার্যকর এবং একীভূত আইনি ব্যবস্থার প্রয়োজন। পূর্বে যেমন রোমানদের একীভূত আইনের প্রয়োজন ছিল উসমানিয়া সাম্রাজ্যেরও তেমনি এ ধরনের আইনের প্রয়োজন ছিল। একইভাবে উসমানিয়া সুলতানের নিয়ন্ত্রণাধীনে শক্তিশালী একটি সেনাবাহিনী ছিল, যাদেরকে জনসাধারণের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। অন্যদিকে তাদের আলাদা প্রাসাদ-রক্ষী দল ছিল যাদেরকে রাজকীয় কৃতদাসদের এলিট শ্রেণী থেকে নিয়োগ দেয়া হতো; এদের আনুগত্য ছিল সরাসরি সুলতানের প্রতি। এ ছাড়া সুলতানের একটি শিক্ষিত সাচিবিক কর্মচারী শ্রেণী ছিল, যারা তাঁর রাজকীয় হিসাবপত্র রক্ষা করত এবং যারা দূরবর্তী অঞ্চলের প্রশাসন চালানোর কৌশল তৈরি করত। এ অবস্থায় সুলতান যদি ইসলামী পণ্ডিত বা আলেমদেরকে বাদ দিয়ে শুধু প্রশাসনিক বিধি জারি করে একাকী রাষ্ট্র চালাতে চাইতেন তবে এটা তার পক্ষে সম্ভব বলে হয়ত তিনি ভেবে থাকবেন; পরবর্তীতে সংস্কারের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত সেটিই প্রকাশ পেয়েছে। তবে বর্ধিষ্ণু রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে দিয়ে আলেমসমাজ রাজকীয় কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে নিজেদের এবং শরীয়ার, অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হন। তারা নতুন বিজিত এলাকা, যেমন বলকান ও অন্যান্য এলাকায় নিজেদের সাথে সাথে শরীয়াকেও প্রতিষ্ঠিত করেন। তারা উসমানিয়া সম্রাটকে ইসলামের পরিধির মধ্যে রাখতে সক্ষম হন। মোটকথা, বহু শতাব্দী পর্যন্ত সরকারি সুন্নী ইসলামকে তারা সক্রিয় ও জীবন্ত রাখতে সক্ষম হন।

এই পুরো ব্যাপারটির মধ্যে সুলতানদের জন্য যে দিকটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটা হচ্ছে তাদেরকে বৈধতাদানের ক্ষমতা, যা আলেম সমাজ দিতে পারতেন এবং দিয়েছেন। অটোমান অ-আরব আনাতোলিয়ান, যারা আরবকে একটি ছোট বা কম গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ হিসেবে মনে করত, এই ইসলামী আইনি বৈধতার ব্যাপারটি উৎসাহের সঙ্গে মেনে নেয়। অ-আরব সুলতান সুলায়মান প্রথম নিজেকে খলীফা বলে ঘোষণা করেন; এরপর পরবর্তী অটোমান সুলতানরা নিজেদেরকে একইভাবে খলীফা হিসেবে ঘোষণা করেন। মুসলিম বিশ্বের খলীফাকে আরব ও কুরাইশ বংশের হতে হবে এ ধরনের পূর্বশর্তের কথা ব্যক্ত

www.pathagar.com

না করে তারা এভাবে খলীফা হন। কেননা তারা আরব ও কুরাইশ বংশের ছিলেন না।[৫০]

খলীফা হিসেবে অন্তত তত্ত্বগতভাবে হলেও তারা শরীয়া সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অন্যদিকে এই দায়িত্বের জন্য খলীফা উপযুক্ত কিনা আলেমসমাজ ছিলেন তার প্রমাণ বা দলিল। এভাবে আলেমরা অটোমান খলীফাদেরকে এই দাবি করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেন যে, তারা (খলীফারা) সমগ্র সুন্নী বিশ্বের নেতৃত্বের অধিকারী অর্থাৎ তারাই সুন্নী বিশ্বের নেতা। খিলাফত বিলুপ্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত তাদের এই দাবিকে পশ্চিমা পর্যবেক্ষকরা দৃশ্যত মেনে নেয়। শুধু তাই নয়, আরো লক্ষণীয়ভাবে এবং গুরুত্বের সাথে বিষয়টিকে বিবেচনা করলে অটোমান ইতিহাসের অধিকাংশ সময়ে খলীফাদের এই দাবিকে অধিকাংশ সুন্নী মুসলিমও মেনে নেয়।

এই বৈধতাদানের মূল্য হিসেবে আলেমসমাজ নির্বাহী কর্তৃত্বের ভারসাম্য রক্ষার জন্য কিছু পদক্ষেপের উপর জোর দেন। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায় এভাবে- নীতিগতভাবে ইসলামী আইন ছিল উসমানিয়া সাম্রাজ্যের আইন এবং তার অর্থ ছিল সুলতান নিজেও এই আইনের অধীন; এর উর্ধ্বে নয়। সুলতানদের নজিরবিহীন ক্ষমতা তাদেরকে আলেমসমাজকে নজিরবিহীন আমলাতান্ত্রিক উপায়ে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। তথাপি আইনের জোয়ালকে যেভাবে আলেমরা ব্যাখ্যা করেছেন সুলতানগণ তাই কাঁধে তুলে নিয়েছেন- যা আইনের অধীনস্থতার শামিল এবং এটা পৃথিবীর বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলোর ইতিহাসে অশ্রুতপূর্ব। জাস্টিনিয়ানের মহৎ কর্ম 'ডাইজেস্টে' বলা হয়েছে যে, 'রাজারা কোন আইনের অধীন নয়'।[৫১] জাস্টিনিয়ানের এ নীতিবাক্যের বিপরীতে মুসলিম সাম্রাজ্যে কম ক্ষমতাবান কিংবা বিশাল ক্ষমতাবান যে কোন সুলতানই 'সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও তাঁর আইন তাদের উর্ধ্বে' -এ কথা স্বীকার করে নিয়েই খলীফা হয়েছেন।

সুতরাং এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, আইন দ্বারা এবং আইনের অধীনে সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকার ব্যাপারটি উসমানিয়া সাম্রাজ্য যতদিন টিকে ছিল এর জীবনের একটি অর্থপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বাস্তব অংশ ছিল। এ কথার অর্থ এই নয় যে, উসমানিয়া সাম্রাজ্যে দুর্নীতি ছিল না বা খলীফারা ডিক্রি

---

৫০. দেখুন, ইমবার (Imber), *The Ottoman Empire*, পৃ. ১২৬; ইমবার উসমানিয়া সাম্রাজ্যের কর্তৃপক্ষের প্রথম এই পরিভাষাটি ১৪২৪ হিসেবে ব্যবহার করেছে বলে ইমবার দেখিয়েছেন। তবে তিনি বলেছেন যে, এটি সে সময় ছিল 'আলঙ্কারিক; সুনির্দিষ্ট কিছু ছিল না'।

৫১. *Princeps legibus solutes est. Dig.* ১.৩.৩১

www.pathagar.com

জারি করে শাসন করতেন না। বস্তুত এ দুটোই আইনের শাসনের মধ্যেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সহাবস্থান করতে পারে, এমনকি তা আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রেও হতে পারে। যা হোক, উসমানিয়া সাম্রাজ্যে সরকারি কর্মকর্তারা বরং আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব বা আপত্তির নিষ্পত্তি করতেন। সরকার সময় সময় কর বসানোর পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত কর ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করত। শরীয়ার বিধান ও মূলনীতির ব্যত্যয় না ঘটিয়ে প্রশাসনিক বিধিবিধানের মাধ্যমে আদালত ফৌজদারী আইন বাস্তবায়ন করত। সবচেয়ে বড় কথা শাসক অর্থাৎ খলীফা তাঁর উপর রাষ্ট্রীয় আইনের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নিয়েই কাজ করতেন।

পৃথিবীর অন্যান্য বৃহৎ সাম্রাজ্যের মত উসমানিয়া সাম্রাজ্যও আইনের উপরিউক্ত ধরনের বন্ধনের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। যখন এ সাম্রাজ্যের পতনের সময় ঘনিয়ে আসে এবং সংস্কার অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে, তখন আইন কেন্দ্রিক সংস্কারের সূচনা হয়। শুধু সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে নয়, বরং সমগ্র সুন্নী বিশ্বে এ সংস্কার উদ্যোগের যে ফলাফল দেখা যায় সেটাই আমার এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

পতনোন্মুখ অবস্থা এবং চূড়ান্ত পতন

উসমানিয়া সাম্রাজ্যের পতন এবং সংস্কার ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে এর পতনোন্মুখ অবস্থা ফেরানোর চেষ্টার সাথে ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতন্ত্রের অবসান ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। খ্রিস্টিয় ১৮২০-এর দশকে সামরিক বাহিনীতে সংস্কারের উদ্যোগ সত্ত্বেও দ্বিতীয় সুলতান মাহমুদের শেষ কয়েক বছরে সাম্রাজ্যটি সবচেয়ে মারাত্মক সামরিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, যার পরিণাম সাম্রাজ্যটি কয়েক প্রজন্ম ধরে ভোগ করে। এ সময় উসমানিয়া সাম্রাজ্যের অন্যতম অংশ গ্রীস হাতছাড়া হয়। পরাজয়ের এ ধারা আরো ঘনীভূত হয় ১৮২৭ সনের নাভারিনোর যুদ্ধে যখন ব্রিটিশ, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মিলিত নৌশক্তির হাতে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের নৌ বাহিনী পরাস্ত হয় এবং ১৮৩০ সনে ফ্রান্সের হাতে আলজেরিয়ার পতন হয়। সুলতান মাহমুদের ছেলে প্রথম আব্দুল মজিদের সময়, যিনি ১৮৩৯ সনে ক্ষমতায় আরোহণ করেন, সাম্রাজ্যের এলিট শ্রেণী সর্বপ্রথম অভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রয়োজন উপলব্ধি করে। বাস্তবিক সে বছরই আব্দুল মজিদ একেবারে প্রত্যক্ষভাবে বিব্রতকর অবস্থার মুখোমুখি হন যখন মিসরের তৎকালীন নামসর্বস্ব গভর্নর কিন্তু বাস্তবে সুলতান আব্দুল মজিদের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী মুহাম্মদ আলির হাত থেকে তাঁর নিজের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূখণ্ড রক্ষার জন্য পাঁচটি প্রধান পশ্চিমা শক্তির উপর তাঁকে নির্ভর করতে হয়।

সংস্কারের স্পৃহা সৃষ্টি হয় এই উপলব্ধি থেকে যে, বাইরের দুর্বলতা মূলত অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলারই প্রতিফলন। উসমানিয়া কর্মকর্তারা, যাদের কেউ কেউ পশ্চিমা দেশে শিক্ষা লাভ করেছিলেন, পশ্চিমা দেশগুলোর সাফল্যের অন্যতম কারণ হিসেবে সে সব দেশের কার্যকর ও উন্নত অভ্যন্তরীণ প্রশাসনকেই কৃতিত্ব দেন। সে সময় স্পষ্টভাবে নিরূপিত দায়িত্ব, উন্নত রেকর্ড সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং পরিসংখ্যানিক তথ্য ব্যবহারের মাধ্যমে পশ্চিমা আমলাতন্ত্র সরকারের অসাধারণ ক্ষমতাশালী বাহনে পরিণত হচ্ছিল। অন্যদিকে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের এক সময়ের বিশ্বসেরা আমলাতন্ত্র ষোড়শ শতাব্দী থেকে কোন মৌলিক সংস্কার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই যায়নি; ফলে সাম্রাজ্যের আমলাতন্ত্র ছিল স্থবির।

www.pathagar.com

উসমানিয়া সাম্রাজ্যের সংস্কারকরা পশ্চিমা দেশগুলোর দিক থেকে সংস্কারের চাপের মধ্যেও ছিল।[১] সাম্রাজ্যের প্রয়োজন হতো ঋণ গ্রহণের; আর পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের অর্থই ছিল পশ্চিমা সরকার ও বাজারগুলোকে সাম্রাজ্যের আর্থিক দায়দায়িত্ব গ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদান করা। ঋণদাতা এবং কখনো কখনো মিত্র হিসেবে পশ্চিমা দেশগুলো (যেগুলো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিল) চাইত ইউরোপের রুগ্ন দেশটি যেন ঠিক মত কাজ করতে পারে। তবে বলা বাহুল্য, রুগ্ন দেশটি এমন শক্তিশালী হোক যা তাদের কারো প্রতি বড় ধরনের হুমকি হতে পারে- তেমনটি কেউ চায়নি।

খ্রিস্টিয় ১৮৩৯ থেকে ১৮৭৬ সন পর্যন্ত সময়ে উপরিউক্ত বিভিন্ন ধরনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা উসমানিয়া সাম্রাজ্যে একটির পর একটি সংস্কারমূলক কাজের জন্য চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। এ সব সংস্কারকে সামষ্টিকভাবে 'তানযিমাত' বলা হতো।[২] এ সব সংস্কারের মধ্যে ছিল সেনাবাহিনীতে সংস্কার, কর ব্যবস্থার কর্মপদ্ধতি বা মেকানিজমে পরিবর্তন সাধন ইত্যাদি। এগুলো ছিল সাম্রাজ্যটিকে পূর্বের হৃত শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামরিক অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য অর্জনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[৩] সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

---

১. রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের ভূমিকা সম্পর্কে দেখুন, রডেরিক এইচ ডেভিসন, *Essays in Ottoman and Turkish History, 1774-1923; The Impact of the West*, (অস্টিন : ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস প্রেস, ১৯৯০), পৃ. ৭৩-৯৫

২. তানযিমাত সম্পর্কিত লেখা প্রচুর। স্পষ্ট ভূমিকার জন্য দেখুন, এরিক জে. জুরচার (Erik J. Zurcher), *Turkey : A Modern History*, (আই. বি. টাওরিস, ১৯৯৪), পৃ. ৫২-৭৪

৩. আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করার মত এ সব সংস্কার আলেম বা ইসলামী পণ্ডিত শ্রেণীকে দুর্বল করার প্রক্রিয়াকে হয়ত সাহায্য করেছে। তাই নিকি কেডি বলেন, সে সব রাষ্ট্রে আলেমসমাজের ক্ষমতা কমে যায়, (যেমন মিসর ও উসমানিয়া সাম্রাজ্যে হয়েছিল), যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার আধুনিক সেনাবাহিনী এবং কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেদেরকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে শক্তিশালী করতে সক্ষম ছিল। দেখুন, নিকি কেডি (Nikki Keddie), 'The Roots of the Ulama's Power in Modern Iran', in Keddie (কেডি), *Scholars, Saints, and Sufis*, পৃ. ২১৩। চ্যাম্বারসও একইভাবে বলেন যে, 'পুরনো জানিসারি কোরের পরিবর্তে ১৮২৬ সনে আধুনিক সেনাবাহিনী গঠন ঐতিহ্যবাহী মৈত্রীর সুযোগ থেকে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের আলেমদেরকে বঞ্চিত করে।' দেখুন, রিচার্ড এল. চেম্বার্স, "The Ottoman Ulema and the Tanzimat," in Keddie (কেডি), *Scholars, Saints and Sufis*, পৃ. ৩৫. তথাপি এ বিষয়টি অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার

www.pathagar.com

হচ্ছে, তানযিমাতের সময়কালে বিচার বিভাগীয় সংস্কার সাধিত হয়, যার ফলাফল হয় ধারণাতীত সুদূরপ্রসারী। আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে এ সব সংস্কারকে আইনগত সংস্কার এবং শাসনতান্ত্রিক নবায়ন বা সংস্কার- এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগটি অর্থাৎ আইনগত সংস্কারের মধ্যে ছিল আইনকে সূত্রবদ্ধ করা বা কোডিফিকেশন, যার অর্থ ছিল শরীয়ার শাসন বা প্রভাবকে কমিয়ে আনা। অন্যদিকে দ্বিতীয় সংস্কারটি ছিল কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অর্থাৎ পূর্বে ছিল না এমন কিছু প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গ গড়ে তোলা এবং পূর্ব থেকে প্রচলিত শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে এ সব প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করে দেয়া।

আমি বলব, এই সব আইনগত এবং শাসনতান্ত্রিক সংস্কার আলেম সমাজকে একেবারে স্থানচ্যুত ও ধ্বংস করে দেয় এবং এ কাজ করতে গিয়ে এমন কোন প্রতিষ্ঠান বা সামাজিক শক্তি অবশিষ্ট রাখা হয়নি যা নির্বাহী শক্তির ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করবে, যেমনটি আলেমসমাজ এক সময় করছিলেন। এভাবে আলেমসমাজের স্থানচ্যুতির ফলাফল বিশ্বকেই বদলে দেয়। এটি সেক্যুলার সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। তবে একই সঙ্গে নির্বাহী শক্তির কর্তৃত্বের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণের সুযোগ তুলে দেয়ার ফলে স্বৈরতান্ত্রিক এবং চরম ক্ষমতা সম্পন্ন শাসনেরও পথ উন্মুক্ত হয়, যা অচিরেই মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে বিংশ শতাব্দীর প্রায় পুরো সময় জুড়ে সরকারের প্রধান চরিত্রে পরিণত হয়। এর ফলে শাসনকার্যে যে বিপর্যয় দেখা দেয়, আমি তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করে দেখাব, তা-ই শেষ পর্যন্ত পুনরায় ইসলামী সরকারে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষার প্রতি শক্তি জোগায়।

আইনি সংস্কার এবং আইনের সূত্রবদ্ধকরণে সমস্যা

ক্লাসিক্যাল সুন্নী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শরীয়া প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থার পাশাপাশি অবস্থান করেছে। অন্যদিকে প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থা, কর ব্যবস্থা এবং অপরাধ (ক্রিমিনাল) আইনের বহুবিধ বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেছে। উসমানিয়া সাম্রাজ্য এ ধরনের হাজার হাজার বিধি জারি করে। এগুলোকে 'কানুন' বলা

যে, আভিগদর লেভি দেখিয়েছেন, জানিসারির বিদ্রোহের কয়েক বছর পূর্বে আলেমসমাজ সর্বত্র জানিসারিকে বিলুপ্ত করে দেয়ার উদ্যোগকে সমর্থন দিয়েছিল। দেখুন, Avigdor Levy, The Ottoman Ulema and the Military Reforms of Sultan Mahmud II," in *The Ulama in Modern History : Studies in Memory of Prof. Uriel Heyd*, সম্পাদনা: গ্যাব্রিয়েল বায়ের (Gabriel Baer), (জেরুজালেম : ইসরাইল অরিয়েন্টাল সোসাইটি, এশিয়া এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, সংখ্যা-৭, ১৯৭১), পৃ. ২১-২৩

www.pathagar.com

হতো- এটি ল্যাটিন 'ক্যানন' থেকে উদ্ভূত, যা শব্দগত ভাবেই এ বিষয়ে ইঙ্গিত করে যে, এগুলোর উৎস শরীয়া বহির্ভূত।[৪] সে সব প্রশাসনিক বিধিবিধান উসমানিয়া সাম্রাজ্যের একেবারে প্রথম দিকের আইনি সংস্কারগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেগুলো অজস্র ভিন্ন ভিন্ন ঘোষণার মাধ্যমে জারি করা হয় এবং পরে সেগুলোকে একীভূত দলিলের একটি সীমিত সিরিজে গ্রন্থিত করে সূত্রবদ্ধ করা হয়।[৫] এ সমস্ত আইনি সূত্র বা কোড সম্পর্কে আলেমসমাজ খুব সামান্যই প্রতিবাদ বা আপত্তি করেছেন। তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়েছে তারা যেন শাসকের প্রশাসনিক বিধি জারি করার কর্তৃত্বের অধীনে চলে গিয়েছেন; অথচ এ ব্যাপারে বহু আগে থেকে আলেমসমাজ নিজেরাই সামঞ্জস্য বিধান করে আসছিলেন। এভাবে বাহ্যত প্রথম দিকের এ সব আইনি সূত্র বা কোড পূর্বের এ ধরনের প্রশাসনিক বিধি যেমনভাবে আলেম সমাজের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছে সেভাবে তাদের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেনি।

প্রাথমিক পর্যায়ের এ সমস্ত উসমানিয়া আইনি কোড বিষয়বস্তুর দিক থেকে ইউরোপীয় মডেল অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 'পেনাল কোড ১৮৫৮' ফরাসী ক্রিমিনাল (ফৌজদারী) কোড অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এ সব কোড ইউরোপীয় মডেলের অবয়ব অনুসরণ করেই করা হয়। একজন বিচারক বা আইন কর্মকর্তার মত ব্যক্তি; যে এ সব কোডের ব্যবহারকারী; তার কাছে যে কেস বা মামলা আসত সেগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য এই কোড ব্যাপকভিত্তিক আইনি বিধিমালা যোগান দিয়েছে। ইউরোপে আইনের সূত্রবদ্ধকরণ বা কোডিফিকেশনের পেছনে যে স্পৃহা কাজ করেছে তা মূলত এই আগ্রহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে যে, আইনি বিষয়ে যারা সিদ্ধান্তগ্রহণকারী (যেমন বিচারক বা আইন কর্মকর্তা) তাদেরকে ব্যাপকভিত্তিক এবং জটিল আইনের বিস্তারিত বিষয় জানার ঝামেলা থেকে অব্যাহতি দেয়ার মাধ্যমে বিচার প্রশাসনকে একটি নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। একইভাবে উসমানিয়া সাম্রাজ্যেও আইনের সূত্রবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া সাম্রাজ্যের সমস্ত বিধিবিধানকে একত্রে সন্নিবেশিত করে দেয় যেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সহজে এ

---

৪. উসমানিয়া কানুন, যাকে আমি প্রশাসনিক বিধিবিধান বলেছি। এ সম্পর্কে দেখুন, ইমবার, *The Ottoman Empire*, পৃ. ২৪৪-৫১

৫. উদাহরণ স্বরূপ ১৮৪০ সনের উসমানিয়া পেনাল কোড, যা ১৮৫৮ সনে হালনাগাদ ও পরিবর্ধিত করা হয়েছিল এবং একই বছরের ভূমি কোডের কথা বলা যায়; দেখুন, চ্যাম্বার্স, 'The Ottoman Ulema', পৃ. ৪৪

www.pathagar.com

বিষয়ে আলাপ ও পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। এর মাধ্যমে উক্ত কর্মকর্তা অনেকটাই একজন আধুনিক আমলার মত হয়ে যান এ অর্থে যে, তিনি পুরনো ঐতিহ্যবাহী বিচারকেরা যেরূপ বিভিন্ন আইনি কর্তৃপক্ষকে ব্যাখ্যা করে কাজ করতেন সে রকম না করে বরং একটিমাত্র উৎস থেকে বিধি লাভ করে সেটা প্রয়োগ করে কাজ করতে পারতেন। এ পরিস্থিতি সম্ভবত উসমানিয়া সাম্রাজ্যে আলেমসমাজের জন্য কোন হুমকি ছিল না; যেহেতু তারা ইতোমধ্যেই এটা মেনে নিয়েছে যে, বিচারকের পরিবর্তে অন্য ব্যক্তি প্রশাসনিক বিধি প্রয়োগ করতে পারবে। বস্তুত শুরুর দিকের উসমানিয়া কোড শরীয়ার আনুষ্ঠানিক বিধিবিধানের গণ্ডির বাইরের বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত ছিল, যেগুলো দৃশ্যত আলেমসমাজের জন্য সরাসরি কোন হুমকি সৃষ্টি করেনি।

তবে এ কথা পরবর্তী সময়ের গৃহীত বড় ধরনের নাটকীয় পদক্ষেপ অর্থাৎ পুরো উসমানিয়া আইনের ব্যাপকভিত্তিক সূত্রবদ্ধকরণ সম্পর্কে বলা সঙ্গত হবে না। যেমন শরীয়ার সিভিল বা দেওয়ানী আইন সম্পর্কিত ব্যাপকভিত্তিক কোডের কথা বলা যায়, যা 'মিসিল' (আরবীতে মাজাল্লা) হিসেবে পরিচিত ছিল। এটি ১৮৬৯ থেকে ১৮৭৬ সালের মধ্যে আলেম ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষ কমিটির মাধ্যমে প্রণীত হয়। মিসিল শরীয়ার ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করে। ঐতিহ্যগত এবং যৌক্তিক দিক থেকে দেখলে শরীয়া হচ্ছে আইনি কতগুলো মতবাদ, মূলনীতি, মূল্যবোধ ও মতামতের অসূত্রবদ্ধ একটি রূপ। সে যুগে শরীয়ার ব্যাখ্যা করা এবং আইনের প্রয়োজনগুলো পর্যালোচনা করা ইত্যাদি ছিল একান্তই আলেম সমাজের কাজের আওতাভুক্ত বিষয়। বস্তুত যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই আইন সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে বা এ বিষয়ে জোর দিয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারে না- এ বাস্তবতাই আলেমদেরকে আইনের রক্ষক এবং এর মূর্ত প্রকাশকে পরিণত করে। শুধু তাই নয়, মূলত তাদের জ্ঞান, তাদের বিচারিক পর্যালোচনা বা রায় এবং তাদের ব্যাখ্যা করার কৌশলই স্বয়ং আইন গঠন করেছে। এ অবস্থায় উপরিউক্ত ব্যাপকভিত্তিক কোড আইনের এ পুরো ব্যাপারটিকে কিছু সূত্রবদ্ধ বিধির দ্বারা বদলে দিতে চেয়েছে।

কোন বিচারককে যখন অনিয়তাকার বা নির্দিষ্ট আকারহীন আইনি বিষয়কে ব্যাখ্যা করে তার প্রয়োগ ঘটাতে হয় তখন তার যতটুকু নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োগ ঘটাতে হয়, আইনি কোডে বিদ্যমান কোন বিধি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে একজন বিচারককে সে তুলনায় নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োগ অনেক কম ঘটাতে হয়, যেমনটি সাধারণ আইনের ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি। বস্তুত এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, সূত্রবদ্ধ বিধির প্রয়োগ ঘটাতে গেলেও

www.pathagar.com

ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দেয় যার জন্য যথেষ্ট মাত্রায় বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগের দরকার হয়, যদিও আইনি ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীরা (আইনজ্ঞ বা বিচারকগণ) এ রকম কোন কিছুর প্রয়োজন নেই বলেই মনে করেন। যা হোক, আইনি সূত্র বা কোড প্রয়োগকারী একজন আইনি কর্মকর্তার দায়িত্বের সামাজিক অর্থ আইনের বিশাল জগতের ব্যাখ্যাকারী একজন বিচারকের দায়িত্বের সামাজিক অর্থ থেকে যথেষ্ট ভিন্ন। আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের কাছে কোন নির্দিষ্ট ঘটনায় বা মামলায় সূত্রবদ্ধ বিধি প্রয়োগকারী আইনি কর্মকর্তা সাধারণ বিধি প্রয়োগ করার নিছক একটি উপায় বা মাধ্যম মাত্র। তার বিধি প্রয়োগ করার প্রক্রিয়া যত বেশি স্বয়ংক্রিয় হয়, ব্যবস্থাটি তত বেশি ভাল এবং যথাযথ হয়। আইনি যন্ত্রের অংশ হিসেবে তার পরিচয় ও গুরুত্ব কমে যায়; কেননা যোগ্যতা সম্পন্ন যে কেউ এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে, হওয়া উচিত। আধুনিক আমলাতন্ত্রে আইনি যন্ত্রের অংশগুলো পরস্পরে পরিবর্তনযোগ্য অথবা একটি অংশ অন্যটির যতদূর সম্ভব কাছাকাছি হতে পারে।

তবে ব্যাপক আকারের আইনি মতবাদ ও মূলনীতি ব্যাখ্যাকারী একজন বিচারক তার সংজ্ঞা অনুযায়ীই আইনি প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আইনের সার-সংক্ষেপ করা আর কোন বিশেষ কেস বা ঘটনা- এ দুয়ের মাঝে সমন্বয়কারী শক্তি হিসেবে তিনিই আইনকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলেন। তিনি আইন তৈরি বা উদ্ভবের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত বিশেষায়িত জ্ঞানের মূল ব্যক্তি। এমনকি তিনি যদি এমন ভাবেন যে, আইন হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এবং তিনি হচ্ছেন কেবল তার আবিষ্কারক, তবু অন্তত এ আবিষ্কারটি একান্তই তার কিংবা যারা আইনের ব্যাখ্যাকারী এটি তাদেরই বিষয়, যারা এই আবিষ্কারের বৈধতা দান করে।

যা হোক, পুরো আইনি ব্যবস্থাকে সূত্রবদ্ধ করার ফলে শরীয়ার ব্যাপকভিত্তিক পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ শরীয়া আলেমদের মানবিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিকশিত মতবাদ ও মূলনীতির সমষ্টি থেকে পরিবর্তিত হয়ে কোডে সমন্বিত একগুচ্ছ বিধিতে রূপান্তরিত হয়। এই পরিবর্তন আইনের রক্ষক হিসেবে আলেমদের ভূমিকার সামাজিক অর্থেও একইভাবে পরিবর্তন ঘটায়। ক্লাসিক্যাল যুগে মুসলিম বিশ্বে কোন ব্যক্তি যদি প্রশ্ন করত 'আইন কোথায়?' তবে এর উত্তরে শুধু আলেমদের দিকে ইঙ্গিত করে 'শরীয়া তাদের সঙ্গে আছে' এ কথা বলার মাধ্যমেই দেয়া যেত। মিসিলের পর এ প্রশ্নের উত্তর আইনের সূত্র বা কোড প্রয়োগের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি নয় বরং খোদ কোডের প্রতি ইঙ্গিত করেই দেয়া যেত বা দেয়া যায়। কাজেই আইনকে সূত্রবদ্ধ করা বা

www.pathagar.com

কোডিফিকেশন আইনের রক্ষক হিসেবে আলেমদের ভূমিকার কার্যত মৃত্যু ঘটায়। কোডিফিকেশন বা আইনের সূত্রবদ্ধকরণের আকাঙ্ক্ষা আলেমদের ঐতিহ্যবাহী প্রয়োজনকে নিঃশেষ করে দেয়। আইনের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে তাদের চূড়ান্ত কথা বলার অধিকারের যে দাবি তাদের ছিল কোডিফিকেশন সেটি নস্যাৎ করে দেয়।

সমস্যার কারণ শুধু এটা ছিল না যে, সূত্রবদ্ধ বিধি প্রয়োগকারীর ভূমিকা এবং আইনের ব্যাখ্যাকারীর ভূমিকা ছিল একেবারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। সমস্যার আরো কারণ ছিল। আইনের সূত্রবদ্ধকরণ বা কোডিফিকেশন আলেম সমাজকে তার ভূমিকা পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। এটা ছিল আরেকটি কারণ। কেননা আইনের উপর আলেমদের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব করার সুযোগ আইন প্রণয়ন প্রতিষ্ঠান আইনসভা যখন দখল করে নিল, চূড়ান্ত আইনগত কর্তৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুটিকেও তখন আলেমদের থেকে সরিয়ে নিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী যা আলেমদের মত একটি দৃশ্যত স্বাধীন শ্রেণীর হাতে ছিল সেটা এখন রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের মধ্যে চলে গেল।

ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতন্ত্রের অধীনে প্রশাসনিক বিধি জারির প্রকৃতি এমন ছিল যে, শরীয়াই শাসককে এ সমস্ত বিধি জারির কর্তৃত্ব প্রদান করেছিল। এভাবে দেখা যাচ্ছে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব শরীয়ার হাতেই দেয়া ছিল। তত্ত্বগতভাবে বললে বলা যায়, এ সমস্ত প্রশাসনিক বিধির আইনের সমান শক্তি ছিল, কেননা শরীয়াই সেগুলোর সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু মিসিল জারি করে শরীয়ার বিষয়বস্তুকে রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিয়ে নির্বাহী কর্তৃপক্ষ মূলত এই ইঙ্গিত দেয় যে, শাসক ও তার রাষ্ট্র দ্বারা জারিকৃত আইনি দলিলে শরীয়ার যতটুকু সংযুক্ত করা হয়েছিল কেবল ততটুকু পর্যন্ত শরীয়ার নিজের কর্তৃত্ব ছিল; এ আইনে শরীয়ার এর চেয়ে বেশি কর্তৃত্ব ছিল না। এভাবে দেখা যাচ্ছে এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক উলট-পালট (Historic reversal), যদিও এর ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে লক্ষণীয় ছিল না। এর মাধ্যমে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব আইনের কাছে নয়, বরং শাসকের হাতে তুলে দেয়া হয়।

মিসিল জারি করার সময় আইন সূত্রবদ্ধ করার বর্ণিত এ অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যটি আলেমদের কাছে যদি স্পষ্ট থাকত তাহলে একথা সহজেই বলা যায় যে, এ ব্যাপারে তাদের দিক থেকে যতটুকু আপত্তি উঠেছিল তার চেয়ে আরো জোরালো আপত্তি উঠত। এ আপত্তি দু'ধরনের হতে পারত। আলেমসমাজ এই যুক্তি পেশ করতে পারতেন যে, খোদ সূত্রবদ্ধ করার কাজটিই অনুমোদনের অযোগ্য; কেননা আইনের বিষয়বস্তু কী হবে তা ঘোষণা করার কর্তৃত্ব কেবল

www.pathagar.com

তাদেরই রয়েছে। অথবা তারা অধিকতর ধর্মতাত্ত্বিক দিক থেকে যুক্তি দেখাতে পারতেন যে, রাষ্ট্র যখন আইনকে সূত্রবদ্ধ বা কোডে পরিণত করল সকল আইনের উৎস হিসেবে সৃষ্টিকর্তার ভূমিকাই রাষ্ট্র দখল করে নিল। এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে আইনের সূত্রবদ্ধকরণ একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। বস্তুত শরীয়ার আওতাভুক্ত বিষয়ে বিধি জারি করাকে ধর্মবিরোধী বলে বিবেচনা করা যেত, যেমনটি পরবর্তী সময়ের ইসলামপন্থীরা কোন কোন সময় বলেছেন। উপরিউক্ত দু' ধরনের আপত্তির মধ্যে যে কোন আপত্তি যদি আলেমসমাজ উত্থাপন করতেন বা আপত্তির মর্ম উপলব্ধি করতে পারতেন, তাহলে তারা হয়ত লক্ষ্য করতেন যে, আইন সূত্রবদ্ধ করার মাধ্যমে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাদের নিজেদের অবস্থানকে মারাত্মক সংকটে ফেলা হচ্ছে।

কিন্তু মিসিল ঘোষণার সময় উসমানিয়া সাম্রাজ্যে যে সব আলেম সক্রিয় ছিলেন তারা কেউ দৃশ্যত এ ধরনের কোন আপত্তি করেননি; অন্তত তারা জোরালোভাবে কোন আপত্তি করেননি। তৎকালীন গ্রান্ড মুফতী কেবল বিচার মন্ত্রণালয়ের বাইরে তাঁর দফতরে কোডগুলোর খসড়া করার ব্যাপারে সফল হন। তবে দৃশ্যত তিনি সূত্রবদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে উৎসুক ছিলেন, একে পুরোপুরি বাধা দেয়ার ব্যাপারে নয়; যেহেতু মিসিলের ষোলটি খণ্ডের মধ্যে একটি খণ্ড তাঁর তত্ত্বাবধানেই প্রণীত হয়; (তবে যখন বিচার মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ কাজ আবার ফিরিয়ে আনা হয় তখন একটি খণ্ড বাতিল করে দেয়া হয়)।[৬] আইন সূত্রবদ্ধ করার প্রক্রিয়া গতি হারায় যখন শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের গতিধারা কমে যায়। তবে ততদিনে ক্ষতি যা হবার তা হয়ে যায়।

আলেমসমাজের পক্ষ থেকে আইন সূত্রবদ্ধ করার বিরুদ্ধে আরো জোরালো ও সর্বাত্মক বিরোধিতা না করার কারণ কী? সত্যি বলতে কি এ বিষয়ে এক শতাব্দী পেছন থেকে উসমানিয়া আলেমসমাজের অনেকটা সম্মতিদান দৃশ্যত সত্যিই দুর্বোধ্য। তাদের নাকের ডগায়ই যুগান্তকারী পরিবর্তন হচ্ছিল এবং আলেমসমাজের এ পরিবর্তনের ব্যাপারে সতর্ক থাকার যথাযথ কারণ ছিল অর্থাৎ তাদের প্রাতিষ্ঠানিক স্ব-স্বার্থ এবং ধর্মীয় বিশ্বাস- এই দুটো কারণেই এ ব্যাপারে তাদের সতর্ক থাকার কথা। কিন্তু দৃশ্যত তারা ততটুকু সতর্ক থাকেননি, বরং এ ব্যাপারে তাদের আপাত মৌন সম্মতিই দেখা গেছে।

---

৬. চ্যাম্বার্স, *'The Ottoman Ulema'*, পৃ. ৪৪-৪৫

www.pathagar.com

এ সময় সম্পর্কে যারা বিশেষজ্ঞ তারা এ প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট এবং সরাসরি উত্তর না দিয়ে এ বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেছেন।[৭] সেটা হচ্ছে এ রকম: যে কোন ঘটনা ব্যাখ্যায় ঐতিহাসিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হচ্ছে ঐ ঘটনার সময় কোন পক্ষ বা দলের কোন প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে নিশ্চেষ্ট বসে থাকার কারণ ব্যাখ্যা করা। সাধারণত মানুষ কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ কেন করেছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য কিছু চিহ্ন বা নিদর্শন রেখে যায়। কিন্তু বিপরীতক্রম কোন একটি কাজ, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই প্রতিয়মান হয়, মানুষ কেন অবহেলা করেছে বা কাজটি করেনি তা ব্যাখ্যা করার জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ রাখাটা খুবই বিরল ঘটনা। যা হোক, এ বাস্তবতা সত্ত্বেও মিসিলের মাধ্যমে সমগ্র উসমানিয়া সাম্রাজ্যে নাটকীয় পরিবর্তনের মুখে সে দেশের আলেম সমাজের নিশ্চুপ থাকার কারণ আংশিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

মিসিলের মাধ্যমে নাটকীয় পরিবর্তনের মুখে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের আলেমসমাজের নিশ্চুপ থাকার একটি কারণ হচ্ছে, গ্রান্ড মুফতীর বাছাইকৃত কিছু আলেমকে খসড়া কমিশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যে কমিশন কোডের খসড়া তৈরি করে এবং এর বিধিগুলোতে ইসলামী আইনি মতবাদের প্রতিফলন ঘটায়। কমিশনের চেয়ারম্যানসহ এর কোন কোন সদস্য ক্লাসিক্যাল ইসলামী আইন এবং আধুনিক পশ্চিমা প্রভাবিত আইন সম্পর্কে লেখাপড়া ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিমা প্রভাবিত আইন সম্পর্কে ইতোমধ্যেই ইসতাম্বুল ইউনিভার্সিটিতেই শিক্ষা দেয়া হতো।[৮] কমিশনে আলেমদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়

---

৭ দেখুন, ইউরিল হেইড, (Uriel Heyd), 'The Ottoman Ulema and Westernization in the Time of Selim III and Mahmud II' in *Studies in Islamic History and Civilization* (জেরুজালেম : ১৯৬১), পৃ. ৯৬। ('নেতৃস্থানীয় আলেমরা যথেষ্ট দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না। পশ্চিমাকরণ করে যে সংস্কার হচ্ছিল, যাতে তারা সমর্থন দিয়েছেন, তা পরিণতিতে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের ইসলামী চরিত্র নষ্ট করে ফেলবে - সেটা তারা বুঝতে পারেননি।') প্রশ্ন হচ্ছে কেন বুঝতে পারেননি? এর উত্তে হেইড (Heyd) তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে বলেছেন, আলেমসমাজের উপর স্তর ছিল বিশেষভাবে রাষ্ট্র কেন্দ্রিক।

৮ আহমাদ কাবদাত পাশা সম্পর্কে দেখুন, চ্যাম্বার্স, *'The Ottoman Ulema'*, পৃ. ৪৩-৪৪, এবং রিচার্ড এল. চ্যাম্বার্স (Richard L. Chambers), 'The Education of a Nineteenth Century Ottoman Alim, Ahmad Cevdet Pasha', *International Journal of Middle East Studies,* ভলিয়ুম-৪, সংখ্যা-৪ (অক্টোবর ১৯৭৩), পৃ. ৪৪০-৬৪। চ্যাম্বার্স যেভাবে পুনঃবর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, 'আহমদ কাবদাত পাশা গ্রান্ড মুফতী হতে আগ্রহী এমন গুজবের প্রেক্ষিতে খ্রিস্টিয় ১৮৬৬ সনে তাঁকে আলেম শ্রেণী থেকে সাধারণ আমলার পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে সরে যেতে বাধ্য করা হয়।'

www.pathagar.com

আলেমসমাজের প্রতি এ ইঙ্গিত দেয়ার জন্য যে, নতুন উদ্যোগ তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে আমলে নিবে এবং যথাযথভাবে কাজে লাগাবে; তাকে বাদ দিবে না; যেহেতু উপরিউক্ত কোড উসমানিয়া সাম্রাজ্যের মত একটি স্বাধীন সাম্রাজ্যে প্রণয়ন ও প্রয়োগ ঘটানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বলা বাহুল্য, সে সময় উসমানিয়া সাম্রাজ্য কোন উপনিবেশ ছিল না। কাজেই সে দেশে যে আইনি কোড প্রণয়ন ও প্রয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয় সেটা কোন ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে গৃহীত উদ্যোগের মত ছিল না। উপরন্তু মিসিলের যখন খসড়া করা হয় তখন এর বিষয়বস্তু শরীয়ার আইনি বিধিগুলোকেই প্রতিফলিত করে; কোন পশ্চিমা আইনি আদর্শকে সেখানে আমদানী করা হয়নি যা আলেমদের ক্ষোভকে উস্কে দিতে পারত বলে ধারণা করা যায়। সে সময় উসমানিয়া সাম্রাজ্যের সংস্কারের বাস্তবিক প্রয়োজন ছিল; কিন্তু মনে রাখতে হবে এটি ছিল একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং বিশ্বের অন্যতম সামরিক শক্তি। এর আইনি কোডের সংশ্লিষ্ট অংশটুকু এর নিজস্ব ইসলামী ঐতিহ্যকে বাহ্যিক অবয়বে না হলেও অন্তত বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে নিজের মধ্যে ধারণ করেই তৈরি করা হয়।

যেন আলেমদের কেন্দ্রীয় ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করতেই হানাফী মাযহাবের অধীন বিধিবিধানকে আইনি কোডের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হানাফী মাযহাব সাম্রাজ্যের সরকারি আলেমদের পছন্দের মাযহাব ছিল। উসমানিয়া সাম্রাজ্যে বহু আগে থেকেই হানাফী মাযহাবের বিস্তার সে দেশের আলেমদের সাফল্যের অন্যতম নির্দেশক ছিল। আইনি কোডে আলেমদের পছন্দনীয় মাযহাবের বিধিগুলোকে গ্রহণ করাটা নিঃসন্দেহে ইসলামী আইনের জগতে আলেমদের অসাধারণ মর্যাদা বা অবস্থানের একটি প্রমাণ। যা হোক, সূত্রবদ্ধ আইন বা কোডিফিকেশনের অন্যতম অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল, এটি কোন একটি বিষয়ে একাধিক আইনি দৃষ্টিভঙ্গি বা মতামতকে (যেমনটি বিভিন্ন বিষয়ে ইমামগণ প্রকাশ করেছেন) একসঙ্গে সহজে ধারণ করত না; এখানে এক বিষয়ে একটি মতামতই সন্নিবেশিত করা হয়।

ঐতিহ্যগতভাবে বিভিন্ন মাযহাব বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত দিতে পারত এবং দিয়েছেও; আবার সকল মতামতই যথার্থ এবং কার্যকর; অন্তত নিজ নিজ মাযহাবের অনুসারীদের কাছে। যদিও কোড বিভিন্ন মাযহাব থেকে একটিকে বেছে নিতে বাধ্য করে এবং যখন একটিকে সুনির্দিষ্টভাবে বাছাই করে নেয়া হয় তখন তা অন্যান্য মাযহাবের উপর আনুষ্ঠানিক সরকারি মাযহাব হবার কারণে বিশেষ সুবিধা লাভ করে। পরবর্তী সময়ে যদিও উসমানিয়া সাম্রাজ্যের আইনি

www.pathagar.com

কোড বিভিন্ন মাযহাবের সবচেয়ে ভাল অংশটুকু আত্মস্থ করার উদ্যোগ নেয়, কিন্তু মিসিলে তা করা হয়নি।[৯] অতএব মিসিলে প্রকাশ্যভাবে হানাফী মাযহাবকে বেছে নেয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে সরকারি আলেমদের সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সাধারণ আলেমদের ক্ষতি হয়ত পুষিয়ে দিয়ে থাকবে।

রাষ্ট্রের জারি করা এবং রাষ্ট্র সমর্থিত আইনি কোড আইনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আলেমদের ভূমিকা দখল করে নেয়, এমনকি আইনের উৎস হিসেবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অবস্থানকেও হয়ত বেদখল করে ফেলেছে বা বেদখল করে ফেলবে- সম্ভাব্য এই উদ্বেগ বা আপত্তি এই বাস্তবতা দ্বারা হয়ত প্রশমিত হয়েছে যে, মিসিল যেভাবে প্রণীত হয়েছে তাতে তা আইনের একমাত্র উৎস ছিল না, সর্বাবস্থায় আদালত কর্তৃক যার প্রয়োগ ঘটাতেই হবে।[১০] সে কারণেই বিচারক ও মুফতী অর্থাৎ সরকারি আলেম (আইনি কোড প্রয়োগ করা যাদের দায়িত্ব ছিল) নীতিগতভাবে আইনের অন্যান্য উৎস ব্যবহার করতে পারতেন, যা মিসিলে অন্তর্ভুক্ত ছিল না কিন্তু ঐতিহ্যগতভাবে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যার অংশ ছিল। সত্যি বলতে কি আইনি কোড তত্ত্বগতভাবে পরিপূর্ণ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না এবং সে হিসেবে এটা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা জারিকৃত নিখুঁত একগুচ্ছ আইন ছিল না; বরং এটা ছিল বিচারকদের জন্য এক ধরনের উপায় বা মাধ্যম, যা কয়েক প্রজন্মের বিচারিক রায় থেকে কার্যকরভাবে সংগৃহীত বিধিমালা দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল, যে বিধিমালার যথার্থতা খোদ শরীয়ার অংশ হিসেবে বিধিমালার মূল উৎস অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস দ্বারা যাচাই করা ছিল। ইসলামী আইনের মূলনীতি বিষয়ক পরিচিত গ্রন্থাদি পূর্ব থেকেই ছিল, যেগুলোতে সক্রিয় বিচারকদের জন্য পূর্বতন বিচারিক রায় বা রুলিংগুলো সন্নিবেশিত ছিল। সে যুগের একজন পণ্ডিত তাই মন্তব্য করেছেন, "মিসিলকে হয়ত সে সব গ্রন্থের অন্যতম বলে মনে করা যায় যা ছিল নতুন মোড়কে পুরনো জিনিস; তবে এ ক্ষেত্রে পার্থক্য হচ্ছে মিসিলের পেছনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল, যা পূর্বের আইনি গ্রন্থগুলোর ক্ষেত্রে ছিল না।"[১১]

---

৯. এ বিষয়ে দেখুন, হালাক (Hallaq), *A History of Islamic Legal Theories*, পৃ. ২১০

১০. ভিকর, *Between God and the Sultan*, পৃ. ২৩১

১১. প্রাগুক্ত; উসমানীয় সংস্কারের অংশ হিসেবে আইনের সূত্রবদ্ধকরণ বা কোডিফিকেশন সম্পর্কে দেখুন, সামি যুবাইদা, *Law and Power in the Islamic World*, (লন্ডন : আই. বি. তাউরিস, ২০০৩), পৃ. ১২১-৫৩

www.pathagar.com

তবে উপরে যেমনটি বলা হল যে, মিসিলের সাথে রাষ্ট্রের একটি সম্পর্ক ছিল এবং এই ব্যাপারটি কোন সামান্য বিষয় ছিল না। এমনকি আমরা যদি এটা মেনেও নেই যে, মিসিল নতুন কোন আইন তৈরি করেনি, এটা শরীয়ার বিধিগুলোকেই নিশ্চিত করেছে এবং শরীয়ার বিধিগুলোই সংগ্রহ করে সূত্রবদ্ধ করেছে, তবু আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে কেন আলেম সমাজ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা আইনি সূত্র বা কোড জারি করাকে যতটুকু তারা বাস্তবে সমস্যাজনক বলে মনে করেছেন তার চেয়ে বেশি সমস্যাজনক বলে ধরতে পারলেন না। এর উত্তরের মূল সম্ভবত নিহিত আছে এখানে যে, আলেমসমাজ উসমানিয়া সাম্রাজ্যের আমলাতান্ত্রিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সাথে ইতোমধ্যেই গভীরভাবে সংযুক্ত ছিল। উসমানিয়া বা অটোমানদের পূর্বে তারা রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনযন্ত্র থেকে যথেষ্ট মাত্রায় স্বাধীন ও মুক্ত ছিল। অটোমানদের পূর্বে কিছু আলেম বিচারক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন সত্য কিন্তু যা তাদেরকে 'আলেম' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেটা ছিলেন। মূলত আলেমসমাজের নিজেদের এ ব্যাপারে ঐকমত্য এবং স্বীকৃতি। তা ছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, সেটা হচ্ছে আইনের বিষয়বস্তু ঘোষণা করার মৌলিক প্রক্রিয়াটি প্রধানত সরকারি দায়িত্বের বাইরের আলেমদের দ্বারা নিষ্পন্ন হতো এবং সেটা তাদের রচিত ও ঘোষিত গবেষণামূলক গ্রন্থ এবং ফতওয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হতো।

যেমনটি আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি, উসমানিয়া কর্তৃপক্ষ একজন গ্রান্ড মুফতীর কর্তৃত্বের অধীনে সরকারি মুফতী পদ সৃষ্টি করে আলেম শ্রেণী এবং রাষ্ট্রের মধ্যে এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক পৃথকীকরণ বা বিভাজন সৃষ্টি করে। তথাপি তিন শতাব্দীরও বেশি সময়কাল ধরে এ সকল সরকারি আলেম তাদের কিছুটা স্বাধীনতা ধরে রাখতে সক্ষম হন।[১২] তারপরও এ ব্যাপারটি লক্ষণীয় ছিল যে, রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সমন্বয়কৃত আলেমসমাজ তাদের নিজেদেরকে সংস্কার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেখতেই পছন্দ করতেন; সংস্কারের সম্ভাব্য শিকার হতে অর্থাৎ সংস্কারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যদিও অটোমান আলেমদের দৃষ্টিতে সে দেশের আইন আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন ছিল এবং তারা অন্তত তত্ত্বগতভাবে আইনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে তাদের বিশেষ অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু এ সব আলেমকে রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে

---

১২. আলেমদের প্রশাসনিক যন্ত্র ছিল স্বাধীন, 'এর প্রধানকে বরখাস্ত করতে হলে সুলতানের অনুমোদন প্রয়োজন হতো- শুধু এটুকু বিষয় জরুরী ছিল।' এবং ওয়াকফ রাজস্বের নিয়ন্ত্রণ আলেমদের প্রশাসনযন্ত্রকে 'একই ভাবে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাধীন করে দিয়েছিল।' চ্যাম্বার্স, *The Ottoman Ulema*, পৃ. ৩৫

www.pathagar.com

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংযুক্তকরণ করার বিষয়টিই এ ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে যে, কেন আলেমসমাজ আইনের সূত্রবদ্ধকরণ বা কোডিফিকেশন তাদের জন্য যে বিপর্যয়কর পরিণতি ডেকে আনবে সে সম্পর্কে ধারণা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যদি আলেমসমাজ নিজেদেরকে রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হিসেবে বিবেচনা করতেন বা যদি তারা তাদের পূর্বসূরীদের মত সরকারি পদ বা চাকুরীর ব্যাপারে সন্দেহবাদিতা ধরে রাখতেন- তাহলে হয়ত তারা সহায়তা না করে বরং আইন সূত্রবদ্ধকরণ প্রকল্পকে যথাযথভাবে বাধা দেয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাদের অবস্থানে পরিবর্তন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে কয়েক শতাব্দী পূর্বেই এবং এ সময়ের মধ্যে যখন সূত্রবদ্ধকরণ বা কোডিফিকেশন ঘটতে শুরু করে তখন আলেমসমাজকে কিসে আঘাত করতে আসছে তা তারা অনুধাবনই করতে পারেননি।

শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন : আলেমদের পরিবর্তে নতুন শ্রেণী

আধুনিক অর্থে আইনের সূত্রবদ্ধ করা হলেও সেটা বিচারকের প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করে দেয় না। অবশ্যই কাউকে না কাউকে সূত্রবদ্ধ আইন বা কোড প্রয়োগ করার দায়িত্ব পালন করতে হয়; এমন কি কখনো কখনো যদি এই দায়িত্বকে আমলাতান্ত্রিক বলেও মনে করা হয়, তবু অধিকাংশ পশ্চিমা আইনি ব্যবস্থা বিচারক পদাধিকারী আমলাদের আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণের উপর সব সময় জোর দিয়েছে।[১৩] কাজেই যে আলেমদেরকে বিচারক শ্রেণীতে পরিণত করা যেত তাদেরকে আইনের সূত্রবদ্ধকরণ চরমভাবে ধ্বংস করেনি।

আলেম বিচারকদের আল্লাহর আইন খুঁজে বের করার তথা আবিষ্কার করার বিশেষ দায়িত্ব আর অক্ষুণ্ন থাকেনি। তবে কোডের ধারাগুলো প্রয়োগ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আলেম-বিচারকসমাজ তাদের হারানো মর্যাদা কিছুটা হয়ত ধরে রাখতে পারতেন। কিন্তু বাস্তবে আলেমসমাজ অন্তত সুন্নী মুসলিম বিশ্বে এই ভূমিকাটুকুও ধরে রাখতে পারেননি। পরিণতিতে আধুনিক আইনে, (যাকে পাশ্চাত্যকরণকৃত আইন বলা যায়) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিচারকদের নতুন এক শ্রেণীর হাতে বিচারিক কাজগুলো চলে যায়। তবে

---

১৩. বিপরীতক্রমে বহুদিন ধরে চীন তার সেনা কর্মকর্তাদেরকে কোনরূপ আইনি প্রশিক্ষণ ছাড়াই পল্লী এলাকায় বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। এ প্রক্রিয়াটি কেবল অতি সম্প্রতি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। রাজকীয় চীনের শেষ আমলে কনফুসিয়ান পণ্ডিত-প্রশাসক-বিচারক শ্রেণীর পতন এবং উসমানিয় আলেম শ্রেণীর পতনের মাঝে সামঞ্জস্য সন্ধান করা হয়ত অর্থপূর্ণ হবে।

www.pathagar.com

আলেমসমাজের যেমন রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে স্বাধীন থাকার পুরনো একটি ঐতিহ্য ছিল নতুন এই বিচারক শ্রেণীর এরূপ কোন অতীত ছিল না; তারা শুরু থেকেই রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল ভিন্ন। তাদের মতে আইন সৃষ্টিকর্তা থেকে নয়, বরং সরকারের কাছ থেকে সৃষ্টি হয় এবং আমরা যেমনটি দেখব যে, এই দৃষ্টিভঙ্গি অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের অঙ্গগুলোকে (যেমন, আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ইত্যাদি) আইনের অধীন হিসেবে বিবেচনা করতে অনীহা প্রকাশ করে। সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে আলেমসমাজ কেবল পারিবারিক আইনের উপর (যেটা রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে নয় বরং ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত) এখতিয়ার ধরে রাখতে সক্ষম হয়।

প্রশ্ন হল এটা কিভাবে ঘটল? ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের আইনি বৈধতাদানের ক্ষেত্রে যাদের কেন্দ্রীয় ভূমিকা ছিল সেই আলেমসমাজ কিভাবে নিছক পারিবারিক আদালতের প্রধান হিসেবে নিম্ন অবস্থানে নেমে আসলেন? যদিও এর উত্তর নিশ্চিতভাবে আইন সূত্রবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া দিয়েই শুরু হবে, তবে তানযিমাতের সময় শাসনতান্ত্রিক মৌলিক সংস্কারের বিষয়টিকে সমানভাবে বিবেচনায় না রাখলে এ উত্তর সম্পূর্ণ হবে না। শুধু তাই নয় এ বিষয়টিকে বিবেচনায় না রাখলে মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ সেক্যুলার রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোও আমরা ব্যাখ্যা করতে পারব না; এসব রাষ্ট্র ইসলামপন্থী ছাড়া কোন টেকসই রাজনৈতিক শক্তির কোন রকম বিরোধিতা ছাড়াই প্রায়ই স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করেছে এবং তা অব্যাহত রেখেছে।

অটোমান সংস্কারের আওতায় প্রধান প্রধান সকল শাসনতান্ত্রিক ঘোষণা সুলতানের ফরমানের মাধ্যমে এসেছে। এ ফরমানগুলো পরিবর্তন কার্যকর করতে অথবা জনগণকে অনুগ্রহ হিসেবে কিছু অধিকার দিতে জারি করা হয়। খ্রিস্টিয় ১৮৩৯ এবং ১৮৫৬ সালের দু'টি রাজকীয় ডিক্রি এ ধরনের আচরণের বড় উদাহরণ। ইউরোপীয় রাজধানীগুলো গ্রহণ করে কি না সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে জ্যেষ্ঠ আমলারা এ ডিক্রি দু'টি প্রস্তুত করেন। দু'টি ডিক্রিই শাসনতান্ত্রিক এই ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ঘটায় যে, সুলতান তাঁর নিজের ইচ্ছায় কাজ করেছেন, তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোন কিছুর ইচ্ছায় নয়। যতদূর পর্যন্ত এ সব ডিক্রি শরীয়ার কোন মূলনীতিকে লঙ্ঘন করেনি ততদূর পর্যন্ত ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতান্ত্রিক তত্ত্ব এ ধরনের বিধিবদ্ধ আইনকে বৈধতা দিয়েছে। সুলতানের জারি করা অন্যান্য প্রশাসনিক বিধি থেকে এগুলো বাহ্যিক দিক দিয়ে ভিন্ন ছিল না, বরং একই ধরনের ছিল।

www.pathagar.com

এই ডিক্রিগুলো নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে। তবে শাসনতান্ত্রিক পরিভাষায় এগুলোর অবস্থানকে চিহ্নিত ও লিপিবদ্ধ করা কঠিন। খ্রিস্টিয় ১৮৩৯-এর দলিল প্রণয়নের পর 'বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সর্বোচ্চ পরিষদ' সৃষ্টি করা হয়। বিচার বিভাগীয় এই পরিষদটি একদিকে আপিল আদালত হিসেবে কাজ করেছে এবং একই সঙ্গে নতুন আইনের খসড়া করেছে। পরিষদের সদস্যরা অনির্বাচিত ছিল, তবে তারা তাদের অধিকাংশের ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। সুলতান পূর্বেই এ সব সিদ্ধান্ত মেনে চলার ব্যাপারে একমত হন। এভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সত্যিকারের কর্তৃত্ব প্রদান করে তিনি পরিষদটি গঠন করেন। পরিণতিতে বিভিন্নভাবে ক্ষমতা বণ্টনের মাধ্যমে বহুবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৮৬৭ সনে উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠানটি ভেঙ্গে গিয়ে দু'টি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটে- একটি আইনসভা অন্যটি জুডিশিয়াল-অ্যাপিল্যাট।

বিষয়টিকে এভাবে দেখা যেতে পারে যে, যখন বিভিন্ন উসমানীয় আইনি কোড জারির পাশাপাশি নতুন প্রতিষ্ঠানগুলোকে কর্তৃত্ব দেয়া হয় তখন এসব নতুন প্রতিষ্ঠান আইনের বিষয়বস্তু ঘোষণার ব্যাপারে আলেমদের ঐতিহাসিক ভূমিকা থেকে তাদেরকে স্থানচ্যুত করার ক্ষেত্রে অনেক দূর অগ্রসরও হয়। খ্রিস্টিয় ১৮৭৬ সনের শাসনতন্ত্র এ ক্ষেত্রে আরো বেশি এগিয়ে যায়।[১৪] এটি আইন প্রণয়নের দায়িত্ব দিয়ে দু'টি নির্বাচিত আইনসভা সৃষ্টি করে- একটি নিম্নকক্ষ, অপরটি সিনেট বা উচ্চকক্ষ। বিচারকদের স্টাফ হিসেবে নিয়োগ দিয়ে আদালতকে আলাদাভাবে কর্তৃত্ব দেয়া হয়। এতে বিচারকদের যোগ্যতা আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়। অনেকটা এখনকার যুগের সার্কুলার বা পরিপত্র জারি করে একটি ধারা ঘোষণা করা হয়। যেখানে বলা হয়, শরীয়ার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর বিচার করা হবে শরীয়া ট্রাইবুনালের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, এই দলিলে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী আদালতের কথা এই একবারই মাত্র উল্লেখ করা হয়।[১৫] একই ধারা সিভিল বা দেওয়ানী বিষয়গুলোকে দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি করার বিষয়টিও ঠিক করে দেয়।

---

১৪. এ বিষয়ে একটি আকর্ষণীয় বর্ণনা পেতে দেখুন, নাথান ব্রাউন (Nathan Brown), *Constitution in a Nonconstitutional World : Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable Government*, (আলবানি (Albany) : সানি প্রেস, ২০০২), পৃ. ২০-২৬

১৫. উসমানীয় শাসনতন্ত্র, আর্টিক্যাল-৮৭ (১৮৭৬)

www.pathagar.com

আলেমসমাজ বা তাদের আদালতগুলো শরীয়া রক্ষাকারীর যে ভূমিকা পালন করত সেটা এই নতুন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ন্যূনতম অর্থেই কেবল সংরক্ষিত হয়; সেটা এ অর্থে যে, শরীয়ার উপর শরীয়া আদালতগুলোর এখতিয়ার (জুরিস্‌ডিকশন) এতে অক্ষুণ্ন রাখা হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে শরীয়াই হচ্ছে সর্বোচ্চ বিষয় যা সমগ্র শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যথার্থতা নিরূপণ করে বা একে আইনত বৈধতা দেয়- এই ধারণা এই নতুন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনুপস্থিত ছিল। তবে ১৮৭৬ সনের উসমানীয় শাসনতন্ত্র ছিল মুসলিম বিশ্বের কোথাও ঘোষিত প্রথম আনুষ্ঠানিক শাসনতান্ত্রিক দলিল।[১৬] কাজেই এ কথা বলা অতিরঞ্জন হবে না যে, মুসলিম বিশ্বে লিখিত শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আগমন ছিল মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের অবলুপ্তির সূচনা।

শাসনতন্ত্রটি ছিল সীমিত অর্থে ইসলামী; কেননা এটি সুলতানকে সর্বোচ্চ মর্যাদার খলীফা ঘোষণা করে এবং সে ক্ষমতা বলে তিনি ছিলেন মুসলিমদের ধর্মের রক্ষাকারী বা হেফাজতকারী।[১৭] এটি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম বলে ঘোষণা করে এবং পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুর জন্য স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের নিশ্চয়তা এবং আরো কিছু বাড়তি সুবিধা প্রদান করে।[১৮] কিন্তু শাসনতন্ত্রটি যে সমস্ত ঘোষণা দেয় তার মাধ্যমে যে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে সেটা হচ্ছে এটি ইসলামের কর্তৃত্বকে শাসনতন্ত্রের নিজের কর্তৃত্বের অধীন হিসেবে উপস্থাপন করে।

এ ছাড়া শাসনতন্ত্রটি সাম্রাজ্যের জনগণের নামে ঘোষণা করা হয়নি। এর পূর্বের রাজকীয় ডিক্রির মত এটা ছিল সুলতানের নিজের কাজ; আর কারো নয়। এতে সার্বভৌমত্ব তাঁর কাছে অর্পণ করা হয় এবং সত্যি বলতে কি তাঁকে আইনের উর্ধ্বে বলে ঘোষণা করা হয়।[১৯] সুলতানের উপর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কর্তৃত্বের কথা এতে উল্লেখও করা হয়নি বা খলীফা শব্দটির ব্যবহার ছাড়া আল্লাহর কর্তৃত্বের কথা স্বীকারও করা হয়নি। এতে হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী রীতি অনুযায়ী আলেমদেরকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করে তাদের দায়িত্বে আইনকে সোপর্দ করার কোন ইঙ্গিতও ছিল না। বস্তুত এটা ছিল আধুনিক এবং পশ্চিমা ধারায় অনুপ্রাণিত একটি শাসনতন্ত্র যেখানে

---

১৬. খ্রিস্টিয় ১৮৬১ সনের তিউনিসীয় 'কানুনুদ্ দাওলা' অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় আইন এর প্রথম নজীর স্থাপন করেছিল, তবে সেটি একই পরিভাষা ব্যবহার করেনি। দেখুন ব্রাউন, *Constitutions*, পৃ. ১৬-২০.

১৭. আর্টিক্যাল-৪

১৮. আর্টিক্যাল-১১

১৯. আর্টিক্যাল-৫

www.pathagar.com

সার্বভৌমত্বকে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখা হয়।[২০] এভাবে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এটা কোন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছিল না; এতে ইসলামকে কর্তৃত্বের সর্বোচ্চ উৎস হিসেবেও ঘোষণা করা হয়নি।

খ্রিস্টিয় ১৮৭৬ সনের এই শাসনতন্ত্রটি গণতান্ত্রিকও ছিল না; যেহেতু এতে সার্বভৌমত্ব জনগণের কাছে অর্পণ করা হয়নি, অর্পণ করা হয় সুলতানের হাতে। তবে এতে এই প্রতিশ্রুতি ছিল যে, এটি গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হবে। বাস্তবিক দুই স্বতন্ত্র কক্ষ বিশিষ্ট সাধারণ পার্লামেন্ট বা আইনসভা ব্যবস্থার মাধ্যমে তাই করা হয়। সঠিক অর্থে বলা যায় এটাই হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের প্রথম পশ্চিমা ধাঁচে গঠিত আইনসভা। এতে এর সদস্যদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং নিজের পছন্দ মত ভোট দেয়ার স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেয়া হয়। যদিও উভয় কক্ষে অনুমোদিত যে কোন বিল আইনে পরিণত হবার জন্য তারপরও সুলতানের রাজকীয় অনুমোদন জরুরি ছিল। শাসনতন্ত্রটি একটি অত্যাবশ্যক আইনসভার অস্তিত্বকে গুরুত্ব প্রদান করে। এ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী উচ্চকক্ষ অর্থাৎ সিনেট গঠন করতে হতো সিনেটরদের দ্বারা যাদেরকে সারা জীবনের জন্য সুলতান মনোনীত করতেন। অন্যদিকে নিম্নকক্ষ যা চেম্বার অব ডেপুটি হিসেবে পরিচিত ছিল, প্রতি চার বছর পর নির্বাচিত হতো। একজন নিম্নকক্ষ সদস্য প্রতি পঞ্চাশ হাজার পুরুষের জন্য নির্বাচিত হবেন- এভাবে জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের প্রেক্ষাপটকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, উসমানীয় শাসনতন্ত্র যে আইনসভা সৃষ্টি করে সেটা ছিল মূলত শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের দিকে একটি সিদ্ধান্তমূলক দিকপরিবর্তনকামী পদক্ষেপ। সে সময় বহু ইউরোপীয় দেশও এরূপ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলছিল। তবে একটি নির্বাচিত আইনসভা আর জনগণের সার্বভৌমত্বকে মেনে নেয়া মোটেও এক কথা নয়। তথাপি যে শাসনতান্ত্রিক দলিল অন্তত আংশিকভাবে নির্বাচিত একটি গ্রুপ বা সমষ্টির (আইনসভা) কাছে আইন তৈরির ক্ষমতা থাকার বিষয়টি স্বীকার করে নেয়, সেটা এমন এক বৈশিষ্ট্যের কথা বলে যেটাকে আমরা বর্তমানে ইউরোপে গণতন্ত্রায়ণের প্রক্রিয়া বলে আখ্যায়িত করি। এটা কল্পনা করা কঠিন নয় যে, ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় এ ধরনের একটি আইনসভার সৃষ্টি পশ্চিমা বিশ্বে এ ধরনের আইনসভার উদ্ভবের যে ফল হয়েছিল দীর্ঘ সময়ের

---

২০. ব্রাউন বেলজিয়ান ও প্রুশিয়ান এ উভয় শাসনতন্ত্রের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন; প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

www.pathagar.com

পথ পরিক্রমায় অনেকটা একই রকম প্রভাব সৃষ্টি করে। পরিণতিতে আইনের উৎস সম্পর্কে- সৃষ্টিকর্তা বা রাজকীয় যে রকম উৎসই হোক না কেন- এ পদক্ষেপ এমন অনুভূতি সৃষ্টি করে যে, জনগণই আইন তৈরির কর্তৃত্বের চূড়ান্ত উৎস।

এ সামগ্রিক ঘটনাবলীর পরিণতিতে এগুলোর প্রভাবে উসমানিয়া সাম্রাজ্য তার ক্রমবিলুপ্তির দিনগুলোতে আর সম্ভবত ব্যাপকতর অর্থে সমগ্র সুন্নী মুসলিম বিশ্ব শাসনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পথে কার্যকরভাবে পরিবর্তিত হতে শুরু করে। বলা বাহুল্য এ ধরনের সংস্কার অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য এবং উসমানিয়া সাম্রাজ্যের মৈত্রীকে ক্ষতিগ্রস্ত করেনি এবং তা প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত অটুট থাকে। তবে এ দাবি অতিরঞ্জিত হয়ে যাবে যে, সফল গণতান্ত্রিক সংস্কার করা হলে তা উসমানিয়া সাম্রাজ্যকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয় থেকে রক্ষা করতে পারত। যদি উসমানিয়া সাম্রাজ্য গণতন্ত্রায়ণের পথে থাকত তবুও বিজয়ী ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাদের নিজ নিজ প্রভাব বলয়ে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের ভূখণ্ডসমূহ বিভক্ত করার ব্যাপারে আগ্রহী হতো। বরং উসমানিয়া সাম্রাজ্যের শেষের দিকের বছরগুলোতে সফল ও কার্যকর আইনসভা সৃষ্টির ফলাফল হচ্ছে, এটা নির্বাহী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার উপযুক্ত ক্ষমতাশালী সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত আইনসভার ধারণাকে ইসলামী বিশ্বের প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ব্যাখ্যাটি হচ্ছে এ রকম: ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করে এমন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সৃষ্টির ক্ষেত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া জনগণ নিজেই স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে ওঠতে পারে, যদি জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর- (যেমন জনগণের ভোটে নির্বাচিত আইনসভা) ক্ষমতার ভারসাম্যের জন্য কিছু প্রতিযোগী প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি না থাকে। এটিই হল ইংলিশ ও ফরাসি বিপ্লবের ব্যর্থতার অন্যতম শক্তিশালী শাসনতান্ত্রিক ব্যাখ্যা। ঐ বিপ্লবে রাজহত্যা আইনসভাকে রাজ-ক্ষমতার প্রতিযোগী শক্তি হবার পথ খুলে দিয়েছিল। আর আইনসভা যখন রাজ-ক্ষমতার প্রতিযোগী শক্তিতে পরিণত হয় তখন সেটা শাসনতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা ছাড়াই শাসকবর্গের দেশ শাসনের যে প্রলোভন ও উদগ্র আকাঙ্ক্ষা তাকে যথেষ্ট মাত্রায় মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু যখন বিশেষত ইউরোপে শাসনতান্ত্রিক গণতন্ত্র সফলভাবে আবির্ভূত হয়, আইনসভা সেখানে রাতারাতি সমস্ত ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করেনি। বরং আইনসভা রাজাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই ক্ষমতা অর্জন করেছে; সে সময় রাজারা ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য অংশের কিংবা সম্পূর্ণ ক্ষমতারই দাবিদার ছিল।

www.pathagar.com

উনিশ ও বিংশ শতাব্দীতে- অন্তত যেখানে অবস্থা ভাল ছিল সেখানে- আইনসভাগুলোর দীর্ঘস্থায়ী প্রবণতা ছিল রাজতন্ত্রের পতনের মাধ্যমে অধিকতর ক্ষমতা অর্জন করা। শাসনতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে দেখলে দেখা যায়, ক্ষমতার প্রতিযোগী উৎসগুলোর মধ্যে ক্ষমতার জন্য লড়াই করা এক অর্থে ইতিবাচকই ছিল। কেননা এতে একদিক থেকে অন্যদিকে ক্ষমতার দিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে হলেও কিছুটা ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষিত হয়। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী রাজাদের উপর মোটামুটি ধরনের নিয়ন্ত্রণ হিসেবে আইনসভাগুলো তাদের সূচনা করে এবং রাজাদের অসীম কর্তৃত্বের (যে কর্তৃত্ব নিয়ে রাজাদের রাজত্বের সূচনা) সমাপ্তি টানতে চেষ্টা করে; তবে শাসনতান্ত্রিক রাজারাও একে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু যদি আইনসভা বা শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র এ দুটোর কোনটিই এককভাবে উচ্চ কর্তৃত্ব (supremacy) অর্জন না করত, তাহলে হয়ত রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে আরো মসৃণভাবে উত্তরণের সুযোগ থাকত।

যেমনটি আমরা পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, ইসলামী শাসনতন্ত্রে নির্বাহী হিসেবে সুলতান এবং আইনের রক্ষক হিসেবে আলেমদের মাঝে ক্ষমতার ভারসাম্য বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এ অবস্থায় আইনসভার মত নতুন বিষয় সংযোজন প্রায় অবধারিতভাবে আলেমদের স্থানচ্যুতি ঘটায়, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বাণীকে ব্যাখ্যা করে আইন উদ্ভাবন করা যাদের একক কাজ ছিল। আইন প্রণয়নের মানবিক উৎস অর্থাৎ আইনসভা চালুর মাধ্যমে আলেমদের এই অনন্য কাজের সুযোগটিকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করা হয়। আমি যেমনটি পূর্বে বলেছি, আইনের সূত্রবদ্ধকরণ বা কোডিফিকেশন আলেমদেরকে বাস্তবে এবং তত্ত্বগত- উভয় দিক থেকে ছোট করে। আর আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইনসভা কোডিফিকেশনের মতই ধ্বংসাত্মক হিসেবে আবির্ভূত হয়- সম্ভবত তার চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে।

তথাপি সঠিকভাবে বলতে গেলে, আইনসভা আইন প্রণয়নের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হিসেবে আলেমদেরকে যদিও সরিয়ে দিতে চেয়েছে, এটি ইসলামী শাসনতন্ত্রে সংস্কার সাধনের সময় ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টির কিছুটা আশাও জাগিয়ে রাখে। তবে ক্ষমতাবান নির্বাহীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য হিসেবে আলেমদের অবস্থানটিকে আইনসভা বদলে ফেলে। ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ভারসাম্য থেকে জনগণভিত্তিক সার্বভৌমত্বে সরাসরি না গিয়ে আইনসভা এবং নির্বাহী বিভাগের মধ্যকার ভারসাম্যের পশ্চিমা ধাঁচের অধিক পরিচিত মডেলের মধ্য দিয়ে এ ব্যবস্থাটি তার যৌক্তিক পথ করে নেয়। গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে আলেমদের যে অবস্থান ছিল তার অবলুপ্তি এই সম্ভবের বিশ্বে (possible world) হয়ত এক ধরনের ইতিবাচক উন্নতিই

www.pathagar.com

বটে; কেননা এটি একটি আধুনিক এবং নীতি নির্ধারক আইনসভার উদ্ভবের সুযোগ করে দেয়। এ আইনসভা ধীরে ধীরে, যেমনটি ইউরোপে হয়েছে, বৃহত্তর নির্বাহী বিভাগের বিপরীতে নিজের বৃহত্তর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে এবং এর মাধ্যমে শাসনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমি তৈরি করেছে।

উসমানীয় সংস্কারক গোষ্ঠী কেন আলেমদেরকে প্রান্তিকীকরণ করতে অর্থাৎ একপ্রান্তে ঠেলে দিতে আগ্রহী ছিল এই দৃষ্টিভঙ্গি তা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে। পাশ্চাত্যে প্রশিক্ষিত বা অন্তত পাশ্চাত্য মডেল দ্বারা প্রভাবিত এ সব সংস্কারকের কাছে আইনসভার মত প্রতিষ্ঠানকে সফল আধুনিকীকরণমূলক সংস্কারের মূল চালিকাশক্তির মত মনে হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উদ্ভূত চাহিদা পূরণে আইনসভার নতুন নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকার বিষয়টিই আইনসভাকে তাদের কাছে এতখানি আকর্ষণীয় ও প্রতিশ্রুতিশীল বলে প্রতিষ্ঠিত করে। তবে পৃথিবীর যে কোন স্থানে আধুনিক আইন সংস্কারকদের কাছে যেমন-জেরেমি ব্যান্থাম এ ধরনের সংস্কারকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ[২১]- তেমনি উসমানীয় সংস্কারকদের কাছেও আইন সংস্কারের মাধ্যমে উত্তরণ ঘটাতে হয় এমন বিষয়ে সবচেয়ে হতাশাজনক একটি সমস্যা ছিল পুরনো আইনি ব্যবস্থার ব্যাপারে অনমনীয় এবং অহেতুক রক্ষণশীলতার মনোভাব। এটা যে কোন প্রতিষ্ঠিত আইনি ব্যবস্থায় সংস্কারের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। জেরেমি ব্যান্থাম ইংল্যান্ডের আইন যৌক্তিককরণের প্রয়োজনে দ্রুত আইনি পরিবর্তন করার লক্ষ্যে সাধারণ আইনের বিচারকদের উপর যতটুকু আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, উসমানীয় সংস্কারক গোষ্ঠী শাসনকাজের জন্য আইনকে কার্যকর মাধ্যম হিসেবে রূপান্তরিত করতে গিয়ে আলেমদেরকে এর চেয়ে বেশি আশা করেনি।

সংস্কারকদের কাছে তখন আইনি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের পথে শরীয়াকে বাধা বলে মনে হয়েছে এবং শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শরীয়ার রক্ষক হিসেবে আলেমদের যে গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান ছিল তাদেরকে সে অবস্থান থেকে সরিয়ে দেয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে। তাদের পরিবর্তে নির্বাচিত আইনসভা নীতিগতভাবে আধুনিক ও তরুণ (সংস্কারকগণ নিজেদেরকে তরুণ উসমানীয় বলে সম্বোধন করত) প্রজন্মের হাতে আইনি এজেন্ডার নিয়ন্ত্রণ তুলে দেয় এবং সেটা ইসলামী আইনজ্ঞ বা মুফতীদেরকে বাদ দিয়েই করে, যদিও তারা ঐতিহ্যকেই এতকাল ধরে রেখেছিলেন। খ্রিস্টিয় ১৮৭৬ সনের উসমানীয়

---

২১. দেখুন, জেরেমি ব্যান্থাম, *A Fregment on Government,* (ক্যামব্রিজ : ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৮)

www.pathagar.com

শাসনতন্ত্রের অধীনে সৃষ্ট আইনসভা যদি একটি টেকসই এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হতে পারত এই আধুনিকীকরণ কৌশল হয়ত কার্যকরভাবে কাজ করত। কিন্তু ঐ আইনসভা সেভাবে গড়ে ওঠতে পারেনি। এখানেই শাসনতান্ত্রিক ট্রাজেডি ঘটে।

হারানো আইনসভা

ব্যাপারটি যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাতে দেখা যায়, নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা কমিয়ে দিয়ে আইনসভা তার নিজের ক্ষমতা যেভাবে বাড়ানোর দিকে ঝোঁক সে ব্যাপারে তৎকালীন সুলতান অসচেতন ছিলেন না। বিশৃঙ্খলপূর্ণ ক্ষমতার পরিবর্তনের পর (সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের আগের শাসক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন, তবে তিনি মাত্র এক গ্রীষ্ম পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকতে পেরেছেন) ক্ষমতা হাতে নেয়ার পর দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ প্রথম যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেন তা হল তিনি ১৮৭৬ সনের ডিসেম্বরে একটি শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন। প্রায় তখনই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৮৭৭ সনের মার্চে পার্লামেন্টের অধিবেশন আহবান করা হয়। যে কোন আইনসভা তার অস্তিত্ব লাভ করার পরপর যে প্রাথমিক কাজগুলো করে এই পার্লামেন্টও সেগুলো করতে দেরি করেনি। যেমন, সরকারের সমালোচনা করতে মত প্রকাশের স্বাধীনতার অনুশীলন করা এবং সরকারের মন্ত্রীদের কাজের ভুলত্রুটি সম্পর্কে জানতে চাওয়া ইত্যাদি।[২২] তবে আইনসভার প্রথম বৈঠকের এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৮ সনে সুলতান আবদুল হামিদ এর কার্যক্রম মুলতবী ঘোষণা করেন এবং আরো বড় পদক্ষেপের অংশ হিসেবে তিনি শাসনতন্ত্রও মুলতবী ঘোষণা করেন। এভাবে উক্ত আইনসভার বিলুপ্তি ঘটে। সুলতান আব্দুল হামিদ ১৯০৮-০৯ সাল পর্যন্ত শাসন করেন এবং এ সময়ের মধ্যে কখনো তিনি আর আইনসভা আহবান করেননি বা কোনভাবে শাসনতন্ত্রের উপর নির্ভর করেননি।

তবে আইনসভা ও শাসনতন্ত্র মুলতবী করলেও সুলতান আব্দুল হামিদ ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন করেননি, যা 'তানযিমাত' বা সংস্কারের পূর্বে বিদ্যমান ছিল। এ সময় 'মিসিল' এবং অন্যান্য আইনি কোড কার্যকর ছিল। সুলতান আব্দুল হামিদ তাঁর দায়িত্বের ইসলামী বৈধতার কথা জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন এবং তাঁর কোর্টে আলেমগণ ছিলেন ধর্মীয়ভাবে রক্ষণশীল।[২৩] তবে যে বিষয়টি নিশ্চিত সেটা হচ্ছে কোডিফিকেশনের

---

২২. দেখুন, ব্রাউন, *The Constitutions*, পৃ. ২৩

২৩. Zurcher, *Turkey*, পৃ. ৮৩

www.pathagar.com

পূর্বে আলেমসমাজের যে শাসনতান্ত্রিক অবস্থান ছিল তিনি তাদের সে অবস্থান পুনরুদ্ধার করেননি। তাঁর কর্তৃত্বের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য আইনসভার ব্যাপারে সুলতান যতটুকু প্রয়োজনবোধ করেছেন সে তুলনায় আলেমদের পূর্বের অবস্থান পুনরুদ্ধারে তাঁর তত প্রয়োজন ছিল না। যা হোক, সুলতান আব্দুল হামিদ প্রায় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী শাসকে পরিণত হয়েছিলেন।

যে কারণে এমনটি ঘটেছে সেটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দৃশ্যত আলেমদের সমর্থন পাবার জন্য তাদের হারানো শাসনতান্ত্রিক অবস্থান পুনরুদ্ধার না করেও আবদুল হামিদ তাঁর কর্তৃত্বকে ততটুকুই দৃঢ় করতে সক্ষম ছিলেন যতটুকু বাস্তবে তিনি কার্যকরভাবে তা দৃঢ় করেন। এর কারণ এই যে, আলেমসমাজকে সংস্কারের সময় এমন কার্যকরভাবে তাদের অবস্থান থেকে বিচ্যুত করা হয় যে, তারা যে কোন শাসক তাদের প্রতি সামান্যতম দৃষ্টি দিতে রাজি তাকেই গ্রহণ করে নিতে আগ্রহী ছিল। আলেম শ্রেণীর ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা শরীয়ার নীতিগুলোকে সমুন্নত রাখতে যা সম্ভব তাই গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে ইতোপূর্বে কখনোই আলেমদের অবস্থান এত দুর্বল হয়নি। ফলে ইতোপূর্বে কখনো আলেমদের সমর্থন পেতে তাদের প্রতি কোন শাসকের এত সামান্য ছাড় দিয়ে কাজ আদায় হয়নি।

সময়ের পরিক্রমায় আলেমদের এরূপ গভীরভাবে দুর্বল করার ফলাফল শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে একটি অসাধারণ গুরুত্ববহ বিষয়ে পরিণত হয়। খ্রিস্টিয় ১৮৭৬ সনের শাসনতন্ত্র যে সংস্কারের পরিণতি সে সংস্কারের সময়কালে আইনের সূত্রবদ্ধকরণ শরীয়াকে রূপান্তরিত করে এবং আলেমদের স্থান দখল করে আইনসভা। তবে আইনসভা ও শাসনতন্ত্র মুলতবী করার পরও আইন ঘোষণা করার ক্ষমতা আলেমদের হাতের বাইরে থেকে যায়, অথচ ঐতিহ্যগতভাবে এটি তাদের হাতেই ছিল। কিন্তু এই ক্ষমতা আইনসভার কাছে ফিরে আসেনি, যেখানে এটি নির্বাহী বিভাগের সঙ্গে ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি করতে পারত। বরং আইন ঘোষণার ক্ষমতা নির্বাহী ব্যক্তির হাতেই চলে যায়। সংস্কারের সময়কালে এই ক্ষমতা যেভাবে রূপান্তরিত হয় তা প্রশাসনিক বিধি জারির কর্তৃত্বের পর্যায় পর্যন্ত চলে যায়। আরো উন্নত রূপে এটাই হয়ে যায় আইন প্রণয়ন ক্ষমতা- যেটা ছিল কেবল আইনের সম্পূরক হওয়া বা আইন খুঁজে পাওয়া বা ঘোষণা করার সমান নয় বরং খোদ আইন তৈরির করার ক্ষমতা।

আপাত স্ববিরোধী মনে হলেও এটা সত্য যে, শাসনতন্ত্রকে মুলতবী করে দিয়ে সুলতান মূলত চূড়ান্ত সার্বভৌম হিসেবে তাঁর কর্তৃত্বকে বৈধ করে নেন

www.pathagar.com

এবং একে জোরদার করেন। তাঁর এই কর্তৃত্বকে শাসনতন্ত্র আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয় এভাবে যে, সুলতান যদি শাসনতন্ত্রকে অনুমোদন দিতে পারেন তবে তিনি একে বাতিলও করতে পারেন। একই সময়ে সুলতান আব্দুল হামিদ আইনসভার মত একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে আইন প্রণয়নের কর্তৃত্ব দেয়ার সুযোগ না দিয়েই তাঁর কর্তৃত্বকে পুনঃমজবুত করতে সক্ষম হন। অন্য কথায়, অন্যত্র আলেমদেরকে যথার্থভাবে প্রতিস্থাপন না করেই শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষাকারী হিসেবে আলেমদের যে অবস্থান ছিল সেখান থেকে সংস্কার তাদেরকে বিচ্যুত করে। ফলাফল হয় এই যে, নির্বাহী ব্যক্তি আলেমদের দ্বারা আরোপিত ঐতিহ্যগত ও পুরনো নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে যান; এমন কি তিনি আধুনিক নিয়ন্ত্রণ, যেটা জনগণের ভোটে নির্বাচিত আইনসভা দ্বারা আরোপিত হতে পারে, তা থেকেও মুক্ত হয়ে যান।

উপরিউক্ত চাতুর্য ও কৌশল সুলতান আব্দুল হামিদকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রায় ত্রিশ বছর সাম্রাজ্য শাসন করার সুযোগ করে দেয়। তবে এ বছরগুলো সুশাসনের কোন মডেল ছিল না। স্বৈরতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এ সময়ের শাসনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ভঙ্গুর সাম্রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী আর্মেনিয়ানদের গণহত্যা হিসেবে যাকে বিবেচনা করা যায় সে রকম ঘটনার প্রাথমিক পর্যায়। শেষ পর্যন্ত সুলতান আব্দুল হামিদ এক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন; এবারে এ অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল তরুণ তুর্কীদের (ইয়ং টার্ক) দল, যাদের আদর্শ পরিণামে আধুনিক তুর্কি জাতীয়তাবাদ এবং কামাল আতাতুর্কের রেডিক্যাল সেকুলারিজমের জন্ম দিয়েছে।

শেষের দিকের উসমানিয় শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, যেটি আমি মাত্র বর্ণনা করলাম, আইনের সূত্রবদ্ধকরণ ও আইনসভার সৃষ্টি দু'টো মিলে একত্রে আইনের রক্ষক হিসেবে আলেমদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিনিয়ে নেয়। একবার যখন আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে চলে আসে, তখন আলেমসমাজ সামগ্রিক শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আইনি বৈধতার উৎস হিসেবে তাদের মর্যাদার তাত্ত্বিক ভিত্তি হারিয়ে ফেলেন। একবার যখন আলেম-বিচারকদের থেকে আইনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি অন্য দিকে সরে যায়, পুরো ব্যবস্থার আইনি বৈধতা দেয়ার তাদের যে বাস্তব ভিত্তি ছিল তাও নষ্ট হয়ে যায়। বাস্তবতা হচ্ছে, উসমানীয় আইনসভা এতই স্বল্প মেয়াদী ছিল যে, তা আলেমদেরকে তাদের ঐতিহাসিক অবস্থানে পুনরুদ্ধার করে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেনি। অন্যভাবে বলা যায়, এটি ভারসাম্য হিসেবে আলেমদের অবস্থানের বিচ্যুতির পর নির্বাহী কর্তৃত্বের কোন শাসনতান্ত্রিক ভারসাম্য সৃষ্টি করেনি।

www.pathagar.com

একদিকে আইন ব্যাখ্যা করার জন্য আলেমদের অনুপস্থিতি অন্যদিকে আইন প্রণয়নের জন্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত আইনসভার অনুপস্থিতিতে আইন এ পর্যায়ে নেমে আসে যে, তখনকার আইনকে সার্বভৌম শাসকের নিছক নির্দেশ বা কমান্ড বলা যায়। সে সময় নতুন এবং রাষ্ট্র কর্তৃক জারিকৃত আইনের উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিচারকগণ সাধারণত তাদের অবস্থানকে অনেকটাই সেভাবে দেখত যেভাবে আধুনিক ইউরোপীয় বিচারকগণ দেখে- যারা তাদের নিজস্ব আইনি কোড প্রয়োগ করে- অর্থাৎ তারা নিজেদেরকে রাষ্ট্রের বিশ্বস্ত সেবক হিসেবে দেখে। যদিও সমসাময়িক ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর মত গত উনিশ শতকের শেষের দিকের উসমানীয় রাষ্ট্র জনগণভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এবং রাজকীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অঙ্গীভূত করার অর্থে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোন কিছু ছিল না। রাষ্ট্র বাস্তবে নির্বাহী ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছাড়া আর কিছু ছিল না। আইনের উৎস হিসেবে নির্বাহী এবং নির্বাহীর সেবক হিসেবে আইন প্রয়োগের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারকসহ রাষ্ট্রটি সামগ্রিক সার্বভৌম এমন এক রাষ্ট্রে পরিণত হয় যা ইসলামের ইতিহাসে আগে কখনো ছিল না।

আইন প্রণয়নকারী রাষ্ট্র এবং শরীয়া

বইটির এই অংশে আমি বলেছি যে, আলেমদের শরীয়া কিংবা নির্বাচিত আইনসভার গণমুখী কর্তৃত্ব- এর যে কোনটির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত একটি শক্তি হিসেবে নির্বাহীর মডেলটি বিংশ শতাব্দীতে এসে মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রে প্রভাবশালী মডেলে পরিণত হয়। এই ঐতিহাসিক-শাসনতান্ত্রিক দাবির বাইরে আমি তৃতীয় অধ্যায়ে আরো আলোচনা করে দেখাব যে, বর্ণিত সময়কালের মধ্যে বহু মুসলিম রাষ্ট্রের যে সুনির্দিষ্ট বিচ্যুতি ঘটেছে তা ছিল অনিয়ন্ত্রিত নির্বাহী কর্তৃত্বের কুফল। সমসাময়িক কালের ইসলামী রাজনীতিতে শরীয়া পুনরুদ্ধারের আহবানকে অনেকাংশে এ ধরনের শাসনতান্ত্রিক ত্রুটি সারানোর চেষ্টা হিসেবে দেখা যেতে পারে।

এই দাবিটিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রথমে একটি ঐতিহাসিক জটিলতা সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। সেটা হচ্ছে এ রকম, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয় উসমানিয়া সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়। এর পরিবর্তে যে সমস্ত নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে সেগুলো যেহেতু বিভিন্ন মাত্রায় ঔপনিবেশিক প্রভাবাধীনে কিংবা কোথাও কোথাও সরাসরি ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে যায়, সেগুলোর কোনটাই উসমানিয়া সাম্রাজ্যের শেষ দশকগুলোতে সেখানে যে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল সেটা যথাযথভাবে গ্রহণ করেনি।

www.pathagar.com

কাজেই এ কথা বলা সহজ নয় যে, উসমানিয়া সাম্রাজ্যের শেষের দিকের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি ঔপনিবেশিকতা বা আধুনিকতার নানা বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে যুদ্ধোত্তর সুন্নী বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলের জন্য ছিল সুনির্দিষ্ট ও গঠনমূলক।

এই জটিলতা থেকে বের হওয়ার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে এখানে যে মূল দাবিটি সামনে আনা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে দেয়া। সেটা হচ্ছে এই, বিংশ শতাব্দীতে সুন্নী মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ অংশে অনিয়ন্ত্রিত নির্বাহী ক্ষমতার মূলে ছিল ইসলামী পণ্ডিত বা আলেমসমাজের পতন এবং পাশাপাশি তাদের পরিবর্তে তুলনাযোগ্য অন্য কোন ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা বা অনুপস্থিতি। এ সার্বিক অবস্থাটিই সবচেয়ে সহজে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় সে সব রাষ্ট্রে যেগুলো এক সময় সাবেক উসমানিয়া সাম্রাজ্যের অধীন ছিল; বিশেষত আরবী ভাষী রাষ্ট্রগুলোতে এটা বেশি দৃষ্টিগোচর হয়। তবে এ কথাও সত্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে মুসলিম বিশ্বের এমন কিছু এলাকায় আলেমসমাজের পতন হতে থাকে বিভিন্ন মাত্রায়, যে এলাকাগুলো সরাসরি উসমানিয়া সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না। এ সব অঞ্চলের সমস্যারও মূল উপরে বর্ণিত সাবেক উসমানিয়া সাম্রাজ্যের অধীন অঞ্চলগুলোতে আলেমসমাজের পতনোন্মুখ অবস্থার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। এ সব অঞ্চলেও নির্বাহী ক্ষমতা আনুপাতিক হারে নিয়ন্ত্রিত ছিল না।

উদাহরণ স্বরূপ মুহাম্মদ আলীর অধীনে দৃশ্যত স্বাধীন এবং পরে ১৮৮২ সনের পর ব্রিটিশদের অধীনে *ডি ফ্যাক্টো* উপনিবেশ হিসেবে মিসরে আইনের সূত্রবদ্ধ করার প্রক্রিয়া এবং আলেমসমাজের পতনোন্মুখ অবস্থাকে সমসাময়িক উসমানিয়া সাম্রাজ্যের প্রেক্ষাপটে ঘটে যাওয়া একই ধরনের ঘটনাবলীর সাথে মোটামুটি একই সময়ে ঘটেছিল বলে মনে করা যেতে পারে।[২৪] এটা অবশ্যই বলতে হবে যে, সে সময় নির্বাহীকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ওয়াদাবদ্ধ একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রাজনৈতিক শ্রেণীতে পরিণত হবার জন্য মিসরের আইনবিদ শ্রেণী অন্য যে কোন আরব রাষ্ট্রের আইনবিদদের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী ও আন্তরিক পদক্ষেপ নিয়েছে। মিসরের আইনবিদরা এ সময় বহু রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দেয়, যেগুলো স্বাধীনতার দাবি জানাচ্ছিল এবং এ আইনবিদরাই ১৯২৩ সনের শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরি করে, যে শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য ছিল

---

২৪. দেখুন, ক্লার্ক বি লামবারদী (Clark B. Lombardi), *State Law as Islamic Law in Modern Egypt: The Incorporation of the Shari'a into Egyptian Constitutional Law,* (লেইডেন : ই. জে. ব্রিল, ২০০৬), পৃ. ৬০-১০০

www.pathagar.com

আইনের শাসনের অধীন সীমিত আকারের একটি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।[২৫] কিন্তু এই শাসনতন্ত্র কখনোই কার্যকর হতে পারেনি এবং এক পর্যায়ে ১৯৫২ সনের সামরিক অভ্যুত্থান আইনবিদদের আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু ঘটায়।

অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়াতেও ব্রিটিশ রাজ ইসলামী আইনকে কিছুটা সূত্রবদ্ধ করে[২৬] এবং পাকিস্তান যখন ১৯৪৮ (প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭) সনে প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও এটা বিভিন্নভাবে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল; সে দেশের আলেমসমাজও কখনো শাসনতান্ত্রিক কোন ধরনের ভূমিকা পালনের সুযোগ পায়নি, যে ভূমিকা পালনের সুযোগ প্রায় আড়াই শতক পূর্বে মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে তৎকালীন আলেমসমাজ পেয়েছিল।

এরপর আমার আলোচনা উসমানিয়া সাম্রাজ্য এবং সাম্রাজ্য পরবর্তী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার সরাসরি শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা ও নিরবচ্ছিন্নতাকে কেন্দ্র করে নয়, বরং শেষের দিকের উসমানিয়া সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত শরীয়ার নতুন ভূমিকা আর অন্যদিকে যুদ্ধোত্তর সুন্নী মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র শরীয়ার ভূমিকার মধ্যকার ধারাবাহিকতা ও নিরবচ্ছিন্নতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতার চিত্রটি অঙ্কন করার পর আমি একটি ব্যতিক্রমী কেস পাঠকের সামনে উপস্থাপন করব সেখানকার শাসন-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করার জন্য। ব্যতিক্রমী কেসটি হচ্ছে সউদী আরব। আমি সউদী আরব সম্পর্কে আলোচনার সময় ঐতিহাসিক সুন্নী শাসনতন্ত্রের কিছু কিছু বিষয়কে তাদের সুনির্দিষ্টভাবে সংরক্ষণ করার ব্যাপারটিসহ আলোচনা করব।

যা হোক, ধারাবাহিকতা ও নিরবচ্ছিন্নতা সম্পর্কে মূল দাবিটি প্রাসঙ্গিক কতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

প্রথমত ঐতিহ্যবাহী সুন্নী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শরীয়া ছিল আইনের সর্বোৎকৃষ্ট এবং স্বর্গীয় উৎস, যে আইন একান্তভাবে আলেমসমাজ ব্যাখ্যা করতেন। কিন্তু উসমানিয়া সাম্রাজ্যের শেষের দিকে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর

---

২৫. ফারহাত যায়েদা (Farhat Zaideh), *Lawyers, the Rule of Law and Liberalism in Modern Egypt*, (স্ট্যানফোর্ড : হুভার ইনস্টিটিউশন, ১৯৬৮), বিশেষত দ্রষ্টব্য পৃ. ৭৮-৮২। এই সময় সম্পর্কে দেখুন, আফাফ লুতফি আস্-সায়্যিদ মারসো, *Egypt's Liberal Experiment: 1922-1936*, (বার্কলী ও লসএঞ্জেলস : ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৭৭)

২৬. দেখুন, জামান, *The Ulama in Contemporary Islam*, পৃ. ২১-৩৭

www.pathagar.com

সুন্নী মুসলিম বিশ্বের বেশির ভাগ অঞ্চলে তৎকালীন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শরীয়া রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংজ্ঞায়িত ও প্রয়োগকৃত কতগুলো বিধির সমষ্টিতে পরিণত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই শরীয়ার আওতা কেবল পারিবারিক আইন যে সব বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত সেগুলোর মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত আলেমসমাজ আইনের দৃশ্যত স্বাধীন রক্ষকের অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে সর্বোচ্চ যতটুকু হতে পেরেছেন সেটা হচ্ছে তারা কার্যত রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি নির্ভরশীল অংশে পরিণত হন। সবচেয়ে খারাপ যা হয়েছে সেটা হচ্ছে আলেমসমাজ নিছক ধর্মীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন, যাদের বিচারিক কাজের সাথে-আরো সাধারণভাবে দেখলে রাষ্ট্র শাসনের সাথে কোন সম্পর্কই থাকেনি।

তৃতীয়ত প্রথম দু'টি পরিবর্তনের ফলে সরকারের আইনি বৈধতা ঘোষণার জন্য আলেমদের প্রয়োজনও নিঃশেষ হয়ে যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে উপরের ঘটনাগুলো ঔপনিবেশিক বা দৃশ্যত ঔপনিবেশিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ঘটে। অতএব এ সব ঘটনাকে ঔপনিবেশিক স্বার্থ এবং নমুনার আলোকে বিবেচনা করা উচিত। ইতোমধ্যেই উসমানিয়া সাম্রাজ্যের শেষের দিকে শরীয়ার ভূমিকার রূপান্তর ঘটে যায়। সার্বভৌম রাষ্ট্র কর্তৃক আইন সূত্রবদ্ধ করা এবং আলেমদের তাদের অবস্থান থেকে বিচ্যুতি ঘটানোর বিষয়টি নির্বাহীর হাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে; এবং সেটা অটোমান বা উসমানীয়দের অধীনেই ঘটে। এসব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পশ্চিমা প্রভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এবং সংস্কারগুলো ঘটে সুলতানেরই কর্তৃত্বের অধীনে। পশ্চিমা শক্তিগুলো, যেগুলো প্রথম মহাযুদ্ধের পর সাবেক উসমানিয়া সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গঠিত বহু সংখ্যক রাষ্ট্রে সরকারগুলোর আকার বা ধরন ঠিক করে দিয়েছিল, তারা একটি নমুনা বা মডেলের উপর নির্ভর করছিল যা ইতোপূর্বেই অটোমানদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল।

বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আসমানী (আল্লাহ্‌র) আইনের সর্বোৎকৃষ্ট উৎস হিসেবে নয়, বরং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের জারি করা একগুচ্ছ বিধি হিসেবে শরীয়ার ধারণা দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। যুদ্ধোত্তর ব্রিটিশ ও ফরাসী আশ্রিত রাষ্ট্রগুলোতে লিখিত শাসনতন্ত্রগুলো বিশেষভাবে শরীয়াকে সাধারণ আইনের মত নিছক আরেক গুচ্ছ আইনি বিধির সমষ্টি হিসেবে বিবেচনা করেছিল যা রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত বিচারকগণ প্রয়োগ করবেন বলে নির্ধারিত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ খ্রিস্টিয় ১৯২৫ সনের ইরাকি শাসনতন্ত্র সে দেশে শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল যেখানে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা একটি নির্বাচিত পার্লামেন্টের

www.pathagar.com

উপর ন্যস্ত করা ছিল।[২৭] একইভাবে ১৮৭৬ সনের উসমানীয় শাসনতন্ত্র অনুসরণ করে সাম্রাজ্যের তৎকালীন সম্রাট শাসনতন্ত্র জারি করেছিলেন।

সিভিল বা দেওয়ানী আদালত ছাড়াও ইরাকি শাসনতন্ত্র ধর্মীয় আদালতও সৃষ্টি করেছিল, যেগুলোকে কেবল পারিবারিক আইনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর এখতিয়ার দিয়ে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এ সব ধর্মীয় আদালতে পারিবারিক বিষয়ে আদালতে উপস্থিত দু'টি পক্ষের পছন্দনীয় মাযহাব অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়ার বিধান ছিল। যদিও তখন পর্যন্ত ইরাকে পারিবারিক আইন সম্পর্কিত শরীয়ার অংশটুকু সূত্রবদ্ধ করা হয়নি। শরীয়া প্রয়োগ করার কর্তৃত্ব জোরালোভাবে শাসনতন্ত্রে ন্যস্ত ছিল। বস্তুত ১৯৫৮ সনের আগে ইরাকে সূত্রবদ্ধ করার কাজটি করা হয়নি।[২৮] সে দেশে তখন শরীয়া রাষ্ট্রের বৈধতাদানের পটভূমিমূলক আইন হিসেবে কাজ করেনি; বরং এটা ছিল অন্য রকম অর্থাৎ সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রই শরীয়ার প্রয়োগকে বৈধতা দিয়েছিল।

মিসরে শরীয়াকে রাষ্ট্রের প্রয়োগকৃত একগুচ্ছ বিধিতে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াটি ছিল গভীর ও পূর্ণতর। খ্রিস্টিয় ১৯৩৬ থেকে ১৯৪২ সনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আধুনিক আরব আইন চিন্তাবিদের অন্যতম আব্দুর রাযযাক আস্-সানহুরি সিভিল (দেওয়ানী) এবং ক্রিমিনাল (ফৌজদারী) এই উভয় ধরনের ব্যাপকভিত্তিক আইনি কোড প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর এ আইনি কোড যুগপৎ ইসলামী এবং পশ্চিমা বিষয়গুলোর প্রতিফলন ঘটায়।[২৯] সুন্নী আরব বিশ্বের অন্যত্রও এই অসাধারণ উদ্যোগের ফলাফল দেখা দিয়েছিল, কারণ ঐ সব দেশও সানহুরির প্রস্তুত করা কোড গ্রহণ করেছিল। সানহুরির এ উদ্যোগে শরীয়াকে ইসলামী ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত কতগুলো বিধির সমষ্টি বলে ধরা হয়েছিল। এগুলো সাধারণ আইনি ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করার

---

২৭. ইরাকি শাসনতন্ত্র বিষয়ে দেখুন, ব্রাউন, *Constitutions*, পৃ. ৪২-৪৬

২৮. শিবলী মালাত (Chibli Mallat), 'Shi'sm and Sunism in Iraq : Revisiting the Codes' *Islamic Family Law*, সম্পাদনা শিবলী মালাত ও জেন কানার্স (Jane Connors), (লন্ডন : ক্লুওয়ার ল' ইন্টারন্যাশনাল (Kluwer Law International), ১৯৯৬), এই কোডের পরবর্তী উত্থান-পতনের জন্য দেখুন, নোয়াহ ফেল্ডম্যান, *What We Owe Iraq : War and the Ethics of Nation Building* (প্রিন্সটন : প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৪), পৃ. ১০৯-১১

২৯. সানহুরী বিষয়ে দেখুন, ইনিড হিল (Enid Hill), 'Al-Sanhuri and Islamic Law : The Place and Significance of Islamic Law in the Life and Work of Abd al-Razzaq al-Sanhuri, Egyptian Jurist and Scholar 1895-1971', *Arab Law Quarterly*, ভলিয়ুম-৩, সংখ্যা- ১ (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮), পৃ. ৩৩-৬৪

www.pathagar.com

উপযোগী ছিল, যেখানে পশ্চিমা আইনি বিধির সাথে এগুলো পাশাপাশি অবস্থান করতে পারবে। যদিও সানহুরির এই উদ্যোগকে এক অর্থে ঔপনিবেশিক আবার আরেক হিসেবে ঔপনিবেশিকতা প্রতিহত করার অংশ হিসেবে করা হয়েছিল বলে আখ্যায়িত করা যায়।[৩০] এটা নিশ্চিত যে, উসমানীয়দের মিসিল বা অন্যান্য কোডের পূর্ব দৃষ্টান্ত না থাকলে এর কল্পনাও করা যেত না, যে মিসিল ও অন্যান্য কোড প্রথমবারের মত শরীয়াকে তার অবস্থান থেকে নিছক কতগুলো বিধির পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিল।

নতুন কোডের আলোকে আলেমদের অবস্থানের পতন ছিল চরম পর্যায়ের। এখন সর্বোচ্চ যে বিচারিক অবস্থান আলেমরা পেতে পারতেন তা হচ্ছে নিছক পারিবারিক আইন পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ- যা তার সীমিত বিচারিক এখতিয়ারের কারণে ছিল একটি নিম্ন মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। সিভিল আদালত তার বৃহত্তর বিচারিক এখতিয়ারের আলোকে তার বিচারকদের অধিকতর ক্ষমতা দিয়েছিল। একবার যখন শরীয়াকে একগুচ্ছ সূত্রবদ্ধ বিধি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যে কোন বিচারক, যার ক্লাসিক্যাল ইসলামী আইন সম্পর্কে কোন প্রশিক্ষণ ছিল না, তিনিও এ বিধি প্রয়োগ করতে পারতেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটেও একই অবস্থা দেখা গেছে, যেখানে প্রত্যক্ষ বিধি প্রয়োগ করা হতো। যেমন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিচারকরা যেখানে উপযুক্ত মনে করেছে ইসলামী ও হিন্দু ধর্মীয় আইনের কোড প্রয়োগ করেছে।[৩১] যে সব দেশে বিচারবিভাগ সম্পূর্ণভাবে মুসলিমদের দ্বারা গঠিত হয়েছে, সে সব দেশের প্রেক্ষাপটে সেক্যুলার প্রশিক্ষিত সিভিল বিচারকদেরকে আলেমদের স্থানে প্রতিস্থাপন করার বিষয়টি এটা স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, অটোমানদের আইন সূত্রবদ্ধ করার নমুনাকে এর যৌক্তিক পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং এর মাধ্যমে শরীয়া প্রয়োগ করার সুবিধাজনক অবস্থান আলেমরা আর ধরে রাখতে পারছিলেন না।

আইনের বিষয়বস্তুকে আলেমদের স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারটি যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, উসমানীয় শাসনকালেই আদালতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে স্বাধীন আলেমের ফতওয়া প্রদানের ধারণাটি দুর্বল হয়ে

---

৩০. দেখুন, আমর শালাকানি, 'Between Identity and Redistribution : Sanhuri, Genealogy and the Will to Islamise', *Islamic Law and Society*, সংখ্যা-৮, (২০০১); পৃ. ২০১; আরো দেখুন, শালাকানির অপ্রকাশিত J.S.D পেপার 'The Analytics of the Social in Private Law Theory : A Comparative Study' (হার্ভার্ড, ২০০০)

৩১. দেখুন জামান, *The Ulama in Contemporary Islam*, পৃ. ২১-৩১

www.pathagar.com

গিয়েছিল। তখন সরকারি মুফতীর অবস্থানও ক্রমশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল। যখন এভাবে একবার শরীয়া কার্যত রাষ্ট্র কর্তৃক জারি করা বিষয়ে পরিণত হয়ে যায়, তখন এর ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব যোগ্য এবং প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞদের একান্ত নিজস্ব বিষয় হিসেবেও আর অবশিষ্ট থাকেনি। এ কথা সত্য, যে সব আলেম শরীয়াকে সূত্রবদ্ধকরণ করতে চেয়েছিলেন তাদেরও আলেমদের রচনাকে অবলম্বন করতে হতো।

সানহুরি ক্লাসিক্যাল ইসলামী আইন বিষয়ে বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁর কোড বা আইনের সূত্রসমূহ তাঁর জ্ঞানের গভীরতাকে উন্মোচিত করেছিল। তবে এ কাজে যে সব আলেমের মতামত চাওয়া হয়েছিল তাঁরা বহু আগেই গত হয়ে গিয়েছিলেন।[৩২] যে অল্প কয়েকজন ইসলামী আইন বিষয়ে লেখা অব্যাহত রেখেছিলেন তাঁরা ক্রমবর্ধমান হারে এমন এক পরিবেশে এ কাজ করছিলেন যেখানে তাঁরা যতটুকু সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করতে পারতেন সেই অবস্থানকে আইনি বা রাজনৈতিক পুঁজিতে পরিণত করা যাচ্ছিল না।

অন্য কথায়, আইনের মূলনীতি বিজ্ঞান সম্পর্কে সারসংক্ষেপ লেখা এবং এর কোন তাত্ত্বিক বিষয়ে লেখা এমন ক্ষেত্রে যেখানে শরীয়া ছিল সকল আইনি কর্তৃত্বের ন্যূনতম উৎস আর অন্যদিকে এ সব বিষয়কে এমন এক স্থানে বা পরিবেশে ব্যবহার করা হয়। যেখানে শরীয়াকে এক গুচ্ছ অধস্তন আইনি বিধির পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে- এভাবে লেখা আর লেখাগুলোর বাস্তবে প্রয়োগ করার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য ছিল। ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একজন আলেম, যিনি আইনের মূলনীতি বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখেছেন, যা কখনো বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়নি, তিনিও বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদা এবং আইনের শ্রেষ্ঠত্ব (Preeminence) বাড়িয়ে তুলছিলেন। এমন কি সত্যিকারের জুরিস্টদের আইনও আলেম ও অ-আলেম উভয়কে সমানভাবে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে যে, শরীয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ বিষয় এবং আলেমরা হচ্ছেন এর কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাকারী ও

---

৩২. ক্লার্ক লামবারদী (Clark Lombardi) সানহুরির পদ্ধতিকে 'নিউ তাকলিদ' (Neo Taqlid) বলে আখ্যায়িত করেছেন যার মাধ্যমে আইনি সমস্যা থেকে আইনি উৎসের দূরত্বের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, যে আইনি সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য এই উৎসগুলোকে কোডে প্রয়োগ করা হবে। দেখুন লামবারদী, *State Law as Islamic Law in Modern Egypt*, পৃ. ৯২-৯৯

www.pathagar.com

অভিভাবক।[৩৩] কিন্তু একবার যখন রাষ্ট্র এর আইনি বৈধতার উৎস হিসেবে শরীয়ার স্বীকৃতি বাদ দিয়ে দিল তখন আইনের মূলনীতি বিজ্ঞানের উপর তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে লেখাগুলো দৃশ্যত অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে গেল।

এই অপ্রাসঙ্গিকতা বা অপাঙ্‌ক্তেয় হওয়ার অনুভূতি 'আলেম' কথাটিকে নিছক 'ধর্মীয়' ব্যক্তিত্বের অর্থে পরিণত করে। কিছু পশ্চিমা এবং কিছু মুসলিম পর্যবেক্ষকের কল্পনা প্রসূত ধারণার বিপরীতে ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ঐতিহ্য পার্থিব বিষয় থেকে ধর্মীয় বিষয়গুলোকে সবসময় আলাদা করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু আলেমরা এ ক্ষেত্রে যে পার্থক্য এঁকেছেন তা কখনো ধর্মকে জাগতিক বিষয় থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন বিষয় বলে বিবেচনা করেননি; যেহেতু ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মকে যেভাবে বিবেচনা করা হয়েছে তাতে ধর্মই সকল আইনি দায়িত্ব মেনে চলার পক্ষে কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করে নিয়েছে। অতএব ক্লাসিক্যাল অর্থে শরীয়াকে মূলে এবং শিক্ষায় একটি ধর্ম হিসেবে মনে করা হতো যা একই সাথে আইনগত আদর্শের মাধ্যমে মানুষের সাধারণ আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্যও ব্যবহৃত হতো। ইসলামী পণ্ডিত বা আলেমরা ব্যাপক অর্থে কেবল ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, তারা এ জগতের জাগতিক মানুষও ছিলেন, যাদের কেউ কেউ শরীয়াকে বাস্তবে প্রয়োগ করার দায়িত্বও নিয়েছিলেন এবং তাদের সকলে অন্তত শরীয়া এবং বাস্তব জীবনের ব্যাপারগুলোর মধ্যকার সম্পর্ককে প্রতিফলিত করেছিলেন।

রাষ্ট্রের জারি করা আইনের পরিবেশে প্রচলিত বিধিবিধানের সঙ্গে আলেম সমাজের সম্পর্কের প্রকৃতি বাস্তব জাগতিক লাভের চেয়ে পরজাগতিক লাভের সাথেই বেশি সম্পর্কযুক্ত বলেই প্রতীয়মান হয়। আলেমের পোষাক পরিধান করার একদা অর্থ ছিল ধর্মীয় মনের ঝোঁকের পাশাপাশি জাগতিক কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া। এখন সেই একই পোষাক- যদি কোথাও তা আদৌ থেকে থাকে- শুধুমাত্র পরজাগতিক প্রতিশ্রুতির প্রতীকে পরিণত হয়েছে। তবে ব্যাপারটি এমন নয় যে, ধর্ম এমন কি বিংশ শতাব্দীর সেক্যুলার মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেও নিজের অন্তস্থ গুরুত্ববিহীন বা সম্মানবিহীন অবস্থায় ছিল। বরং

---

৩৩. এই ব্যাখ্যাকে ওয়াটের বক্তব্যের সাথে তুলনা করে দেখা যেতে পারে। ওয়াটের বক্তব্য ক্যারিয়ারের উন্নতির সাথে সম্পর্কিত যা আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গিকে ভুল ভাবে তুলে ধরেছে : 'তারা অর্থাৎ আলেম বা ইসলামী পণ্ডিতরা এমন বিষয়কে বেছে নিয়েছেন যার বাস্তব কোন গুরুত্ব নেই কিন্তু তারা এমন বিষয় বেছে নিয়েছেন যার মাধ্যমে তারা তাদের আলেমসুলভ কৌশলের ব্যাপারে তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেন'। দেখুন ওয়াট, *Islamic Political Thought*, পৃ. ৭৬

www.pathagar.com

ধর্মীয় এবং জাগতিক ক্ষমতার মিলনক্ষেত্রের সাথে তুলনা করতে গেলে জাগতিক দিকটিকে উপেক্ষা করে কেবল পরজাগতিক হওয়ার দিকে সরে আসাকে পরাজয়ের মত বলেই মনে হয়। এই পরাজয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে কেবল ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিকে দায়ী করা যাবে না, যেখানে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ধর্মীয় কর্তৃপক্ষকে কৌশলে ব্যবহার করেছে, যে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষকে রাষ্ট্র শুধুমাত্র জনগণকে শান্ত করার জন্য ব্যবহার করেছে। যা হোক, আরব জনগণ উসমানীয় সাম্রাজ্য দ্বারা ইতোমধ্যেই ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় ছিল এবং এর ইতিহাসের বেশির ভাগ সময় রাষ্ট্র আলেমদের আইনের উপর নির্ভর করেছিল বাস্তবেও এবং আইনি বৈধতার উৎস হিসেবেও।

উসমানিয়া সাম্রাজ্যের পতনের পর যে সমস্ত নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় সেগুলো আইনি বৈধতার জন্য আলেম ও শরীয়ার উপর নির্ভর করেনি- এই ব্যাপারটিই উসমানিয়া আমলের চেয়ে উসমানিয়া-উত্তর শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কতটুকু ভিন্ন ছিল সেটা অন্য যে কোন বিষয়ের চেয়ে বেশি স্পষ্ট করে তুলে ধরে। যখন আলেমসমাজ আইনি বৈধতাদানের প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করেছিল সে সময় 'শাসক শরীয়ার দৃষ্টান্ত দিতে এবং এর প্রয়োগ ঘটানোর জন্য কাজ করছিল'- এ বিষয়টির উপরই তার বৈধতার ভিত্তি ছিল। সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধ করার বিষয়টি ছিল রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কারণ এবং একই সঙ্গে শাসকের প্রতি আনুগত্য করার জন্য শাসকের যে দাবি তারও ভিত্তি। এটা ছিল এই অর্থে যে, সে সময় এমন পরিবেশ ছিল যেখানে ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতন্ত্র বিষয়ক তাত্ত্বিকগণ জোর দিয়ে বলতে পারতেন যে, ধর্ম এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এ দু'টো যমজ ভাইয়ের মত- একটি অন্যটির উপর নির্ভর করে চলে।[৩৪]

বিপরীতক্রমে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগে রাষ্ট্র একই সঙ্গে আলেমদের উপর প্রাতিষ্ঠানিক নির্ভরতা এবং শরীয়ার কর্তৃত্বের উপর তাত্ত্বিক নির্ভরতা দু'টোই পরিত্যাগ করে। শাসনতান্ত্রিক পরিভাষায় এটি ছিল মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের পরিসমাপ্তি। পরবর্তী সময়ের রাষ্ট্রগুলো ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকতে পারে, কিন্তু সেটা এই সীমা পর্যন্ত যে, রাষ্ট্রের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব সার্বভৌম ক্ষমতা থেকেই উৎসারিত হয়েছিল, ইসলামী উৎস থেকে নয়। এ সব রাষ্ট্র ইসলামকে শুধু স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং একে একটি বিশেষ স্থান দিয়েছিল। কিন্তু এ রাষ্ট্রগুলো ঐতিহ্যগত অর্থে ইসলামী ছিল না।

---

৩৪. নোয়াহ ফেল্ডম্যান, "Religion and Political Authority as Brothers", in *Islamic Constitutionalism*

www.pathagar.com

ঠিক একই সময়ে আলেম ও শরীয়ার উপর নির্ভরতার সমাপ্তি মুসলিম বিশ্বে শাসনতান্ত্রিকভাবে আধুনিক রাষ্ট্রের জন্মকে তাৎপর্যময় করে তুলেছিল। এ ধরনের রাষ্ট্রের মানুষের অধিকার সংরক্ষণকারী এবং গণতান্ত্রিক চরিত্রের হওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে সাধারণভাবে এখনকার আধুনিক অনুদার রাষ্ট্রগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ সব রাষ্ট্র ক্ষমতা চর্চা করে- শুধু এই একটি বিষয়ের উপর এ সব রাষ্ট্রের বৈধতার উৎস নির্ভর করে। ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক তত্ত্বও ক্ষমতাকে বিবেচনা করেছিল, তবে তা শরীয়ার কতগুলো বিধানের আওতায় করেছিল। এই বিধান বা নির্দেশগুলো বর্তমানের নতুন সুন্নী আরব বিশ্বের দেশগুলো পরিত্যাগ করেছে।

আধুনিক অনুদার রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা-কেন্দ্রিক সরকারের চরিত্রের জন্য ঔপনিবেশিকতাকে কারণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, বিশেষত উসমানীয় সুলতান তাঁর পতনের পূর্ব পর্যন্ত খিলাফতের দাবি ধরে রেখেছিলেন। এ সময় পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো- যেমন ব্রিটেন- তাদের শাসন করার অধিকার সম্পর্কে নিজস্ব তত্ত্ব নিয়ে হাজির হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই তত্ত্ব ইসলামের আওতাধীন বৈধতার কোন উৎসের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়নি। তবে শেষের দিকের উসমানিয়া সাম্রাজ্যের দিকে যে বিষয়টি এই ঔপনিবেশিক ইতিহাসকে তুচ্ছ করেছিল এবং গুরুত্বকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল সেটা হচ্ছে এমন এক ঘটনা যা তুরস্কে ঘটেছিল। তুরস্কে কী ঘটেছিল? তুরস্ক রাষ্ট্রটি আনাতোলিয়া উপদ্বীপে একটি সরকারের ক্ষমতাসীন হওয়ার মধ্য দিয়ে অস্তিত্ব লাভ করেছিল এবং এক কালের মহান সাম্রাজ্যের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল সেগুলোর প্রতিনিধিত্ব করছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্ক ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে আসেনি। বরং ইয়ং টার্ক, যারা সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চেয়েছিল, তারা ক্ষমতায় এসেছিল এবং সংস্কারকে এগিয়ে নেয়ার জন্য যা কিছু তারা অবলম্বন করেছিল, সেগুলো বাস্তবায়ন করছিল, যে উদ্যোগ এখনও প্রাসঙ্গিক; অর্থাৎ উদ্যোগটি হচ্ছে তুরস্ক তখন তার পূর্বের তুলনায় ক্ষুদ্র সীমানা নিয়ে নিজেকে একটি জাতি রাষ্ট্রে (Nation State) পরিণত করছিল। তারা এক ধরনের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটাচ্ছিল যা ইউরোপীয় মডেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। যেখানে রাষ্ট্রের বৈধতা এ বিষয় থেকে উৎসারিত হয়েছিল যে, এটা এক সঙ্গে জমে থাকা একটি জাতীয় গোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করছিল, যার নাম ছিল তুর্কি। বহুজাতিক উসমানীয় পরিচয়- (উসমানীয় আমলে অটোমান তুর্কি ভাষায় কথা বলে এমন যে কেউ উসমানীয় হতে পারত তার নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নির্বিশেষে)- নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। ঘটনাক্রমে আরব জাতীয়তাবাদও বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের

www.pathagar.com

পারিপার্শ্বিকতায় জন্ম নিয়েছিল। ইস্তাম্বুল ও অন্যান্য অটোমান শহরে বসবাসকারী আরবী ভাষী শিক্ষিতদের মাঝে যার তাৎপর্যপূর্ণ পর্যায় পর্যন্ত উত্থান হয়েছিল, যাদেরকে ইয়ং টার্কদের তুর্কি জাতীয়তাবাদ থেকে বাদ দেয়া হয়েছিল।[৩৫]

পরিণামে কামাল পাশা, যিনি আতাতুর্ক নামে পরিচিত, তুরস্কে তাঁর কর্তৃত্ব সংহত করেন। ধর্ম তথা শরীয়া এবং আলেমসমাজকে তিনি এত বেশি নিষ্পেষণ করেন, ইসলামী সভ্যতার তেরশ বছরে আর কেউ এত বেশি নিষ্পেষণ করেনি। তাঁর রেডিক্যাল সেক্যুলারিজম সংক্রান্ত স্ব-সচেতন জ্যাকবিন কর্মসূচি রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যকার সম্পর্ককে একেবারে ছিন্ন করে দেয়; ধর্মকে কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উৎস হিসেবে সুযোগ দেয়, যাকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের অধীন করে দেয়া হয়। উসমানিয়া সাম্রাজ্যের পতনের পরও সুলতানের অধস্তন পুরুষরা পূর্বতন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নগণ্য এবং নাম-কা-ওয়াস্তে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে 'খলীফা' উপাধি ব্যবহার করছিল। কামাল পাশা ১৯২৪ সনে আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফত ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে দিয়ে 'খলীফা' উপাধি ব্যবহারের সুযোগ বন্ধ করে দেন। পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এর চেয়ে স্পষ্টভাবে বাতিল করে দেয়ার কথা কল্পনা করাও কঠিন।

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, কামাল আতাতুর্ক আধুনিক এবং সেক্যুলার জাতি রাষ্ট্রের পশ্চিমা মডেলের অনুরূপ মডেল সৃষ্টি করতে বা তাকে ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের জন্য যেটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে, কিছু পশ্চিমা শক্তির মাধ্যমে চাপিয়ে না দিয়েও কামাল পাশা তাঁর দেশে মৌলিক রূপান্তর ঘটাতে পারতেন। বস্তুত তুর্কি সমাজের উপর তিনি যে পরিবর্তন জোরপূর্বক চাপিয়ে দিয়েছিলেন তা ছিল সত্যিই পীড়াদায়ক। তাঁর এ পরিবর্তনটি হচ্ছে, ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধতা লাভের উপর যে নির্ভরতা খিলাফতের সময় ছিল তিনি সেটা সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছিলেন- 'কিছু প্রাচীনপন্থী মানুষের পশ্চাদমুখী বিশ্বাস ছাড়া ইসলাম আর কিছুই নয়' বলে ইসলামকে নিম্নস্তরে নামিয়ে দেয়ার একটি বিপরীতমুখী আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর- উপরে যে পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে সেটিই তাঁর এ আকাঙ্ক্ষাকে স্পষ্ট করে দেয় এবং এর মাধ্যমে রাজনৈতিক বৈধতার অর্থপূর্ণ উৎস হিসেবে আলেম সমাজ এবং শরীয়া ইতোমধ্যেই মৃত হয়ে গিয়েছিল। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার

---

৩৫. হাসান কায়ালী, *Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in the Ottoman Empire, 1908-1918,* (বার্কলী ও লসএঞ্জেলস : ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৯৭)

www.pathagar.com

জন্য লক্ষ্য করুন, কামাল আতাতুর্কের সংস্কার ছিল বহির্মুখী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এবং ইউরোপমুখী। তবে সে সংস্কারগুলো এসেছিল তুর্কি সমাজের ভেতর থেকে, বাইরের কোন স্থান থেকে নয়। ইসলামকে প্রান্তিকীকরণের ক্ষেত্রে কামাল পাশা মুসলিম বিশ্বের অন্য যে কোন শাসকের চেয়ে বেশি অগ্রসর হয়েছিলেন। কামাল পাশার এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য একজন মাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া যাবে, তিনি হলেন ইরানের পাহলবী শাহ, যার কথা আমরা পরে আলোচনা করব। কামাল পাশা তাঁর শাসনকে আলেমসমাজ এবং শরীয়া কর্তৃক বৈধতাদানের প্রশ্নে অন্যান্য যুদ্ধোত্তর নেতার মতই এ দু'টো (অর্থাৎ আলেম ও শরীয়া) থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত থাকার ব্যাপারে অনড় ছিলেন।

নির্বাহীর প্রাধান্য ও প্রভাব

উসমানিয়া সাম্রাজের পতনের পরিণতিতে বিংশ শতাব্দীর পথ পরিক্রমায় যে সমস্ত নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় সেগুলোর যদি কোন একক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য থেকে থাকে তবে নিঃসন্দেহে সেটি হচ্ছে এ সব রাষ্ট্রের অনিয়ন্ত্রিত নির্বাহী কর্তৃত্ব যা সরকারের সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ এবং এগুলোর উপর খবরদারি করে, এমন কি এর মাধ্যমে খোদ সমাজকেও প্রভাবিত করে। প্রায় সকল ক্ষেত্রে দেখা গেছে, উসমানিয়া সাম্রাজ্যের পতনের পর এ সব রাষ্ট্রের প্রথম সরকারের ধরনটি ছিল বিদেশী শক্তির প্রভাবাধীনে কোন না কোনভাবে রাজতান্ত্রিক। এ ধরনের রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রে না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয় এবং এ সব দেশে এর পরিবর্তে শক্তিশালী প্রেসিডেন্ট বা অন্য কোন স্ট্রংম্যানের আবির্ভাব ঘটে। এ ধরনের সরকারের উদাহরণ হচ্ছে মিসর, যেখানে একনায়ক এবং নির্বাহী কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন জামাল আব্দুন নাসের। তিনি এ ধরনের সরকারের মডেল সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর এই মডেলটিকেই বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন দেশে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন, সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, আলজেরিয়া এবং তিউনিসিয়ার কথা বলা যায় । এখানে কেবল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দেশের নাম বলা হল। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজতন্ত্র টিকে গেছে। যেমন, মরক্কো ও জর্ডান। তবে অরাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শক্তিমান প্রেসিডেন্টগণ যেভাবে রাষ্ট্র ও সমাজকে প্রভাবিত করেছেন এ সব রাজতান্ত্রিক দেশও সেভাবেই এই কাজে সফল হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন এ সব রাষ্ট্র- বিশেষত এক সময়ের উসমানিয়া সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা আরবী ভাষী অঞ্চলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রগুলো- বিগত একশ বছরে নির্বাহীর খবরদারি ও কর্তৃত্বকে এমনভাবে গ্রহণ করে নিল?

www.pathagar.com

কেন এ সব রাষ্ট্রের একটিও শক্তিশালী আইনসভা কিংবা নির্বাহীর ক্ষমতার ভারসাম্য হিসেবে সক্ষম, কার্যকর ও স্বাধীন বিচার বিভাগ সৃষ্টি করতে পারল না?[৩৬] এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর হচ্ছে, এ সব রাষ্ট্রের বিশেষ লক্ষণীয় কোন কিছু নেই। স্থায়ী সেনাবাহিনী এবং রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রযন্ত্র ল্যাটিন আমেরিকা থেকে শুরু করে আফ্রিকা, আফ্রিকা থেকে এশিয়া পর্যন্ত দেশে দেশে দৃশ্যত সামরিক একনায়কদেরকে এভাবে শাসন করার সুযোগ করে দিয়েছে। যদিও এ সব দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি সর্বদাই ছিল ভিন্ন ভিন্ন, তবু এ সব দেশে এটাই ঘটেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ল্যাটিন আমেরিকান ক্যাডিলো (caudillo) ও আরব রঈস- এরা উভয়ে সর্বাধিক ক্ষমতাবান এবং সবচেয়ে কম নিয়ন্ত্রিত ধরনের নির্বাহী ক্ষমতার দৃষ্টান্ত। এ ধরনের ক্ষমতা ট্যাক্স বা করের বাইরেও রাজস্বের উৎস সৃষ্টিতে সহায়তা করে- সেটি হতে পারে তেল বা অন্য কোন খনিজ পদার্থের ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ অথবা বিশ্বের ধনী দেশগুলোর পক্ষ থেকে মিত্রের সন্ধান করতে গিয়ে সরাসরি প্রদত্ত অর্থ। তবে এগুলো ছাড়াও একজন সৃষ্টিশীল ও ক্যারিশম্যাটিক নেতা রাষ্ট্র নামক জাহাজের হাল শক্ত হাতে ধরে রাখতে পারেন এবং তাকে শুধু তার মৃত্যুর মধ্য দিয়েই ক্ষমতা থেকে সরানো সম্ভব- সে মৃত্যু স্বাভাবিক কিংবা অস্বাভাবিক যে রকমই হোক না কেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, একনায়কসুলভ নির্বাহী ক্ষমতার কিছু চিরাচরিত এবং অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন দেশ এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে চিহ্নিত করা যায়। তবে এ সব দেশে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি কেন এরূপ হল প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার ব্যাখ্যা থাকতে হবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার বিভিন্ন

---

৩৬. মিসরের স্বাধীন বিচার বিভাগ রয়েছে বলে প্রায়ই বলা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি দেখার জন্য দেখুন, ব্রাউন, *The Rule of Law in the Arab World*, কিছু স্বাধীন তৎপরতার ঝলক নিঃসন্দেহে থাকা সত্ত্বেও মিসরের বর্তমান (প্রেসিডেন্ট হুসনী মোবারকের সময়) বিচার বিভাগ সে দেশের প্রেসিডেন্টের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার বিপরীতে যথেষ্ট মাত্রায় ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি করতে পারে না। ব্রাউনের নিজের বর্ণনা অনুযায়ী, মিসরের বিচার বিভাগের কার্যক্রম না 'আইনের শাসন' পদবাচ্যযুক্ত উদার আইনি বৈধতা সৃষ্টি করে, না নির্বাহীর ক্ষমতা অনুশীলনকে আইনি বৈধতা দান করে। বরং সে দেশের বিচার বিভাগ একটি 'রাজনৈতিক' কাজ সম্পন্ন করেছে। সেটি হচ্ছে 'এটি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি ও পদাধিকারীর উপর (কখনো কখনো দুর্বল) নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে।' (পৃ. ১২৮)

www.pathagar.com

দেশে এটা নিশ্চিত যে, ঔপনিবেশিক শাসনের পরিণতিতে এ সব দেশে জাতীয় পর্যায়ে কখনোই ভারসাম্যপূর্ণ সরকারের কোন প্রাতিষ্ঠানিক মডেল সৃষ্টি হবে না। তবে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের সময় হয়ত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বা কাগজে-কলমে এ ধরনের ব্যবস্থা থাকতে পারে। এর কোনটিই আইনের শাসন নয় এবং এগুলোকে এ সমস্ত দেশের ইতিহাসে খুব বেশি সম্মানও করা হয়নি।

যদি আরব দেশগুলোতে ব্রিটিশ ও ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনামলকে আমাদের বিশ্লেষণের সূচনা বিন্দু বলে ধরে নেই, তাহলে একই ধরনের মন্তব্য ইরাক বা সিরিয়ার মত দেশগুলোর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে, যে দেশগুলোতে আধুনিককালে কখনোই নির্বাহী ক্ষমতার কার্যকর ভারসাম্যমূলক কিছু সৃষ্টি হয়নি। যদি আমরা আমাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিপাতকে আরো একটু সম্প্রসারিত করি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, উসমানীয় শাসনামল এবং এর পূর্বে এ দেশগুলো এক ধরনের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিমণ্ডলের মধ্যে এসেছিল যেখানে ক্ষমতার ভারসাম্য ছিল আদর্শ এবং যেখানে অনেকটা আইনের শাসনের মত অবস্থা বিরাজমান ছিল। তবে এ ধরনের কথা ল্যাটিন আমেরিকায় স্পেনের ঔপনিবেশিক শাসনকাল বা তারও আগের সময় সম্পর্কে বলা যাবে না। একইভাবে অধিকাংশ সাব-সাহারান আফ্রিকান দেশগুলোর নানা জাতির অধীনে ঔপনিবেশিক শাসনামল বা তারও আগের আমল সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলা যাবে না। এ ধরনের মন্তব্য এ সব দেশের জন্য সঠিক হবে না।

ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার ভারসাম্য এবং আইনের শাসন ছিল ধরে নিলে প্রশ্ন ওঠে কেন আরবী ভাষী অঞ্চলের আধুনিক দেশগুলোতে এ ব্যবস্থার নবায়ন সম্ভব হল না। এর উত্তর হচ্ছে, এ সব দেশে শরীয়ার তার অবস্থান থেকে বিচ্যুতি এবং আলেম শ্রেণীর পতন এমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি অবশিষ্ট রাখেনি যা তাদের পরিবর্তে নতুনের প্রতিস্থাপনকে কার্যকর ও সার্থক করতে পারে। এমন একটি পরিবেশে অনিয়ন্ত্রিত নির্বাহীর উত্থানকে বাধা দেয়ার মত কোন কিছু থাকে না। অনিয়ন্ত্রিত নির্বাহী ক্ষমতার উত্থানে জনসাধারণ নিঃসন্দেহে অসন্তুষ্ট হয়, বিশেষত যখন এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়িত হয় না। কিন্তু তবু লক্ষণীয় যে, এ সব দেশে জনসাধারণের এ অসন্তুষ্টি কোন প্রাতিষ্ঠানিক সম্মিলিত শক্তিতে পরিণত হতে ব্যর্থ হয়েছে, যেটা বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে ক্ষমতাসীনের টেকসই বিকল্প হিসেবে সংগঠিত হতে সক্ষম করে তুলতে পারে।

www.pathagar.com

এই বিশ্লেষণ থেকে এ কথা বলা যায় যে, আরব বিশ্বে অনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রপতি বা রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার প্রকৃতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল বা এখনও আছে। বিশেষত শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এ সব দেশে শরীয়ার শাসনের মাধ্যমে কিছুটা হলেও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম ছিল, যাতে শাসনতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করার সুযোগ ছিল। তবে রাষ্ট্রীয় আইনি বৈধতার ভিত্তি হিসেবে শরীয়ার বিলোপ এবং পাশাপাশি আলেম শ্রেণীর পতন- শাসনতান্ত্রিক বৈধতা রক্ষায় যাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল- এ দু'টো ঘটনার প্রেক্ষিতে আরবী ভাষী জনগোষ্ঠি অনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রতিরোধ সৃষ্টির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

তবে এ কথার অর্থ এই নয় যে, আরবী বা ইসলামী রাজনৈতিক ধারার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এরা ক্ষমতা এবং শক্তির অনুগত থাকতে চায় কিংবা ক্ষমতা বা শক্তিকে স্বীকার করে নিতেই পছন্দ করে, যেমনটি কখনো কখনো কেউ কেউ বলে থাকে। কেননা ইসলামের ইতিহাসে আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এবং আইন দ্বারা বৈধতাপ্রাপ্ত বহু সরকার দেখা গেছে যেগুলো এই সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণের বিপরীতধর্মী ছিল। আপাত এটাও মনে করা ঠিক হবে না যে, ইসলামী রাজনৈতিক সংস্কৃতি 'একদিনের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার চেয়ে ষাট বছরের অত্যাচারী শাসনও ভাল'- এই কথাটির যথার্থতা বিচার করে।[৩৭] এ প্রবাদের অর্থ এই নয় যে, জুলুম নির্যাতনকে হালকাভাবে নেয়া যাবে; বরং এর অর্থ হচ্ছে, সামান্য মাত্রার নৈরাজ্যকর অবস্থাও ধারণাতীত বিপর্যয়কর এবং সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে। (আমেরিকার ইরাক দখলের সময়টিতে ইরাকের অবস্থা এ মন্তব্যটি কত বাস্তব তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।)

বরং বহু মুসলিম দেশে বিশেষত আরব রাষ্ট্রগুলোতে নির্বাহীর জুলুম প্রতিরোধে প্রতিষ্ঠান ও সমাজের ব্যর্থতা যার ইঙ্গিত বহন করে সেটা হচ্ছে এ সব দেশে এমন একটি শ্রেণীর অনুপস্থিতি বা বিলুপ্তি, বহু শতাব্দী পর্যন্ত যে শ্রেণীটির কাজ ছিল এ ধরনের প্রতিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়া। প্রথম অধ্যায়ে আমি যেমনটি বলেছি, আইনত বৈধতাই অবৈধতাকে ইঙ্গিত করে। রাষ্ট্র কী- এ সম্পর্কে শরীয়া একটি তত্ত্ব দিয়েছে আবার পাশাপাশি রাষ্ট্র কোন্ কাজটি করার জন্য সৃষ্টি হয়নি তারও ইঙ্গিত দিয়েছে। রাজনৈতিক বৈধতার আলোচনা থেকে যখন এ সমস্ত বিষয় বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন এ অবস্থা আরব রাষ্ট্রগুলোর

---

৩৭ দ্রষ্টব্য, যেমন, ইবনে তাইমিয়া, *সিয়াসাহ শার'ঈয়্যাহ* (ইসলামে ব্যক্তি পর্যায়ের এবং সরকারি আইন সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া), পৃ. ১৮৮

www.pathagar.com

অনিয়ন্ত্রিত স্বৈরাচারী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ক্ষমতাকে বিধ্বস্ত করে দেয়। অধিকাংশ আরব রাষ্ট্রে আইনের শাসন ও গণতন্ত্রমুখী শক্তিশালী আন্দোলনের পক্ষে খুব অল্প উদ্যোগের কারণ ব্যাখ্যা করতে এই বিষয়টি সাহায্য করবে (লেবানন সাম্প্রতিক সময়ে এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম)।

আরবী ভাষী দেশগুলোতে একমাত্র যে কথাটি কিছুটা টেকসই শক্তি অর্জন করতে পেরেছে সেটা হচ্ছে- এ সব দেশের জনগণ মনে করে তাদের ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতি শাসিত বা রাজা শাসিত সরকারগুলো ইসলামের শিক্ষা ত্যাগ করেছে। বইটির তৃতীয় অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হবে কিভাবে শরীয়াভিত্তিক এবং আইনের শাসনের প্রতি নিবেদিত একটি শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ইসলামিজমের বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়। এখন এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, স্বৈরতান্ত্রিক নির্বাহী ক্ষমতাকে প্রতিরোধে ইসলামপন্থীদের ভাষা ও তত্ত্ব শূন্য থেকে আসেনি; বরং রাজনীতি কেমন হওয়া উচিত- এ বিষয়ে নিবেদিত বিশ্বাস ও আদর্শ থেকেই এর উৎপত্তি হয়েছে।

সউদী ব্যতিক্রম

আরবী ভাষী দুনিয়ার একমাত্র ব্যতিক্রমী একটি উদাহরণ রয়েছে, যাকে নিঃসন্দেহে শাসনতান্ত্রিক বিপর্যয়ের সাধারণ তত্ত্বের যথার্থতা যাচাই করার জন্য ব্যবহার করা যায়। সেই উদাহরণটি হচ্ছে সউদী আরব। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের অল্প কয়েকটি দেশের অন্যতম দেশ, যেটি ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বীকৃতিযোগ্য একটি রূপ এখনও ধরে রেখেছে এবং এটি হচ্ছে একমাত্র আরব রাষ্ট্র যেখানে বর্তমানে আলেমদের মাধ্যমে নির্বাহীর ক্ষমতার এক ধরনের ভারসাম্য আনা হয়েছে।

তবে উপরের কথাটি এই দাবি করার জন্য বলছি না যে, সুন্নী মুসলিম বিশ্ব আরো ভাল চলত যদি সেটা সউদী আরবের এই ক্লাসিক্যাল ব্যবস্থা অনুসরণ করত। বস্তুত সউদী আরব অন্যদের জন্য কোন অর্থেই অনুকরণযোগ্য কোন মডেল নয়। এটি পশ্চিমা গণতন্ত্রের পথিকও নয়, আবার এটি শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অভিমুখী দেশ কিনা সেটাও স্পষ্ট নয়। এমন হওয়ার কারণ হচ্ছে- আমি যেটা বলতে চাচ্ছি- তেল থেকে প্রাপ্ত বিপুল রাজস্বের ফলে সে দেশে যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য ক্লাসিক্যাল শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রস্তুতিটি ছিল দুর্বল। তেল রাজস্বের ফলে সউদী রাষ্ট্রব্যবস্থা সউদী সমাজকে নজীরবিহীন উপায়ে প্রভাবিত করেছে। এ ছাড়া সউদী আরবের আলেমদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মূল্যবোধ দ্বারা সউদী রাষ্ট্র বা

www.pathagar.com

সমাজ জোরালো ভাবে প্রভাবিত। উল্লেখ্য, সমগ্র ইসলামের ইতিহাসে আলেমদের মূলধারার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সউদী আলেমদের মূল্যবোধ যথেষ্ট ভিন্ন। তথাপি সউদী আরবই এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছে যে, সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বে কিভাবে ভারসাম্যপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা কাজ করতে পারে এবং কিভাবে এই ক্ষমতা সউদী আরবকে অন্যান্য আরবী ভাষী দেশগুলো থেকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

সউদী আরবের ব্যতিক্রমী ইতিহাস পর্যালোচনা দিয়ে শুরু করা যায়।[৩৮] আরব উপদ্বীপের হিজায প্রদেশসহ- যেখানে মক্কা ও মদীনা নগরী অবস্থিত- কেবল পশ্চিম উপকূল এলাকা পর্যন্ত উসমানীয় শাসন বিস্তৃত ছিল। আরবের মধ্যাঞ্চল এবং পূর্ব উপকূল উসমানীয় শাসনাধীন ছিল না। এ অঞ্চলগুলো আঠার ও উনিশ শতকের অধিকাংশ সময় জুড়ে প্রথম ও দ্বিতীয় সউদী রাষ্ট্র দ্বারা শাসিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় আরবের উঁচু মালভূমিভিত্তিক এই সব প্রোটো স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল, যা নাজ্‌দ নামে পরিচিত, উসমানীয় সুলতান বা অন্য যে কারও জয় করার মত কোন স্থান ছিল না এবং প্রধানত এ কারণে এ সব অঞ্চল বহির্দেশীয় প্রভাব বা চাপমুক্ত ছিল।

উসমানীয়রা কেবল আরবের ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী ছিল। তবে এ ক্ষেত্রেও তারা বাধাপ্রাপ্ত হয় বিভিন্ন সময়; যেমন ১৮০২ সনে তারা বাধাপ্রাপ্ত হয় যখন প্রথম সউদী রাষ্ট্র নাজদ এলাকা থেকে এসে অভিযান চালিয়ে উসমানিয়া সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে মক্কা ও মদীনা দখল করে নেয়। এ অবস্থায় খলীফা এবং পবিত্র ভূমির রক্ষক হিসেবে উসমানীয় সুলতানের প্রতিশোধ নেয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তিনি সেনাবাহিনী পাঠান এবং ১৮১৮ সনে সেনাবাহিনী প্রথম সউদী রাষ্ট্রকে পরাজিত করে এর নেতৃত্বকে নির্বাসনে পাঠায়। এমন কি সুলতান সউদী রাষ্ট্রের রাজপুত্রকে ইসতাম্বুলে নিয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অবশ্য কয়েক বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় সউদী রাষ্ট্র প্রথমটির স্থান দখল করে। এবার এরা এদের শাসন কেবল কেন্দ্রীয় আরব অর্থাৎ নাজদ এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। এর ফলে এরা উসমানিয়া সাম্রাজ্যের আক্রমণের শিকার হওয়া থেকে বেঁচে যায়। তবে এরা উসমানীয়দের দ্বারা আক্রান্ত না হলেও ১৮৯১ সনে স্থানীয় গোত্রীয় প্রতিপক্ষের হাতে পরাস্ত হয়।

---

৩৮. মাদাবী আল-রাশিদ, *A History of Saudi Arabia* (ক্যামব্রিজ : ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০২), একেবারে প্রথম দিকের রাষ্ট্রগুলো সম্পর্কে জানতে দেখুন, পৃ. ১৪-৩৭

www.pathagar.com

উপরিউক্ত দু'টি সউদী রাষ্ট্র আধুনিক অর্থে পুরোপুরি রাষ্ট্র ছিল না। রাষ্ট্র বলতে আমরা এখন যে সমস্ত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাকে রাষ্ট্রযন্ত্রের অনুসঙ্গ হিসেবে এর সঙ্গে যুক্ত করি তার অধিকাংশই এ দুটো রাষ্ট্রে অনুপস্থিত ছিল। এরা কেবল অস্ত্রের বৈধ ব্যবহারকে এককভাবে কাজে লাগাতে বা ব্যবহার করতে আগ্রহী ছিল। দু'জন মহান ব্যক্তির মৈত্রীর মধ্য দিয়ে এ দু'টো রাষ্ট্রের সূচনা হয়েছিল ১৭৪৪ সনে। এ দু'জন ব্যক্তি হলেন সউদ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইবনে সউদ এবং আধুনিক ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম সর্বোচ্চ প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী। বস্তুত এ দু'জনের মধ্যকার সম্পর্ক সউদী আরবের পরবর্তী ইতিহাসের পথ পরিক্রমা তৈরি করে দেয়।

মুহাম্মাদ ইবনে সউদ ছিলেন একজন সক্ষম এবং যোগ্য গোত্রীয় সামরিক নেতা। তিনি অভিযান বা আক্রমণ চালানোর কাজে পারদর্শী ছিলেন এবং নিছক লুটপাট বা ধ্বংস করার চেয়ে অঞ্চল জয় করার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ছিলেন। তারপরও তিনি হয়ত ইতিহাসে একজন অস্পষ্ট এবং অপরিচিত ব্যক্তি হিসেবেই থেকে যেতেন যদি না তিনি তাঁর প্রয়োজনে তাঁর যোগ্যতাকে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদীর ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতেন। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে আচার, প্রথা ও সংস্কৃতির যে সমস্ত ভ্রান্ত বিষয় তৎকালীন সমাজে বিদ্যমান ছিল তা থেকে তিনি ইসলামকে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং এভাবে ইসলামকে সেই খাঁটি, নির্ভেজাল এবং পরিশুদ্ধ বিশ্বাস এবং আচরণের দিকে ফিরিয়ে নিতে উদ্যোগী ছিলেন যেটিকে তিনি মুহাম্মাদ স.-এর আনীত ইসলাম বলতে চেয়েছেন। যারা তাঁর এ সব ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেছে তারা ছিল তাঁর দৃষ্টিতে শত্রু এমন কি প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী। এদের মধ্যে ছিল শিয়া সম্প্রদায়, যাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব ইসলামের আলোক বঞ্চিত বলে মনে করতেন। তবে এদের মধ্যে গোঁড়া সুন্নী সম্প্রদায়ের লোকজনও ছিল যারা বিভিন্ন প্রথাগত আচরণ বা কাজের চর্চা করত; যেমন সুফিবাদ, বুযুর্গ ব্যক্তিদেরকে অতিভক্তি করা কিংবা সুন্নীদের বিখ্যাত পূর্বপুরুষদের কবর যিয়ারত করা ইত্যাদি। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাবের দৃষ্টিতে এ ধরনের আচরণে জড়িত থাকার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হক বা চির সত্যের স্থলে পার্থিব বিষয়কে প্রতিস্থাপিত করা। এমন কি তাঁর মতে রাসূলুল্লাহ স.-এর জন্মদিন পালনের মতো প্রাচীন প্রচলন উদ্‌যাপন করাও আল্লাহর ইবাদতের স্থলে রাসূলুল্লাহ স.-এর ইবাদত করার শামিল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়। যা হোক, মুহাম্মাদ ইবনে

www.pathagar.com

আব্দুল ওয়াহ্হাব এরূপ ব্যাখ্যার পথ ধরে মুহাম্মাদ ইবনে সউদের নেতৃত্বে তাঁর শাসনাধীন অঞ্চলে আল্লাহর একত্ববাদ ঠিক রাখার জন্য বিভিন্ন সমাধিসৌধ ধ্বংস করে ফেলা হয় এবং প্রচলিত বিভিন্ন আচার ও প্রথা নিশ্চিহ্ন করা হয়।

যখন এ সব ঘটনা ঘটছিল, এই সংস্কার কাজের স্পৃহা ও আগ্রহ এ সব প্রোটো রাষ্ট্র তথা আধা রাষ্ট্রশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং বৈধতাদানে এগিয়ে আসে। এ ধরনের গভীর স্পৃহা বা আগ্রহই এ সব রাষ্ট্রকে জীবনীশক্তি জোগাচ্ছিল। কেবল ক্ষণস্থায়ী ভূমি দখল এবং ক্ষণস্থায়ী সংস্কারকর্মের ধারা সৃষ্টির স্থলে ওয়াহ্হাবী মতবাদ এবং সউদী রাজনৈতিক-সামরিক শক্তির শক্তিশালী মিশ্রণ টেকসই সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। যা হোক, এ অবস্থায় যখন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব এবং মুহাম্মাদ ইবনে সউদ মারা যান দু'জনই এমন দু'টি পরিবার রেখে যান যারা আলেম এবং রাজপুত্র তথা রাজনৈতিক ক্ষমতাশালীদের সমন্বয়ে গঠিত এই অংশীদারি ব্যবস্থায় তাদের বিশেষ ভূমিকা আগের মতই অব্যাহত রাখতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। বস্তুত এভাবে এ দু'জন ব্যক্তিত্বের ক্যারিশমা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কে পরিণত হয়। সউদের পরিবার এবং শায়খের পরিবারের (মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাবের পরিবার এভাবেই পরিচিত ছিল) মধ্যকার সম্পর্ক উপরে বর্ণিত দু'টো সউদী রাষ্ট্রের নির্যাসকেই টিকিয়ে রাখে এবং পরিণতিতে এগুলো আধুনিক সউদী আরবের নেপথ্য বৈধতার শক্তিতে পরিণত হয়।

আধুনিক সউদী আরবের শুরু মূলত ১৯০২ সনে যখন আব্দুল আযীয ইবনে সউদ রিয়াদ পুনর্দখল করেন এবং মধ্য নাজদ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই ইবনে সউদ (যিনি তাঁর পূর্বসূরী মুহাম্মদ ইবনে সউদের চেয়ে বেশি পরিচিতি পেয়েছেন) ১৯২৫ সনে প্রথম বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে পা রাখেন যখন তিনি রাজা হুসাইন ইবনে আলীকে পরাজিত করে মক্কা ও মদীনা নগরীসহ পশ্চিমাঞ্চলীয় হিজায প্রদেশ জয় করেন।

সে সময় ইবনে সউদ বিশ্ব পরিমণ্ডলে তেমন পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু মক্কার শরীফ হিসেবে হুসাইন ইবনে আলী সে সময় পৃথিবীব্যাপী পরিচিত ছিলেন। তিনি আরব বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যে বিদ্রোহকে তরান্বিত ও ব্যবহার করেছিলেন টি. ই. লরেন্স। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হুসাইন প্রথম মহাযুদ্ধে উসমানীয়দের বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করে ব্রিটিশদের বন্ধুত্ব অর্জন করেছিলেন। বিনিময়ে উসমানীয়দের পরাজয়ের পর ব্রিটিশ রাজ শরীফ হুসাইনের পরিবারকে ইরাক, সিরিয়া, হিজায এবং ট্রান্সজর্ডানের রাজত্ব প্রদান করে। খ্রিস্টিয় ১৯২৪ সনে ইস্তাম্বুলে কামাল পাশার খিলাফত ব্যবস্থা

www.pathagar.com

বিলুপ্ত করার ঠিক দু'দিন পর সমগ্র মুসলিম বিশ্বের উপর কর্তৃত্বসহ হুসাইন নিজেকে মুসলিম বিশ্বের খলীফা হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে ইবনে সউদের হাতে পরাজিত হয়ে হুসাইন উপরে বর্ণিত বিশাল ভূখণ্ড দূরে থাক হিজাযেরও নেতৃত্ব ধরে রাখতে পারেননি।

এভাবে প্রতীকীভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভূখণ্ডের সমন্বয়ে আধুনিক সউদী রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। এ সব ভূখণ্ড মূলত সাবেক উসমানিয়া সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, যা সউদী রাষ্ট্রশক্তি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে সউদী আরব যদিও সাবেক উসমানিয়া সাম্রাজ্যের অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল, তবুও এটি উসমানিয়া সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক আদর্শ গ্রহণ না করে স্বতন্ত্র ধারায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। একইভাবে এটি কখনো বিদেশী শক্তির প্রভাবাধীন ছিল না, যা মূলত উপনিবেশেরই নামান্তর। এই ইতিহাস, যা গড়ে ওঠেছিল পূর্বতন দু'টি সউদী রাষ্ট্রের নির্বাহী এবং আলেমদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ঐতিহ্যের সমন্বয়ে, এমন এক ধরনের সরকারের উত্থানে সহায়তা করে যা এ অঞ্চলের অন্যত্র যে ধরনের সরকার এসেছে সেগুলো থেকে একেবারেই ভিন্ন।[৩৯]

একটি কারণে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সউদী আরব কখনো লিখিত সংবিধান গ্রহণ করেনি। এই ব্যাপারটি ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সউদী আরবের বর্তমান শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক ধরনের সাদৃশ্যকে তুলে ধরে। আলেমসমাজ যেভাবে শরীয়াকে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন ঠিক সেভাবে শরীয়াকে বাস্তবে রূপায়িত করার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের মধ্যেই ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব নিহিত- এ কথা স্পষ্ট করতে ক্লাসিক্যাল শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন ছিল না। সউদী আরবে আলেমসমাজই সর্বদা লিখিত শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করে এসেছেন। কেননা তারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, এ ধরনের উদ্যোগ তাদের গুরুত্বকেই কেবল কমিয়ে দিতে পারে। এমন কি তারা এমনও উপলব্ধি করেছেন যে, যদি এ ধরনের দলিল কেবল এ কথা ঘোষণা করার জন্যও তৈরি করা হয় যে, শরীয়াই হচ্ছে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ; এ ধরনের ঘোষণাই এমন একটি ধারণা দিতে পারে যে, এ ধরনের ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন ছিল বা প্রয়োজন

---

৩৯. সউদী আইনি এবং শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে দেখুন ফ্রাঙ্ক ভোগেল (Frank Vogel), *Islamic Law and Legal System : Studies of Saudi Arabia,* (লেইডেন : ই. জে. ব্রিল, ২০০০)

www.pathagar.com

রয়েছে। ফলে এভাবে ঘোষণাদানের ব্যাপারটি আল্লাহর আইনের শ্রেষ্ঠত্বের পূর্বানুমানকে খাটো করে দিবে।[৪০]

আরেকটি কারণ উল্লেখ করা যায়। যদিও সউদী বাদশাহ কখনো নিজেকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা করেননি, তাঁর কর্তৃত্বের ভিত্তি যে শরীয়া কর্তৃক নির্দেশিত 'সৎকাজের আদেশ এবং মন্দকাজে নিষেধ করার' বাধ্যবাধকতা পূরণ করার মধ্যেই নিহিত সেটা সকলেই বুঝে। এ থেকে এটা বুঝা যায় যে, বাদশাহর আইন প্রণয়নের কর্তৃত্ব নেই; আবার আইনসভার মত কোন সংস্থাও সে দেশে নেই। সঠিকভাবে বললে বলতে হয়, আলেমগণ তাদের বিধি-বিধান ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশকে যেভাবে বুঝেছেন তাই হচ্ছে এখানে আইন। তবে বাদশাহ অবশ্যই প্রশাসনিক বিধি জারি করতে পারেন, যেমনটি ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ইতিহাসের ধারায় সর্বদাই প্রচলিত ছিল। সউদী আরব যে পর্যায় পর্যন্ত আইনকে সূত্রবদ্ধ করেছে সেগুলো সবই হচ্ছে রাজকীয় বিধিবিধান যা শরীয়ার সাথে সাংঘর্ষিকও নয় বা সেগুলো শরীয়ার স্থানও দখল করেনি। সউদী আরবে খোদ শরীয়াকে আইনের মত সূত্রবদ্ধ করা হয়নি এবং বর্তমানে সেখানে যে ধরনের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে তাতে আলেমদেরকে তাদের উপযুক্ত স্থান থেকে বিচ্যুত না করে একে সূত্রবদ্ধ করাও সম্ভব নয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে বলতে গেলে, সউদী আরবে আলেমসমাজ রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে স্বাধীন। যদিও তেল রাজস্ব দ্বারা প্রাপ্ত সহযোগিতা বা সাপোর্ট নানাভাবে এই স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে, তবু এ কথা সত্য যে, আলেমসমাজ সরকারের নিয়োগপ্রাপ্তও নয় বা তার হাতে নিয়ন্ত্রিতও নয়। কাজেই তাদেরকে স্বাধীন বলা যায়। আলেম হিসেবে যে যোগ্যতা থাকতে হয় সে যোগ্যতাই তাদের আলেমসমাজে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপায়। এই যোগ্যতা স্বনিয়ন্ত্রিত এবং সেটা শুধু রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ডিগ্রি অর্জন করতে হয় বলে নয় বরং আলেমসমাজের অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন এবং পাশাপাশি আরো জ্যেষ্ঠ মুফতিগণের কাছ থেকে ফতওয়া দানের আনুষ্ঠানিক অনুমতিপ্রাপ্তিও এর জন্য জরুরি। যদিও সউদী আরব গ্রান্ড মুফতির পদটিকে এবং তাঁর দায়িত্বকে স্বীকৃতি দেয়; তবে এ পদে রাষ্ট্র যাকে নিয়োগ দেবে তার আলেম হিসেবে সুখ্যাতি বা ব্যাপক পরিচিতির পূর্বশর্তের বিষয়টি এ পদে নিয়োগদানের ব্যাপারে

---

৪০. আব্দুল আযীয এইচ আল-ফাহাদ, 'Ornamental Constitutionalism : The Saudi Basic Law of Governance', *Yale Journal of International Law*, সংখ্যা-৩০, (২০০৫), পৃ. ৩৭৫

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের সামনে এক ধরনের সীমারেখা টেনে দেয়। তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর ফতওয়ার জরুরি বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে অন্যান্য মুফতির চেয়ে গ্রান্ড মুফতির কর্তৃত্ব বেশি নয়।

যা হোক, সউদী আরবে যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমদের মধ্য থেকে বিচারক বাছাই ও নিয়োগ দেয়া হয় এবং এভাবে আইনের বিষয়বস্তুর উপর আলেমদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার ঐতিহ্যবাহী ম্যাকানিজম বা ব্যবস্থা সেখানে সীমিত আকারে হলেও ধরে রাখা হয়েছে। বিচারিক সেবা (Judicial services) সম্পর্কে আলেমসমাজের সত্যাসত্য খুঁটিয়ে দেখার ঐতিহ্যও সে দেশে স্মরণ রাখা হয়েছে; যদিও এটা বলা সম্ভব যে, এই রীতি ভঙ্গ করাই সেখানে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে; কেননা এ ধরনের সরকারি সার্ভিসের জন্য সে দেশে এখন এমন সম্মানী দেয়া হয় যা তেল রাজস্বের স্রোত শুরু হবার আগে কল্পনাও করা যেত না।

শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আলেমদের অবস্থানকে মজবুত করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দিকটি সউদী আরবে লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে যে, তারা শরীয়ার রক্ষক হিসেবে এবং রাষ্ট্রের বৈধতা দান কিংবা বৈধতা ফিরিয়ে নেয়ার যথাযথ কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সামাজিক শ্রেণী হিসেবে নিজেদের পরিচয় ধরে রেখেছে। সে দেশে রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্তের যথার্থতা ফতওয়ার মাধ্যমে নিষ্পন্ন হতে হয়। সম্ভবত এ ধরনের ফতওয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনাটি হচ্ছে ১৯৯১ সনে কুয়েত থেকে সাদ্দাম হুসেনকে হটানোর জন্য আমেরিকার যুদ্ধের সময় সউদী ভূমিতে আমেরিকান সেনা মোতায়েনের কর্তৃত্ব প্রদান সংক্রান্ত ফতওয়া, যা মরহুম গ্রান্ড মুফতি আব্দুল আযিয বিন বাযসহ একটি কমিটি জারি করেছিল। এই ফতওয়া বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিল এ কারণে যে, উসামা বিন লাদেন তাঁর জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাদানের মাধ্যমে সরাসরি একে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।[৪১] তাঁর নিজের ভাষায় যদি দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে, এই ফতওয়াটি শাসকদের এই অনুভূতিকে প্রতিফলিত করেছিল যে, যদি আলেমদেরকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের বৈধতাদানের কাজ

---

৪১. ফতওয়ার লিখিত বক্তব্য এবং জটিল ও ঐতিহাসিক ভিত্তিতে কৃত বিশ্লেষণ দেখার জন্য দ্রষ্টব্য আব্দুল আযিয এইচ আল ফাহাদ, 'From Exclusivism to Accommodation : Doctrinal and Legal Evolution of Wahhabism' *NYU Law Review* : 79, সংখ্যা ৪৮৫ (২০০৪): ৫১৫-১৯। বিন লাদেনের প্রতিক্রিয়া জানতে দেখুন (অনুবাদ) *Messages to the World : The Statements of Usama Bin Laden,* সম্পাদনা ব্রুস লরেন্স (Bruce Lawrence) (নিউইয়র্ক : ভারসো, ২০০৫), পৃ. ৪-১৪

www.pathagar.com

থেকে বিচ্যুত না করতে হয়, তাহলে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত যাবতীয় মৌলিক সিদ্ধান্তেরও আলেম কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যথার্থতা যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যাবে না।

সউদী আরবে আলেমদের ক্ষমতার আরো গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ দেখা যাবে সে সব অভ্যন্তরীণ নীতি-নির্ধারণী বিষয়ের ক্ষেত্রে, যেগুলো আলেমদের মতে শরীয়ার সাথে সম্পর্কিত। যেমন, ইবনে সউদ নিজে দেশে ওয়ারলেস চালু করার বিষয়ে আলেমদের অনুমতি অর্থাৎ মতামত চেয়েছিলেন, যেহেতু এ ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে ছিল না।[৪২] সাম্প্রতিক সময়ে সউদী আরবে মহিলাদের গাড়ি চালানোর অনুমোদন দেয়ার বিষয়ে আলেমসমাজ কার্যকর ও তীব্র ভাবে বাধা দিয়ে আসছে।[৪৩] এটি এমন একটি বিষয় যা সরকারের জন্য বহির্বিশ্বে যথেষ্ট বিব্রতকর অবস্থা সৃষ্টি করেছে; সম্ভবত শাসক কর্তৃপক্ষ এই অবস্থা দূর করতে খুবই আগ্রহী। তবে বাস্তবে আলেমদের থেকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সম্মতি পাওয়ার দৃশ্যত সম্ভাবনা নেই।

ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রে শাসকের অবস্থান আলেমদের প্রেক্ষিতে, যাদেরকে নিয়ে শাসক কাজ করতেন, যে পর্যায়ে ছিল তার চেয়ে সমসাময়িক সউদী আরবে কিছু সুনির্দিষ্ট উপায়ে আলেমদের প্রেক্ষিতে শাসকের অবস্থান দুর্বল হয়ে থাকতে পারে। শায়খের আবাসস্থল কেবল ভূতাপেক্ষ বৈধতাদানকারী ছিল না বরং এটি ঠিক সেই শক্তিরই অংশ ছিল যা প্রথম সউদের পরিবারকে ক্ষমতায় আসীন করেছিল। বস্তুত সউদী আলেমগণ আলেমের চেয়েও বেশি কিছু। তারা সক্রিয় এবং সউদ পরিবারের দৃশ্যত গোত্রীয় মিত্র। আর এভাবে তারা কিছুটা দুর্বল বা গুরুত্বহীনভাবে হলেও মূলত শাসক শ্রেণীরই অংশ। যদি কখনো বলা হয় যে, সাত হাজার প্রিন্সসহ সউদী রাজ পরিবারকে অবশ্যই একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে গণ্য করতে হবে, তবে আলেম শ্রেণীকে- যারা মূলত সউদী রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান ঠিক রাখার

---

৪২. দ্রষ্টব্য জন এস. হাবিব, *Ibn Sa'ud's Warriors of Islam : The Ikhwan of Najd and Their Role in the Creation of Sa'udi Kingdom, 1910-1930* (লেইডেন : ই. জে. ব্রিল,১৯৭৮), পৃ. ১২২-২৩; যদিও পূর্ব নজীর না থাকায় আলেমগণ মন্তব্য প্রদানে অনিচ্ছুক ছিলেন ইবনে সউদ অতিরিক্ত সতর্কতা স্বরূপ 'সউদী আরবের কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে রেডিও এবং টেলিগ্রাফ ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিলেন'। (পৃ. ১২৩)

৪৩. নারী গাড়ি চালকের চলাফেরা এবং প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানতে দেখুন আল-রাশিদ (Al Rasheed), *A History of Saudi Arabia,* পৃ. ১৬৬-৬৮, আল-ফাহাদ (Al Fahad), 'Ornamental Constitutionalism', পৃ. ৩৮৩

www.pathagar.com

কাজে নিবেদিত একটি বিশেষ বুদ্ধিজীবী ও প্রচার বিশারদ গোষ্ঠী- যৌক্তিকভাবেই সে দলের একটি বাড়তি অংশ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

আর এটি কেমন রাষ্ট্র? ইবনে সউদ এবং তাঁর বংশধরদের ইতিহাস যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং অসাধারণ ছিল না; তবে সউদী আরব পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠিত তেল রিজার্ভের দেশ হিসেবে অনন্য সাধারণ।[৪৪] এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, তেলের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইবনে সউদ আরব উপদ্বীপের উপর প্রাধান্য সৃষ্টি করতে চাননি। পারস্য উপসাগরের অন্যান্য রাজ্যের প্রথম শাসকদের মত, যাদের সকলেরই এখন ঐ অঞ্চলের তেল সম্পদে অংশ রয়েছে, ইবনে সউদও অঞ্চল জয় করার ফলে কী ধরনের অসাধারণ সম্পদ হাতে আসতে পারে তা না জেনেই তাঁর নিজের প্রয়োজনে বিভিন্ন অঞ্চল জয় করেছেন। তবে বিংশ শতাব্দীর পথ পরিক্রমায় যখন বিপুল পরিমাণে সহজলভ্য তেল আবিষ্কৃত হতে থাকে এবং যখন দ্রুত বিকাশমান বিশ্ব অর্থনীতির জন্য ক্রমবর্ধমান হারে তেলের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সউদী আরব বাস্তবিকপক্ষে অস্বাভাবিক হারে মাথাপিছু রাজস্ব আদায়ে সক্ষম ছিল। উপরন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে রক ফেলারের মত কিছু ব্যক্তি বিশেষ তেল ধনকুবের ছিল, সেখানে সউদী আরবে সব সময় তেল সম্পদ একমাত্র রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা হতো, কোন ব্যক্তি বিশেষের তহবিলে নয়।

যদিও নিজেদের বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সউদ পরিবার এ সম্পদকে যথেচ্ছভাবে খরচ করছে, পাশাপাশি রাষ্ট্রের খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাজস্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সউদী আরবের রাষ্ট্র ক্ষমতাকে সংহত করার কাজেও ব্যয় করা হচ্ছে। অবকাঠামো ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও এ ব্যয় প্রসারিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ব্যাপকভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মাণ যেখানে সরাসরি সরকারের কাছ থেকে কিংবা রাজ পরিবারের কোন সদস্যের কাছ থেকে তহবিল এসেছে; যারা সউদী সমাজের একটি বিরাট অংশকে সমষ্টিগতভাবে কর্মে নিয়োগ দিয়েছে। বলা বাহুল্য, এ ধরনের একটি নির্মিত কাঠামো, যা সরকারের সাথে সাথে অর্থনীতি এবং সমাজের সমন্বয়ে গঠিত, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের উঠা-নামার দ্বারা প্রভাবিত হয়। যখন তেলের দাম পড়ে যায়, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় তহবিলের উপর যারা নির্ভরশীল তাদের প্রত্যেকেই সংকট অনুভব করে। আবার যখন তেলের দাম বেড়ে যায়, তখন

---

৪৪. র‍্যাচেল ব্রুনসন (Rachel Bronson), *Thicker Than Oil : America's Uneasy Partnership with Saudi Arabia,* (অক্সফোড : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৬)

www.pathagar.com

রাষ্ট্র সউদী সমাজের লোকজনের প্রাত্যহিক কাজকর্মের উপর প্রভাব খাটায়, যা সম্ভবত পৃথিবীর অন্য যে কোন রাষ্ট্র থেকে ব্যতিক্রম। বস্তুত অন্য কোন রাষ্ট্রের সঙ্গেই এ ব্যাপারটি মিলবে না।

সউদী আরবে আলেমসমাজ উপরিউক্ত ধরনের প্রভাব থেকে কোনভাবেই মুক্ত নয়। সরকারি পদে কর্মরত আলেম বা ইসলামী পণ্ডিতগণ সরকার থেকে বেতন লাভ করেন, যেমনটি ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের পুরো সময় আলেমগণ পেয়ে এসেছেন। যে সব আলেম নাম কা ওয়াস্তে সরকারের বাইরে রয়েছেন, তারাও বেতন আকারে আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকেন। তবে তারা এ আর্থিক সহায়তা কার্যত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়ে থাকেন। যে কোন মুহূর্তে রাষ্ট্র যে কোন নির্ধারিত আলেমের সম্পদ পূর্বের চেয়ে অকল্পনীয় পর্যায়ে বৃদ্ধি করতে পারে। আবার একইভাবে হুঁশিয়ারি হিসেবে রাষ্ট্র আলেমদের পদাবনতি ঘটাতে পারে, যাদের দৃষ্টিভঙ্গি সরকারের পছন্দনীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেকটাই ভিন্ন, এমন কি তাদেরকে কারাগারে বন্দীও করে রাখতে পারে।

কেউ মনে করতে পারে, আলেম শ্রেণীর জন্য রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতা আলেমদের সেই ঐতিহ্যবাহী স্বাধীন ভূমিকা কেড়ে নিয়ে থাকবে, যে ভূমিকা ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতন্ত্রের সউদী সংস্করণের আওতায় তারা পালন করত। সউদী আলেম শ্রেণীর কিছু কিছু সমালোচক- উসামা বিন লাদেন তাদের অন্যতম- জোর দিয়ে এ কথা বলেন যে, গ্রান্ড মুফতী বা তাঁর সহযোগীদের সময় সময় দেয়া মধ্যম ধরনের রায় বা মন্তব্য রাষ্ট্রের প্রভাব থেকে তারা যে মুক্ত নয় তারই প্রতিফলন ঘটায়। এ দাবি আরো বহুদূর পর্যন্ত যায়। অনেক ক্ষেত্রেই সউদী সরকার আলেমদের প্রভাব একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনতে অথবা অন্তত কিছু কমিয়ে আনতে পারলে খুশী হবে। তবে শুরুতে যে রকম হয়েছিল পরবর্তী সময়ে আলেমদেরকে দুর্নীতিগ্রস্ত করা বা উৎকোচ দেয়া আরো বেশি সূক্ষ্ম এবং জটিল প্রকৃতির হয়ে যায়। বস্তুত সউদী আরবে আলেমসমাজ কোন না কোনভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে জড়িত। কাজেই তাদেরকে প্রান্তিকীকরণ করা তথা এক প্রান্তে ঠেলে দেয়া রাষ্ট্রের জন্য কঠিন এবং রাজতন্ত্রের আইনি বৈধতা আলেমদের সাথে তাদের ঐতিহাসিক সম্পর্কের সঙ্গে এমন গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত যে, তাদেরকে অবশ্যই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ক্লাসিক্যাল শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে সউদী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে বিরাট মৌলিক পার্থক্য রয়েছে সেটি শাসক ও আলেমদের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয়

www.pathagar.com

সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয় বরং শাসক-আলেম-শাসিত; এই তিন পক্ষকে পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত করে যে ত্রিপক্ষীয় সম্পর্ক গড়ে ওঠেছে তাকে কেন্দ্র করে এই পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। ক্লাসিক্যাল ব্যবস্থায়, আমি আগে যেমনটি বলে এসেছি, করারোপ করার প্রয়োজন বা আবশ্যকতা শাসকদের নিজেদের আইনি বৈধতা প্রতিষ্ঠা এবং তা ধরে রাখার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। সউদী আরবের তেলভিত্তিক রাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের নিজের কার্যকারিতার জন্য যতটুকু রাজস্ব সংগ্রহ করা প্রয়োজন ততটুকু সংগ্রহ করার ক্ষমতার সাথে অন্তত সাধারণ নাগরিকদের উপর কর ধার্য করার বিষয়টির কোন সম্পর্ক নেই। সরকার পরিচালনার প্রয়োজন মেটাতে অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে নাগরিকদের থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করার চেয়ে বরং রাষ্ট্র তেল সম্পদের প্রাচুর্যের উপরই নির্ভর করতে পারে।[৪৫]

ফলে রাষ্ট্রের নিজ নাগরিকদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলার প্রয়োজন হয় না, যার মাধ্যমে নাগরিকরা তাদের পকেটবই খোলার এবং এমন এক সরকারের কাছে তাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফসল তুলে দিতে প্রস্তুত হবে, যে সরকার বিনিময়ে তাদেরকে সেবা দান করবে। যে রাষ্ট্রে নাগরিকদের সম্পদ থেকে রাজস্ব আসে না, বরং তা আসে রাষ্ট্রের স্বাধীন সম্পদের ভিত্তি থেকে, সেখানে নাগরিকরা সরকার যাই দেয় তাকেই গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এটাই স্বাভাবিক, যতক্ষণ না আরো ভাল কিছু তাদের সামনে উপস্থিত হয়। সেটা হবার জন্য হয় বর্তমান সরকারকে অবশ্যই এত বেশি নির্যাতন ও নিবর্তনমূলক হতে হবে যে, অন্য বিকল্পটিকে কাঙ্ক্ষিত বলে মনে হতে শুরু করবে; অথবা সরকারের বহির্ভূত কোন আদর্শবাদী শক্তিকে অবশ্যই এতখানি শক্তিশালী হতে হবে যে, ঐ শক্তি নাগরিকদের মনে সরকারের আইনত বৈধভাবে শাসন করার অধিকার নিয়ে বিরোধিতা করার শক্তি জাগিয়ে দিবে।[৪৬]

---

৪৫. তেল সম্পদ এবং গণতন্ত্রায়ণ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য রচনা রয়েছে যা তথাকথিত সম্পদের অভিশাপ সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন, মিশেল রস (Michael Ross), 'Does Oil Hinder Democracy?' *World Politics*, সংখ্যা : ৫৩ (২০০১), পৃ. ৩২৫-৬১

৪৬. তেল সমৃদ্ধ রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিপ্লব সংগঠনের আধুনিক ইতিহাসে ইরান হচ্ছে একটি উদাহরণ। এ বিষয়ে আমি পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করব। এখন আমাদের প্রয়োজনে এটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, ১৯৭৯ সনের ইরানী বিপ্লব এই উভয় ধরনের উপাদানের ধারক ছিল এবং সউদী রাজ পরিবারের মন থেকে ইরানের শাহের পতনের স্মৃতি কখনোই খুব দূরে ছিল না এবং এখনও দূরে নয়। তবে ইরানে যেমন ছিল সউদী আরবে

www.pathagar.com

ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর সাথে তুলনামূলক বিচারে সউদী আরবের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোকে বুঝতে হলে যে ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে, সউদী শাসকদের বিরুদ্ধে গণমুখী কোন আন্দোলন তাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান বা বিপ্লব ঘটাবে- তেল সম্পদ এই ভয় তাদের মন থেকে অনেকখানি কমিয়ে দিয়েছে। তবে এ কথার অর্থ এই নয় যে, শাসকবর্গকে কখনো ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না, বিশেষত রাজকীয় পরিবারের কোন সদস্য দ্বারাও তা হবে না- এ রকম পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে আছে। যেমনটি ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান ছিল এখানেও আলেমসমাজকে অবশ্যই যথাযথভাবে নিজেদের পক্ষে রাখতে হবে, যেন তারা সিংহাসনের অন্যান্য দাবিদারকে প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে সমর্থন না করে। কিন্তু শাসকের যে গণমুখী বৈধতা প্রয়োজন, আলেম শ্রেণী যে বৈধতা রক্ষার ব্যাপারে ঐতিহ্যগতভাবে সহযোগিতা করে এসেছে, সে বৈধতা এমন এক রাষ্ট্রে, যেখানে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের থেকে করের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ করার পরিবর্তে ঐ সম্পদকে তার নাগরিকদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়, খুব একটা গুরুত্ব বহন করে না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রে আলেমদের আইনের শাসনকে সুরক্ষা দেয়ার যতটুকু ক্ষমতা ছিল, সমসাময়িক সউদী আরবে তাদের সে ক্ষমতা নেই; তার চেয়ে তাদের ক্ষমতা অনেক দুর্বল। পার্থক্যটি হচ্ছে, যে রাষ্ট্রে এত বিপুল তেল সম্পদ নেই সেখানে শাসকদের জন্য আলেমদের যতটা প্রয়োজন হতো বা তারা তাদের জন্য যতটুকু উপকারী হতো এখন সউদী আরবে আলেমগণ তাদের কাছে তার চেয়ে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ এবং কম প্রয়োজনীয়। (যেহেতু সউদী আরবে বিপুল তেল সম্পদ রয়েছে এবং তারা সেগুলো জনগণের জন্য ব্যয় করে) তবু এ কথা সত্য যে, আলেমগণ বর্তমানে সউদী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী-বাস্তবিকভাবে

সেরূপ কোন বৃহৎ এবং আত্মবিশ্বাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেই। যদি থাকত তবে হয়ত তারা জাতির এত বিপুল সম্পদ রাজ পরিবারকে ভোগ করতে দেখে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে যেত। তা ছাড়া সউদী সরকার এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে যথেষ্ট কাজ করেছে যে, সে দেশের জনগণের দরিদ্রতম অংশটি যেন এরূপ মরিয়া হয়ে উঠতে প্রেরণা খুঁজে না পায় যেরূপ অবশ্য ইরানী নিম্নবিত্ত শ্রেণী অনুভব করেছিল এবং যে কারণে তারা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। উপরন্তু শাহের অধীন ইরানে যেমন ছিল তার বিপরীতে সউদী সরকার ধর্মীয় পণ্ডিতদেরকে তার কাছাকাছি ও ঘনিষ্ঠ হিসেবে ধরে রাখার জন্য তার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব সবটুকুই করেছে।

www.pathagar.com

অন্য যে কোন সুন্নী রাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশি অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী হিসেবে অবস্থান করছেন। তারা সে দেশে দৃশ্যত নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করে চলেছেন; যদিও তাদেরকে অর্থ দিয়ে কিনে ফেলার বিপুল ক্ষমতা রাষ্ট্রের রয়েছে। আলেমদের এরূপ স্বাধীনতা রক্ষা করে চলতে পারার কারণ হচ্ছে সউদী রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব লাভের সময় এর আইনি বৈধতা এবং এর অস্তিত্বের যৌক্তিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারা শাসকদের প্রায় সমান অংশীদার হিসেবে স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবে যেহেতু বর্তমান প্রেক্ষাপটে সে দেশে শাসকদের জন্য গণমুখী এবং গণভিত্তিক বৈধতার তেমন প্রয়োজন নেই, সেহেতু সে দেশে আলেম শ্রেণীর এ ধরনের বৈধতাদানের ব্যাপারে সাহায্য করার যে ঐতিহ্যবাহী ক্ষমতা ছিল তার ততটুকু প্রভাব নেই যতটুকু প্রভাব থাকলে সেটি তেল সম্পদের নেতিবাচক প্রভাবকে দূরীভূত করতে পারত।

ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় সউদী আরবের বর্তমান শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হচ্ছে বিকৃত আয়নায় প্রতিবিম্বিত একটি ছবির মত। পরিচিত সব ধরনের উপাদানই এখানে বিদ্যমান, কিন্তু সেগুলোর আকার, অবস্থান এবং আন্তঃসম্পর্ক ইত্যাদি সব কিছু তেল সম্পদের প্রভাবে বিকৃত ও আক্রান্ত হয়ে আছে। এ অর্থে সউদী আরব এমন কোন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা উপস্থাপন করতে পারেনি, যেমনটি বাস্তবে হতে পারত। বরং সেখানে যা ঘটেছে সেটি হচ্ছে আধুনিক যুগের চাহিদার সাথে সুন্দরভাবে খাপ খায় এমন নতুন কোন শাসনতান্ত্রিক কাঠামো প্রতিস্থাপন করার পরিবর্তে মৌলিকভাবে নতুন একটি পরিবেশ-পরিস্থিতিতে পুরনো ঐতিহ্যগত শাসনতান্ত্রিক কাঠামোটিই কার্যকর রয়ে গেছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
নতুন ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার উত্থান

আধুনিকতাবাদী ভাবাদর্শ হিসেবে ইসলামিজম

ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রের পতনের সাথে সম্পর্কিত একটি বিশেষ তথ্য হচ্ছে এ ধরনের রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা, এ ধরনের রাষ্ট্রের প্রতি আগ্রহী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দল এবং এ ধরনের রাষ্ট্রের ধ্বংসের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত যে গোষ্ঠীটি অর্থাৎ আলেমসমাজ, তারা কখনো এর জন্য এমন কোন সংগ্রাম করেনি যা শাসনতান্ত্রিক যে বিপর্যয় ঘটছিল সে দিকে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারত। পাশাপাশি এটাও উল্লেখযোগ্য যে, শিয়া বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম ছাড়া কোথাও পুরনো ঐতিহ্যবাহী ইসলামী ব্যবস্থা এবং সেখানে আলেমদের ঐতিহ্যবাহী অবস্থান পুনরুদ্ধারের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তনের ডাক আলেমসমাজের নেতৃত্বে আসেনি। বরং সুন্নী মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইন দ্বারা পরিচালিত নতুন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ডাক এসেছে ইসলামিজম নামে পরিচিত রাজনৈতিক-ধর্মীয় আন্দোলনের মাধ্যমে।

মূলধারার সবচেয়ে প্রভাবশালী এ ধরনের ইসলামপন্থী সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমুন বা মুসলিম ব্রাদারহুড ১৯২৮ সনে মিসরে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এখন বিভিন্ন ধরনের ইসলামপন্থী আন্দোলনকারী সংগঠন মরক্কো এবং আলজেরিয়া থেকে শুরু করে ফিলিস্তিন হয়ে জর্ডান, লেবানন, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, এমন কি পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অন্যতম প্রধান সংগঠন হিসেবে কাজ করছে। তবে আধুনিক যুগের ইসলামপন্থী আন্দোলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বগণ প্রায় কখনোই প্রশিক্ষিত আলেম ছিলেন না বা এখনও নন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা হলেন পশ্চিমা মানবিক বা বিজ্ঞান শাখায় শিক্ষিত মুসলিম[১], যারা বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে গভীর হতাশাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করার যথাযথ ভাষা এবং কিভাবে এ ব্যবস্থাকে সংস্কার করা উচিত সে বিষয়ে ইসলামে শক্তিশালী ও তাৎপর্যপূর্ণ ধারণা খুঁজে পেয়েছেন।

---

১. এ বিষয়টি পাঁচ খণ্ড বিশিষ্ট Fundamentalism Project-এ আলোচিত হয়েছে; সম্পাদনা : মার্টিন ই মার্টি এবং আর স্কট এ্যপলবি, (শিকাগো : ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, ১৯৯১-৯৫)

www.pathagar.com

সুন্নী আলেমগণ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কেন উল্লেখযোগ্য এবং টেকসই কোন আন্দোলন গড়ে তোলেননি সেটা একটি প্রশ্ন। বিশেষত তখন, যখন তাদেরই সমসাময়িক শিয়া আলেমগণ কেবল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ডাকই দেননি তারা ইরানে এ ধরনের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাও করেছেন। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে যে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় রাখতে হবে, সে দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আধুনিক ইসলামের শাসনতান্ত্রিক ধারণা ক্লাসিক্যাল ইসলামের শাসনতান্ত্রিক ধারণা থেকে ভিন্ন। ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এমন সব প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি ও সেগুলোর পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যেগুলোর ভিত্তি সুবিদিত, ঐতিহ্যবাহী এবং প্রথাগত জীবনধারা ও শাসনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এগুলোর কাঠামো ছিল প্রাকৃতিক ও অনানুষ্ঠানিক চরিত্রের এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক ছিল প্রতীকী।

বিপরীতক্রমে বর্তমানের ইসলামিজমের শাসনতান্ত্রিক ধারণা বিশেষত বিংশ শতাব্দীর ভাবাদর্শের ফল। কম্যুনিজম, সমাজবাদ এবং জাতীয়তাবাদের মত একটি আন্দোলন হিসেবে ইসলামিজম বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে ডিক্রি জারির মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য মূলনীতি এবং আইনের সহায়তায় সমাজকে রূপান্তরিত (Transformation) করতে চায়। ভাবাদর্শিক আন্দোলন হিসেবে ইসলামিজম নির্ভেজাল ও নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টি করার সামর্থ্য নিয়ে গর্ব করে, অর্থাৎ এমন এক ভাবমূলক আদর্শকে বাস্তবায়ন করার সামর্থ্য নিয়ে গর্ব করে, যার বিষয়বস্তু হয়ত বই-পুস্তকে পাওয়া যাবে, কিন্তু কোন বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর সামষ্টিক প্রজ্ঞা ও জ্ঞানে দর্শনীয়ভাবে পাওয়া যাবে না। বিংশ শতাব্দীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ভাবাদর্শের মত ইসলামিজম প্রবলভাবে সকলের সমান অধিকার এবং সমান সুযোগ-সুবিধার (ইগালিটারিয়ানিজম) নীতিতে বিশ্বাসী।[২]

এভাবে মিসরীয় মুসলিম ব্রাদারহুড প্লাটফরমের খসড়াটি আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমতা নিশ্চিত করেছে এবং ধর্ম-জাতিগোষ্ঠি-নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী ইত্যাদির ভিত্তিতে যে কোন বৈষম্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে; Islamic Constitutional Movement, "Who Are We"- আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমতাকে তাদের অর্থাৎ ইসলামিক কন্সটিটিউশনাল মোভমেন্টের অন্যতম কৌশলগত লক্ষ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। http://icmkw.org/about_us.aspx. সমতাবাদ (Egalitarianism/ ইগালিটারিয়ানিজম) এবং আদর্শিক ভ্যানগার্ডের উপর নির্ভরতার মাঝে কোন অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য নেই। এ কথার যথার্থতা সাম্যবাদ ও নারীবাদের উদাহরণের মাঝে পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে সকল মানুষের সাথে না হলেও অন্তত সকল পুরুষের সাথে সমান আচরণের এই স্পৃহা আর আইনের আকারে প্রকাশিত ঐশী ইচ্ছার ধারক হিসেবে আলেমসমাজের ধারণা বা অভিমত এক রকম নয়; একটি অন্যটির সাথে পাশাপাশি অবস্থান করে না। এই বিষয়টি শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে আলেমদেরকে তাদের পুরনো ঐতিহ্যবাহী অবস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা কেন ইসলামিজম চায় না এবং শিয়া বিশ্ব ছাড়া সুন্নী আলেম সমাজ নিজেরাও কেন তাদের সে অবস্থান প্রত্যাশা করেননি-এ দু'টো বিষয়েরই ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। একবার যখন রাষ্ট্রের সাথে আইনের সংযুক্তি আইনি ব্যবস্থার রক্ষক হিসেবে আলেমদেরকে তাদের ভূমিকা থেকে বঞ্চিত করে, তারই সাথে তাদের উচ্চ মর্যাদার দাবিও- অর্থাৎ তাদের ইসলামী আইনি বিষয়ের বিশেষায়িত জ্ঞান রয়েছে- এই দাবিটিরও গুরুত্ব হারিয়ে যায়। বস্তুত আলেমদের মূল বৈশিষ্ট্যটি কেড়ে নেয়ার সাথে সাথে তা তাদেরকে প্রায় লক্ষ্যহীনে পরিণত করে তাদের জন্য ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয় পরিচালনার সামান্য সুযোগ রেখে তাদেরকে ক্ষমতাহীন করে ফেলে। তাদের বিশেষ মর্যাদার কারণ তিরোহিত হয়ে যায়। এ অবস্থায় আলেম সমাজ সমতার দাবি ত্যাগ করে এবং এ ব্যাপারটি বিংশ শতাব্দীতে প্রতিটি মহাদেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গোঁদের উপর বিষফোঁড়ার মত আলেমদের পারিবারিক আইন পরিচালনার সীমিত পরিমণ্ডল দৃশ্যত তাদেরকে বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অপ্রাসঙ্গিক এবং অপাঙ্‌ক্তেয় করে তোলে। তারা রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ছিল বটে, তবে তারা তুলনামূলক গুরুত্বহীন ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে সরকারের জন্য কাজ করেছেন। এ রকম নিম্নস্তরে নামিয়ে দেয়া অবস্থায় সুন্নী আলেমসমাজ আর এমন কোন নির্বাচকমণ্ডলী হিসেবে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে পারেননি যাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা যায়। বর্তমানের ইসলামপন্থী রাজনীতিকদের পরিপ্রেক্ষিত থেকে যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে, ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা এবং বাস্তবে প্রয়োগ ঘটানোর জন্য আলেমদের প্রয়োজনও আর অবশিষ্ট নেই।

প্রথম দিকের ইসলামপন্থী রাজনীতিক, যেমন মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল-বান্না এবং ইসলামপন্থীদের মধ্যে সবচেয়ে রেডিক্যাল এবং প্রভাবশালী চিন্তাবিদ ও তাত্ত্বিক সাইয়েদ কুতুব প্রমুখকে প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে ইসলামী ব্যবস্থার দৃশ্যত পতন বহুলাংশে প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁরা প্রথমত এবং সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বে ইসলামী সমাজকে তার

www.pathagar.com

যথার্থ স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁরা ইসলামী সমাজের ব্যর্থতার কারণ পর্যালোচনা করেছেন এবং এভাবে তাঁরা বুঝেছেন যে, ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করাই হচ্ছে এ ব্যর্থতার কারণ। তাঁরা এর পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম সমাজের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতির জন্য ইসলাম যেন জীবনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে সে অবস্থানে ইসলামকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন।

ইসলামপন্থীরা সামাজিক পুনরুদ্ধার এবং সামাজিক সংস্কারমূলক বৃহত্তর কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ইসলামকে কাজে লাগিয়েছেন বা কাজে লাগাতে চান। শুরু থেকেই মুসলিম ব্রাদারহুডকে নিছক ধর্মীয় সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা করা হয়নি। একে বরং সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত, এমন কি শরীরচর্চা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ে একটি ব্যাপকভিত্তিক সংগঠন হিসেবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল।[৩] এ ক্ষেত্রে ব্রাদারহুড অন্য একটি ধর্মীয় সংগঠন ঐতিহ্যবাহী সুফি ব্রাদারহুডকে অনুকরণ করে; বরং এক পর্যায়ে একে অতিক্রম করে গেছে। সামাজিক সংহতি উভয় সংগঠনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে নিজেদের সদস্যদের এবং সামগ্রিকভাবে পুরো সমাজের উন্নতির চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সচেতনভাবে একটি গোষ্ঠীকে সংগঠিত করা মুসলিম ব্রাদারহুডের একটি স্বতন্ত্র এবং আধুনিক উদ্যোগের অংশ ছিল।

ইসলামপন্থীরা ইসলামকে আধুনিক যুগের উপযোগী সামাজিক-রাজনৈতিক মাধ্যম হিসেবে দেখেন। তবে ইসলামী আইন ও ধর্মতত্ত্বের ঐতিহ্যবাহী বিবরণ ইসলামকে সেভাবে উপস্থাপন করেনি। আলেমসমাজও সাধারণভাবে এ রকম প্রভাবশালী এবং ভবিষ্যতমুখী পরিভাষায় ইসলামের ধারণা দেননি। পেছনে ফিরে যাওয়া অর্থাৎ 'ধর্মীয় বিজ্ঞানে'র উদ্ভবের পূর্বে দৃষ্টি দেয়াতেই ইসলামপন্থীদের সমাধান নিহিত ছিল, যে ব্যাপারে আলেমসমাজ পবিত্র কুরআনের বিশেষায়িত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং এখনও আছেন।

সত্যিকারের ইসলামের কষ্টিপাথর হিসেবে পবিত্র কুরআনে প্রত্যাবর্তন ইসলামে মুসলিম সমাজের সংস্কারের যে ঐতিহ্য রয়েছে তার কিছুটা প্রতিফলন ঘটায়। এই ঐতিহ্য অনুযায়ী বেশ কয়েক প্রজন্ম পর পর মুসলিম সমাজে কোন

মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রাথমিক পর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস, বিশেষত ইসলামী পণ্ডিত বা আলেমদের ব্যাপারে তাদের জটিল মনোভাব সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ইবরাহিম এম আবু রাবি' এর *Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the Modern Arab World* (আলবানি : সানি (SUNY) প্রেস, ১৯৯৬), পৃ. ৬২-৯১; এ ছাড়া "Who Are We" নামক লেখায় ব্রাদারহুডের কর্মতৎপরতার সুযোগ সম্পর্কিত বর্ণনা দেখুন।

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্ব বা আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, যে ব্যক্তিত্ব বা আন্দোলন ঐ সমাজকে অপ্রয়োজনীয় সংযোজন এবং কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে সত্যিকারের ইসলামকে সেখানে পুনরুজ্জীবিত করে। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব, যাঁর কথা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে জেনেছি, এ ধরনের নমুনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাস্তবিক ওহ্হাবী মতবাদ এবং ইসলামিজম কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমান্তরাল ছিল, যা গত শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে নিজ নিজ বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু ইসলামপন্থীর প্রতি সউদী আরবের সক্রিয় সমর্থন দানের জন্য যথেষ্ট ছিল। একই সময়ে, যদিও ইসলামপন্থীরা প্রভাবের কথা স্বীকার করবে না, এ কথা সত্য যে, ইসলামপন্থীদের পবিত্র কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন প্রোটেস্টেনিজমের সাথে তাদের কিছুটা সামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছে- বিশেষত 'কেবল বাইবেল'কে গ্রহণ করা এবং আইন ও ধর্মতত্ত্বের গির্জা কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যানের মতবাদের দিক দিয়ে এ ধরনের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। এ ধরনের মতবাদ অর্থাৎ প্রোটেস্টেনিজম রোমান ক্যাথলিক চার্চ শত শত বছরের মধ্য দিয়ে তৈরি করেছে।[৪]

গত শতাব্দীর মধ্য দিয়ে ইসলামপন্থীরা ঐতিহ্যের কিছু কিছু দিক যা রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সময়ের ব্যবধানে সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো এড়িয়ে যেতে কিংবা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করতে প্রস্তুত হয়েছেন। বিশেষত রাজনৈতিক কর্মসূচিভিত্তিক কিছু কারণে ইসলামপন্থীরা শরীয়া এবং এর প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর আলেমদের একচেটিয়া প্রভাবকে পরিহার করতে চেয়েছেন। এই ইচ্ছা ইসলামপন্থী এবং অধিকতর পুরনো ঐতিহ্যভিত্তিক আন্দোলনের মাঝে স্পষ্ট মৌলিক পার্থক্যকেই প্রতিফলিত করে। সউদী আরব দ্বারা উদ্বুদ্ধ সালাফি মতবাদ এমনই একটি পুরনো ঐতিহ্যভিত্তিক আন্দোলন যা এর নিজস্ব ইসলামী আইনি ঐতিহ্যের অনেক কাছাকাছি একটি পর্যায়ে

---

৪. ইসলামপন্থীরা প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের ধ্যান-ধারণাগুলোর অপ্রত্যক্ষ সংস্পর্শ পেয়েছিল, যেগুলোকে ইসলামপন্থীরা পশ্চিমা আধুনিকতাবাদের দৃষ্টিতে দেখেছিল। পশ্চিমা আধুনিকতাবাদ নিজেই সংস্কারমূলক ভাবাদর্শ এবং রেনেসাঁ ভিত্তিক ক্লাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মিশ্রণ থেকে উৎসারিত হয়েছে। ইসলামপন্থীদের উপরিউক্ত ধরনের ধ্যান-ধারণার সংস্পর্শে আসার সম্ভাব্য আরেকটি উৎস ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারীদের অর্থায়নে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বৈরুত ও কায়রোতে অবস্থিত আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, যেগুলো আরব জাতীয়তাবাদ উন্মেষের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। দেখুন, হিদার শারকি (Heather Sharkey), *American Evangelicals in Egypt : Missionary Encounters in an Age of Empire,* (প্রিন্সটন : প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৮)

www.pathagar.com

পৌঁছেছিল। বিপরীতক্রমে অ-আলেম ইসলামপন্থীরা এমন এক বিশ্ব প্রত্যাশা করেন যেখানে অ-আলেম ব্যক্তিরা ইসলাম থেকে উদ্ভূত মূল্যবোধ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। এই আদর্শিক ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হচ্ছে এটা কল্পনা করে নেয়া যে, ইসলামী মূল্যবোধ এবং আদর্শ সমাজে বিদ্যমান রয়েছে এবং এ মূল্যবোধ ও আদর্শকে আলেমদের উপর নির্ভরশীল না থেকেও চিহ্নিত এবং বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব।

এ ব্যাপারটি নিশ্চিত করার জন্য ইসলামপন্থীরা মনে করেন যে, আলেমদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে গেলেও যে কোন ব্যক্তি নিজে থেকে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করতে পারে। ক্যাথলিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে ইসলাম কখনো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা শুধু আলেমদের জন্য সীমিত বলে ঘোষণা করেনি। তবে বাস্তবে ধর্মীয় বিষয়সমূহে ব্যাপকভিত্তিক অধ্যয়ন করতে হবে- এ ধরনের বাধ্যবাধকতা এ কাজের সুযোগটিকে সীমিত করে দিয়েছিল বা এখনও সীমিত করে রেখেছে। ধর্মীয় বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের উপযোগী গভীর জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার জন্য ধর্মীয় বিষয়সমূহে ব্যাপক অধ্যয়ন করা জরুরি ছিল বা এখনও জরুরি। অন্যদিকে আইনি বিষয়ে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক মতামত প্রদানের অর্থাৎ ফতওয়া দানের সুযোগটিকে শুধুমাত্র কর্তৃত্বপ্রাপ্ত (Authorised) মুফতীদের জন্য সীমিত করা হয়েছিল।

কিন্তু নতুন ইসলামপন্থীরা এই ধারা পাল্টে দেয়ার উদ্যোগ নেন এবং বলা ভাল যে, এ ক্ষেত্রে তারা উল্লেখযোগ্য সাফল্যও লাভ করেন। এ বিষয়ে ইসলামপন্থীদের মধ্যে বিভিন্ন রকম মতামত রয়েছে। যারা অধিকতর উদারপন্থী তারা পারিবারিক আইন সম্পর্কেও আলেমদের শিক্ষায় পরিবর্তন আনতে প্রস্তুত। অন্যদিকে যারা তুলনামূলক রক্ষণশীল ইসলামপন্থী তারা এখনও ধর্মীয় আচার বিষয়ক সীমিত পরিমণ্ডলে হলেও আলেমদের ভূমিকা সংরক্ষণ করতে চান। তবে সাধারণভাবে সুন্নী ইসলামপন্থীরা আলেমদেরকে যদিও ব্যক্তিগতভাবে সম্মান করেন, তাদের অধিকাংশই মনে করেন, রাষ্ট্রের আচরণ নির্ধারক ইসলামী মূল্যবোধ আলেমদের দ্বারা পরিকল্পিত ও নির্ধারিত হতে হবে তা জরুরি নয়, এমন কি ক্লাসিক্যাল আলেম শ্রেণীর বর্ণনা বা ঐতিহ্য থেকেই কেবল সেগুলো উদ্ভূত হতে হবে এমনটিও জরুরি নয়। বরং তারা মনে করেন, একজন সাধারণ মুসলিম পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় এবং সর্বাধিক কর্তৃত্বপূর্ণ হাদীসে সরাসরি এ ব্যাপারে সন্ধান করতে পারে, যেন এগুলো ব্যাখ্যা করে তারা ইসলামের মূলনীতিগুলো চিহ্নিত করতে পারে, যে মূলনীতিগুলো রাষ্ট্রীয়

www.pathagar.com

আচরণের ক্ষেত্রে- এমন কি আইনি বিষয়ে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বাস্তবে এর অর্থ হচ্ছে, যখন ইসলামপন্থীরা শরীয়ার প্রতি আহবান জানায়- যেমনটি তারা প্রতিনিয়তই করে থাকে- তারা আলেমদের নির্দেশনায়, যারা ঐতিহ্যগতভাবে ক্লাসিক্যাল আইনি ব্যবস্থাকে বাস্তব রূপদান করেছেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তাদের দ্বারা পরিচালিতব্য পূর্ণ ক্লাসিক্যাল ইসলামী আইনি ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের আহবান জানায় না। তারা যার আহবান জানায় তা দৃশ্যত এ থেকে অনেকটাই ভিন্ন। বস্তুত ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক প্লাটফরম তাৎপর্যপূর্ণভাবে শরীয়ার শাসনের আহবান জানায়। প্রকৃতপক্ষে এটিই তাদের সবচেয়ে আলাদা এবং লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।[৫] তারা প্রশিক্ষিত আলেমদের দ্বারা গঠিত ইসলামী আইনি ব্যবস্থা সৃষ্টির আহবান জানায় না, যে ব্যবস্থায় আলেমরা বিচার প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে। এমনটি তারা চায় না। মুসলিম ব্রাদারহুডের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার ভূমিকায় সমসাময়িক কিছু আলেমের গুরুত্ব থাকলেও ইসলামপন্থীদের বক্তব্য অনুযায়ী আধুনিক রাষ্ট্রের মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বগুলো অর্থাৎ নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা, বিচার বিভাগ এবং আমলাতন্ত্র প্রভৃতি বিভাগের যে দায়িত্ব রয়েছে সেগুলো রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত অ-আলেম দ্বারা সম্পন্ন করতে হবে।

অন্য কথায়, ইসলামপন্থীদের রাষ্ট্রব্যবস্থার মডেল আলেমদেরকে তাদের ঐতিহ্যবাহী শাসনতান্ত্রিক অবস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা চায়নি। এটি প্রকৃতপক্ষে আলেমদেরকে বাদ দিয়ে সাধারণ মুসলিমদের মাধ্যমে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যারা নিজেরাই হাদীসের অ-আলেমসুলভ ব্যাখ্যা করবে এবং সে ব্যাখ্যা অনুযায়ী চলবে। ইসলামপন্থীরা সরকারের সকল পর্যায়ে এমন লোক চায় যারা আলেমসমাজের অংশ নয়, তবে তারা ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তারা ইসলামপন্থী ব্যক্তিত্ব; যেন তারা ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে তাদের

---

৫. উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, "The Electoral Programme of the Muslim Brotherhood for Shura Council in 2007". মুসলিম ব্রাদারহুড শরীয়া কার্যকর করার মিশন সম্পর্কেও আলোচনা করেছে "The Muslim Brotherhood's Program (2005 Parliamentary Elections)"-এ। এ বিষয়টি আরো দেখা যাবে "Hamas Legislative Elections Program" -এ। এখানে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনকে মৌলিক উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়টিকে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত নীতি এবং বিচার বিভাগ সংস্কারের যে অধ্যায় রয়েছে তার প্রথম অংশ বানানো হয়েছে।

www.pathagar.com

নিজস্ব যে ব্যাখ্যা রয়েছে তাকে এগিয়ে নিতে পারে। এ ধরনের পদে আলেমদেরকে সুন্নী ইসলামপন্থীরা সাধারণভাবে নিয়োগ দিতে চায় না। এ পন্থা বা দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়েছে যেখানে সাধারণ মানুষ- (যদিও সরকারে শরীয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তারা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে) সরাসরি ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ শাসনকার্য চালাক তা চায় না। বরং তারা ধর্মীয় নেতা তথা আলেমরা যেন উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করে সেটাই বেশি পছন্দ করে।[৬]

সরকারি পদে আলেমদের নিয়োগ ইসলামপন্থীরা না চাওয়ার কারণ হিসেবে এটা মনে করা অবান্তর হবে না যে, তারা ভেবেছেন যদি সেটা করা হয় তাহলে অধিকাংশ মুসলিম দেশে- যেখানে দৃশ্যত সেক্যুলার শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান- প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি একে বড় ধরনের মৌলিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হবে। কিছু দূরবর্তী ক্ষেত্রে, যেমন আফগানিস্তানে, যেখানে বহু দশক ধরে যে সামান্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল, সেটা ছিল সম্পূর্ণভাবে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা- সেখানে ইসলামপন্থীরা অন্তত কিছু সরকারি পদে আলেমদের অধিষ্ঠিত করতে প্রয়াস চালিয়েছে। কিন্তু এই ব্যতিক্রমী প্রয়াস এ ক্ষেত্রে যে সাধারণ রীতি এতকাল চালু ছিল সেটাকেই কেবল সত্য প্রমাণ করেছে। সেটা হচ্ছে, আফগানিস্তান ছাড়া অন্য সব দেশে ইসলামপন্থীরা ক্ষীয়মান আলেমদের থেকে ভিন্ন একটি শ্রেণীকেই প্রতিনিধিত্ব করেছে, যাদের লেখাপড়া এবং স্বার্থ আলেমদের লেখাপড়া ও স্বার্থ থেকে ভিন্ন। ইসলামপন্থীরা স্বপ্ন দেখে এমন সরকার, যা তারা যেভাবে সংজ্ঞায়িত এবং প্রয়োগ করতে চায় ঠিক সে অর্থে শরীয়া এবং ইসলামী মূল্যবোধ অনুযায়ী তাদের নিজেদের দ্বারা পরিচালিত হবে, যে সরকারে খুবই সীমিত আকারে আলেমদের ভূমিকা ও অবদান থাকবে।[৭]

---

৬. দেখুন, John Esposito এবং Dalia Mogahed, "Battle for Muslims' Hearts and Minds : The Road Not Yet Taken" http://www.muslimwestfacts.com/content/26866/Battle-Muslims Hearts-Minds-Road-Yet-Taken-aspx (একই লেখকদের পরবর্তী লেখায় গ্যালাপ নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে রিপোর্ট করা হয়েছে)

৭. ইসলামপন্থী ও আলেমদের (যাদেরকে ইসলামপন্থীরা মূল ভূমিকার বাইরে রাখতে চায় তবে তাদেরকে অসম্মান বা অশ্রদ্ধা দেখাতে চায় না) মধ্যকার দুর্বল সম্পর্ক বিষয়ে দেখুন আবু রাবি'-এর *Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the Modern Arab World;* আরো দেখুন আযীয আহমাদের "Activism of the Ulama in Pakistan", *Keddie, Scholars, Saints and Sufis*-এ, পৃ. ২৬১-৬২ (এখানে প্রভাবশালী ইসলামপন্থী আবুল আ'লা মওদুদীর দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করা হয়েছে)। লক্ষণীয় যে,

www.pathagar.com

কাজেই তারা শরীয়ামুখী যে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রস্তাবনা দিয়েছে বা দেয় তা ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতন্ত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে না, অর্থাৎ সেটা ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতন্ত্র নয়, বরং সেটা এ থেকে একেবারেই ভিন্ন। অন্য কথায়, তারা মূলত ইসলামীকরণ করা কিছু উন্নত শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা পদক্ষেপেরই শুধু প্রস্তাবনা দেয়। বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য আমরা এখন বৃহত্তর ইসলামপন্থী রাজনৈতিক প্লাটফরমের দিকে নজর দিব।

ইসলামপন্থী শরীয়া এবং ইসলামী শরীয়া : ন্যায়বিচারের প্রশ্নে

ইসলামপন্থী রাজনৈতিক কর্মসূচি সর্বদা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহবান জানায়, যেখানে 'ইসলাম' শব্দটিকে আধুনিক বিশেষণের অর্থে ব্যবহার করা হয়- যে অর্থটি (Notion) ইসলামের ক্লাসিক্যাল শব্দভাণ্ডারে সাধারণভাবে ছিল না।[৮] অতএব ব্যাপকভিত্তিক এবং আধুনিক ভাবাদর্শ হিসেবে ইসলাম কথাটি ইসলামিজমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইসলাম হচ্ছে এমন বিষয় যা ইসলামিজমকে সরকার ও সমাজ সংস্কারের একটি বিশেষ পন্থা বা উপায়ে পরিণত করে। এটা হচ্ছে মুসলিম সমাজকে সারা বিশ্বে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার মঞ্চে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চালিকাশক্তি বা ডাইনামিক্স।[৯]

ইসলামপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আলেমরা প্রোটেস্টান্টদের মিনিস্টার ও শিক্ষকদের মত বিশেষ কোন কর্তৃত্ববিহীন ধর্ম শিক্ষকের ভূমিকা নিয়েই থাকবে।

৮. উদাহরণ স্বরূপ "The Principles of the Moroccan Party of Justice and Development", (অফিসিয়াল ওয়েবসাইটগুলো বর্তমানে অকার্যকর); এ ছাড়া মুসলিম ব্রাদারহুডের ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলা আছে "The Electoral Programme of the Muslim Brotherhood for Shura Council in 2007" নামক লেখায়।

৯. "Pillars of a Regime" শিরোনামের অধীনে "Reading into the Muslim Brotherhood Documents" নামক লেখাটি দেখুন: 'মুসলিম ব্রাদারহুড মনে করে, ইসলাম সাধারণ বিধি হিসেবে মৌলিক নীতিমালা দিয়েছে, যা বর্তমানে সমাজ যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সেগুলো নিয়ে কাজ করতে পারে। যেমন, বেকারত্ব, মূল্যস্ফীতি, গৃহায়নের অভাব, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবক্ষয় এবং মাদক এবং অন্যান্য সমস্যা। এ সব নীতির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে: ১. একজন মুসলিমকে এমনভাবে প্রস্তুত করা এবং গঠন করা যে, সে আদর্শিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে কার্যকর উপাদান হবার জন্য মুসলিম বিবেক এবং নৈতিকতা রক্ষা করবে; ২. দেশকে মিডিয়া, শিক্ষা, অর্থনীতি, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পুনর্গঠন করা; ৩. ভিত্তি হিসেবে ইসলামী রেফারেন্সের উপর নির্ভর করা।" *IkhwanWeb*, সেপ্টেম্বর ২৯, ২০০৬, http://ikhwanweb.com/

www.pathagar.com

ইসলামপন্থীরা যেভাবে স্বপ্ন দেখে তার সাথে সঙ্গতি রেখে যখন তাদেরকে রাষ্ট্রের ইসলামী চরিত্রকে সংজ্ঞায়িত করতে বলা হয় তারা বিশেষভাবে বলে যে, ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামী আইন এবং মূল্যবোধ দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত হয়- এ বিষয়টিই এ ধরনের রাষ্ট্রকে ইসলামীকরণ করে।[১০] এই সংজ্ঞার আইনি অংশটুকু অন্তত তত্ত্বগতভাবে হলেও ইতিহাস দ্বারা প্রভাবিত। আমরা যেমনটি দেখেছি, ইসলামী আইন ছিল ক্লাসিক্যাল ইসলামী শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার একেবারে কেন্দ্রীয় নির্ধারক বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারটি বর্তমানের ইসলামপন্থীরাও স্বীকার করেন। অতএব এটি পরিষ্কার যে, ইসলামী রাষ্ট্র অবশ্যই ইসলামী আইনের অধীনে চলবে। তবে এর ধরনকে আইনের সূত্রবদ্ধকরণ বা কোডিফিকেশন দ্বারা পরিবর্তন করা হয়ে থাকতে পারে। বস্তুত ইসলামী আইনের কেন্দ্রীয় বা মূল ভূমিকা ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের কথা বলা হলে তা রাষ্ট্রটি আদৌ 'ইসলামী' কি-না সেটি নিয়েই প্রশ্ন সৃষ্টি করবে।

ইসলামপন্থীদের প্রদত্ত সংজ্ঞার দ্বিতীয় উপাদান, যা ইসলামী মূল্যবোধের কথা বলে, তার একটি সূক্ষ্ম আলাদা অবস্থান রয়েছে। 'ইসলামী মূল্যবোধ' বা সাইয়েদ কুতুবের ভাষায় 'ইসলামের আত্মা' এমন কোন ধারণা নয় যা শাসনতন্ত্র বিষয়ে কিংবা অন্য কোন বিষয়ভিত্তিক ক্লাসিক্যাল ইসলামী রচনায় পাওয়া যাবে। ক্লাসিক্যাল ধর্মীয়-রাজনৈতিক চিন্তাধারায় 'সিয়াসা শারঈয়্যা' বা শরীয়াভিত্তিক রাজনীতি বলে একটি ধরন রয়েছে।[১১] কিন্তু এমন কি ইবনে তাইমিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এই বাচনভঙ্গিও (অর্থাৎ সিয়াসা

Article.asp?ID=818&LevelID=2&SectionID=116. আরো দেখুন "Muslim Brotherhood and Democracy in Egypt": 'হাসান আল-বান্না যে কোন নতুন ধারণাকে কিভাবে নিবে বা মোকাবেলা করবে এ বিষয়ে মুসলিম ব্রাদারহুডের জন্য একটি নিয়ম বা বিধি ঠিক করে দিয়েছেন। মুসলিম ব্রাদারহুড সম্পর্কে তিনি বলেন, "এ আন্দোলনকে বোঝাতে সবচেয়ে উপযুক্ত শব্দ হচ্ছে "ইসলামী"। এ শব্দটি ব্যাপকভিত্তিক অর্থ বহন করে। এটি সে সংকীর্ণ অর্থ বহন করে না, যা অধিকাংশ মানুষ মনে করে। কেননা আমরা বিশ্বাস করি ইসলাম কথাটির একটি সুসমন্বিত অর্থ রয়েছে যা জীবনের সকল দিককে নিয়ন্ত্রণ করে এবং জীবনের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে যথাযথ বিধিমালা ঠিক করে দেয় বা দিয়েছে। মানুষ প্রতিনিয়ত যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলোর সমাধানের ব্যাপারে ইসলাম অসহায় নয় এবং মানুষের জীবনের সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ব্যাপারেও ইসলাম অসহায় নয়। (*ikhwanweb.com*)

১০. Islamic Constitutional Movement, "Who Are We"-এ কৌশলগত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যগুলোর তালিকা; "Hamas Legislative Elections Program"–এ দেখুন।

১১. এই গ্রন্থে উপরে ইবনে তাইমিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা দেখুন

www.pathagar.com

শারঈয়্যা) ইসলামকে বিমূর্ত মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কযুক্ত করার পরিবর্তে বরং রাজনীতিকে ইসলামী আইনের সাথে সংযুক্ত করেছে। কাজেই যে রাষ্ট্র ইসলামী মূল্যবোধকে ধারণ করে তাই ইসলামী রাষ্ট্র- এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হলে তা বিশেষভাবে আধুনিক রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে। এবং এটা ক্লাসিক্যাল ইসলামী আইনি বৈধতার ক্ষুদ্র ও সীমিত পরিসর থেকে রাষ্ট্রকে মুক্ত রাখে। এই কৌশল ইসলামপন্থীদের তৎপরতার জন্য বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠেছে।

যে কারণে বিষয়টির প্রতি ঘনিষ্ঠ মনোযোগ দিতে হয় সেটা হচ্ছে ইসলামী আইনের ভাব-ব্যঞ্জনার সাথে ইসলামিজমের যথেষ্ট সমস্যাপূর্ণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। রাজনৈতিক পরিভাষায় ইসলামী আইন ইসলামপন্থীদের জন্য একদিকে যেমন জনগণকে আকর্ষণ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, আবার পাশাপাশি এটা আধুনিক বিশ্বে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ ও অনুশীলনে তাদের সক্ষমতার প্রতি একটি সম্ভাব্য হুমকিও বটে। ইতিবাচক দিক থেকে দেখলে বলা যায়, সম্ভাব্য সমর্থকদেরকে ইসলামপন্থীদের স্বার্থকভাবে আকর্ষণ করার ব্যাপারটি অংশত এই ধারণার উপর নির্ভরশীল যে, ইতোপূর্বে ইসলামী আইন পরিত্যাগ করার পর সারা বিশ্বে মুসলিম সমাজ বল্গাহীন নির্বাহী ক্ষমতাধর ব্যক্তির চাপে ভেঙ্গে পড়েছে। কাজেই এ থেকে উত্তরণের জন্য ইসলামী আইনের প্রয়োজন রয়েছে।

শরীয়া নিয়ন্ত্রিত ইসলামী রাষ্ট্র প্রত্যাশা করার মাধ্যমে ইসলামপন্থীরা নস্টালজিয়ায় (স্মৃতিকাতরতা) আক্রান্ত হয়, আবার এর মাধ্যমে নানাভাবে তারা এ বিষয়ে সঠিক ধারণা লাভ করে যে, ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্র ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র ছিল- অন্তত বহু মুসলিম জনসংখ্যাবহুল রাষ্ট্রে আধুনিককালে যে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হয়েছে তা থেকে বহুগুণে ন্যায়ভিত্তিক ছিল। ইসলামী আইনে প্রত্যাবর্তনের আহবান গত শতাব্দীর রাজনৈতিক দুর্নীতি সংশোধনের সম্ভাবনাকে এগিয়ে দেয় এবং অধিকতর খাঁটি ও নির্ভেজাল রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনাকেও বাড়িয়ে দেয় যেখানে শরীয়া সামাজিক সম্পর্ক এবং সরকারের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করবে।

ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রের আইনি ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত এ সব ইতিবাচক দিক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমসাময়িক ইসলামপন্থীরা যে প্রধান রাজনৈতিক ভাষা ব্যবহার করেন সেটা হচ্ছে 'জাস্টিস' (ন্যায়বিচার)। যদিও শব্দটি কৌশলী, তথাপি ইসলামপন্থীরা ন্যায়বিচারের বিষয়টিকে যে অর্থে ব্যবহার করেন তার ব্যঞ্জনাকে বোঝাতে এ শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। বলা বাহুল্য, শব্দটি

www.pathagar.com

ইসলামপন্থী আন্দোলনের জন্য বার বার দরকার হয় এবং আরবী ভাষী অধিকাংশ দেশে একে ইসলামিজমের একটি লক্ষণ বা প্রতীক বলে মনে করা হয়। বহু ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল তাদের নামের সাথে এ শব্দটি যুক্ত করেছে এবং এ শব্দটি প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে। এ শব্দটি ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক দলের নামের সাথে 'ইসলাম' শব্দটির ব্যবহার সরকারগুলো মেনে নেবে না বা মেনে নিতে চায় না। কাজেই এ ক্ষেত্রে বিকল্প শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'জাস্টিস' বা ন্যায়বিচার শব্দটির ব্যবহার 'ইসলাম'কে বেছে নেয়ার ব্যাপারটিকেই অন্য একটি শব্দ বা সুভাষণের মাধ্যমে প্রকাশ করার নামান্তর- 'জাস্টিস' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে বস্তুত এ সত্যই তুলে ধরা হয়েছে।[১২]

আমরা জাস্টিস বা ন্যায়বিচারের তিনটি ধরনকে আলাদা আলাদাভাবে দেখতে পারি, যেগুলো এই প্রয়োগবিধিতে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এগুলো হচ্ছে সামাজিক ন্যায়বিচার, রাজনৈতিক ন্যায়বিচার এবং আইনগত ন্যায়বিচার। ইসলামপন্থীদের চিন্তাধারায় এগুলোর মধ্যে প্রথমটির একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকার রয়েছে, যার সূচনা হচ্ছে সাইয়েদ কুতুব রচিত ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত ক্লাসিক প্রকাশনা 'সোস্যাল জাস্টিস ইন ইসলাম'[১৩] বা 'ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচার' নামক গ্রন্থ থেকে। যদিও সাইয়েদ কুতুবের 'মাইলস্টোনস'[১৪] গ্রন্থটি, যা সম্প্রতি অধিকাংশ পশ্চিমা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তাঁর একটি অধিকতর মৌলিক রচনা। যেটিকে সহিংস রেডিক্যাল জিহাদতত্ত্ব উদ্ভবের পেছনে প্রভাব বিস্তারকারী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রধান রচনা বলা যায়- যেখানে তাঁর আগের দিকের রচনাগুলো মূলধারার ইসলামিজম এবং রাজনৈতিক-শাসনতান্ত্রিক প্লাটফরমের জন্য ছিল অধিকতর গুরুত্ববহ।

---

১২. উদাহরণ স্বরূপ মরক্কোর জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমন্টে পার্টির কথা বলা যায়, "Why Justice and Development? Justice Providing Equal Opportunities and Development Beyond the Material Concept". এ ছাড়া দলটিও এর 'দলীয় নীতিমালা'য় জাস্টিস ধারণাটির একটি ব্যাখ্যা দিয়েছে। তবে সম্প্রতি এর অফিসিয়াল ইংরেজি ওয়েবসাইটে এটি পাওয়া যায় না। উপরন্তু "Who is al-Adl wal-Ihsan"-এ আল-আদল ওয়াল-ইহসান নামক লেখায় জাস্টিসের একটি সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। দেখুন http://www.aljamaa.net/ar/detail_khabar.asp?id=6364&IdRub=27 (আরবীতে লিখিত)।

১৩. সাইয়েদ কুতুব, *Social Justice in Islam*, অনুবাদ- জন বি. হারডি (আমেরিকান কাউন্সিল অব লার্ন্ড সোসাইটিজ, ১৯৫৩; পুনর্মুদ্রণ, ওয়াননতা, নিউইয়র্ক : ইসলামিক পাবলিকেশনস ইন্টারন্যাশনাল, ২০০০)

১৪. গ্রন্থটির আরবী নাম হলো *মা'আলিম ফিত ত্বরিক*

www.pathagar.com

সাইয়েদ কুতুবের ক্ষেত্রে 'সামাজিক ন্যায়বিচারের' ধরন বা শ্রেণীটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ; কেননা এতে তিনি ধর্ম অথবা সমাজ- এই পশ্চিমা দ্বি-ধারা বিশিষ্ট চিন্তাধারাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই গ্রন্থে সামাজিক 'ন্যায়বিচার'কে অর্থনৈতিক-ব্যক্তিগত-সরকারি সম্পর্ককে কেন্দ্র করে এবং এগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে; উপরন্তু আইনি ব্যবস্থাকেও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; যদিও সুনির্দিষ্টভাবে নয়; অর্থাৎ সাইয়েদ কুতুব বলতে চেয়েছেন, এ সব কিছুর সমন্বয়েই কেবল সামাজিক ন্যায়বিচার হতে পারে। সাইয়েদ কুতুব সুযোগের সমান ফলাফলের উপর নয়, বরং সমান সুযোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ক্লাসিক্যাল ইসলামী কর ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত একটি কর ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদের কিছুটা পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে সমাজবাদ এবং পুঁজিবাদের মাঝে একটি মধ্যপন্থী পথ অঙ্কন করেছেন। উপরন্তু তিনি সাধারণ ভাষায় জুলুম-নির্যাতন নির্মুল করা এবং করণিক পদসোপানসহ (Clerical hierarchy) যে কোন ক্ষেত্রে পদসোপানবিহীন নাগরিকত্বের সুযোগ দানের পক্ষে কথা বলেছেন। তবে সাইয়েদ কুতুব তাঁর রচনায় ইসলামের জন্য প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর কোন চিত্র অঙ্কন করেননি। প্রকাশ্যভাবে মৌলিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের আহ্বান এড়িয়ে অংশত সরকারের সেন্সরের খড়্গকে শান্ত করার জন্যই হয়তবা তাঁর রচনায় 'সামাজিক ন্যায়বিচার' কথাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকবে।

রাজনৈতিক ন্যায়বিচার বা পরিবর্তনের কথা বলার ব্যাপারে সাইয়েদ কুতুবের যতই সতর্কতা থাকুক, ইসলামপন্থীদের ন্যায়বিচারভিত্তিক প্লাটফরমের জন্য রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সাইয়েদ কুতুবের আগে থেকেই তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের যে চিত্র তার প্রধান উপাদান হচ্ছে অত্যাচারী সরকারের অবসান। মধ্যপ্রাচ্যের নিষ্পেষণমূলক বা একনায়কতান্ত্রিক এবং সাধারণভাবে সেক্যুলার সরকারগুলোকে ইসলামপন্থীদের রচনায় অত্যাচারী শাসন (বা পবিত্র কুরআনের ভাষা থেকে গ্রহণ করে রূপকার্থে বিশেষত মিসরে মর্মভেদী ফিরাউনী শাসন) বলে চিত্রিত করা হয়েছে। যদিও ইসলামপন্থীরা তাদের এই লক্ষ্য পূরণের জন্য শক্তি প্রয়োগের আহ্বান জানায় না বা শক্তি প্রয়োগ করতে চায় না, তারা এ থেকে খুব পিছিয়েও আসে না। মুসলিম ব্রাদারহুড নিজেদেরকে শান্তিপূর্ণ বলে উপস্থাপন করে এবং এর সহযোগী সংগঠনগুলো নির্বাচনে নিয়মিত অংশগ্রহণ

www.pathagar.com

করে থাকে।[১৫] তবে ব্রাদারহুড হামাসের মত সংগঠনকেও সমর্থন করে, যেটা নিজেও ব্রাদারহুডের শাখা। মুসলিম ব্রাদারদেরকে জামাল আব্দুন নাসেরকে হত্যা চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং একটি রেডিক্যাল ইসলামপন্থী গোষ্ঠী তাঁরই উত্তরসূরী আনওয়ার সাদাতকে হত্যা করতেও সক্ষম হয়।

অত্যাচারী শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করা ছাড়াও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের ইসলামপন্থী মডেলে যত্নশীল ও দয়ালু সরকার প্রতিষ্ঠার কথাও রয়েছে, যে সরকার ইসলামপন্থীদের বর্ণনা অনুযায়ী শরীয়ার যে মূলনীতি রয়েছে তার প্রতি অনুগত থাকবে। এই মডেল শাসনকার্য চালানোর এমন কিছু প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয় যেগুলো সম্পর্কে আমরা অচিরেই আলোচনা করব। এ সব প্রতিষ্ঠানকে সৎ, নিরপেক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত এবং বাস্তবিকই দুর্নীতি-অসম্ভব প্রতিষ্ঠান হিসেবে কল্পনা করা হয় এবং ধরা হয়।

রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের এই যে ভাবাদর্শ তার মধ্যেই ইসলামপন্থীদের আইনগত ন্যায়বিচারের আহ্বান নিহিত রয়েছে। শরীয়া এ ক্ষেত্রে বিপুলভাবে কাজ করে বা ভূমিকা রাখে। কেননা ইসলামপন্থীরা, যেমনটি ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, শরীয়া দ্বারা চালিত সরকারের আহ্বান জানায় বটে, কিন্তু এর মাধ্যমে তারা মুফতী, কাজী এবং প্রশাসনিক বিধির সমন্বয়ে গঠিত ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তনের দাবি করে না বা তারা হুবহু সেটা চায় না। বরং ইসলামপন্থীরা তাদের এই দাবির মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক আইনি ব্যবস্থার চিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে প্রশাসন চালানো হবে নিরপেক্ষভাবে, ধনীদের দুর্নীতি থাকবে না এবং সরকারের হস্তক্ষেপও থাকবে না। এমনকি কেউ এমনও বলতে পারে যে, ইসলামপন্থীরা যখন 'জাস্টিস' বা ন্যায়বিচারের কথা বলে তখন তারা মূলত আইনগত ন্যায়বিচারের কথাই বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়া ইসলামপন্থীদের প্লাটফরমের সুনির্দিষ্ট এবং বাস্তব স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে। আর এই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই রাষ্ট্র ও জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় আশেপাশের বাকি বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।[১৬]

---

১৫. মুসলিম ব্রাদারহুডের নির্বাহী ব্যুরোর সদস্য ড. মুরসীর বিবৃতি দেখুন, "Dr. Morsi : MB Has a Peaceful Agenda", *IkhwanWeb.com,* http://ikhwanweb.com/Article.asp?ID=1024&LevelID=1&SectionID=70.

১৬. উদাহরণ স্বরূপ মিসরে মুসলিম ব্রাদারহুডের প্লাটফরম আইনি সংস্কার এবং বাস্তবিক আইনের শাসন এবং পাশাপাশি ইসলামী শাসনের আহ্বান জানায়। আইনি সংস্কারের ক্ষেত্রে সাধারণ মূলনীতি বিষয়ে দেখুন, "MB Brotherhood Iniatives for Reform in Egypt", *IkhwanWeb.com*

www.pathagar.com

ইসলামপন্থীদের 'ন্যায়বিচার' শব্দটির উপাদান অর্থাৎ আইনগত ন্যায়বিচারকে শক্তিশালী করার যে চেষ্টা সেটা এই বাস্তবতাকেই নির্দেশ করে যে, আরবীতে আল-আদ্‌ল (ন্যায়বিচার) শব্দটি কেবল একটি ভাববাচক বিশেষ্যই নয়; এটি একটি আইনি পরিভাষা, আইনের মূলনীতি বিজ্ঞান অর্থাৎ উসুলে ফিক্‌হের রচনা থেকে এই শব্দটি উদ্ভূত যা আইন মেনে চলার গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলে। এই গুণ বা বৈশিষ্ট্য কোন ব্যক্তির থাকতে পারে, যার মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য দেয়ার যোগ্য হতে পারবে বা অন্যান্য সরকারি দায়িত্ব পালনের যোগ্য বিবেচিত হবে।[১৭] ন্যায়বিচারের কথা বলা হলে তা ইসলামপন্থী রাজনীতিকদের আবশ্যিকভাবে সততা এবং দুর্নীতিমুক্ত থাকার কথাও প্রকাশ করে, যারা বাস্তবিক সেক্যুলার মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রগুলোতে কর্মকর্তারা যতটুকু দুর্নীতিগ্রস্ত তার চেয়ে সামগ্রিকভাবে কম দুর্নীতিগ্রস্ত।

শরীয়াকে আহ্বানের নেতিবাচক রাজনৈতিক দিক হচ্ছে, একগুচ্ছ স্বতন্ত্র বিধি হিসেবে ক্লাসিক্যাল ইসলামী আইন আধুনিক নয়; এগুলো আমার দৃষ্টিতে অনাধুনিক। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা যেমনটি দেখেছি, আধুনিকায়নের প্রক্রিয়াধীন উসমানিয়া সাম্রাজ্যকে ক্লাসিক্যাল ইসলামী আইনকে সময়ের চাহিদা পূরণের স্বার্থে সম্পূরক বিধি দ্বারা সমৃদ্ধ করতে হয়েছে এবং একে পরিমার্জিত করতে হয়েছে। সউদী আরব ছাড়া (তাদেরকেও ব্যাপকভাবে সম্পূরক প্রশাসনিক বিধি জারি এবং গ্রহণ করতে হয়েছে) মুসলিম প্রধান সমসাময়িক প্রায় কোন রাষ্ট্রই শুধু ক্লাসিক্যাল ইসলামী আইন সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে চায়নি বা চায় না। এর অর্থ হচ্ছে সাধারণ মুসলিম মানস এটা উপলব্ধি করেছে যে, যদি সত্যিই শরীয়াতে প্রত্যাবর্তন করার চেষ্টা করা হয়, তবে পুরনো ব্যবস্থাকে নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে সেগুলোকে হালনাগাদ করার বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। তবেই শরীয়াতে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হবে।

পশ্চিমা বিশ্বে যেমন মুসলিম বিশ্বেও তেমনি বিষয়টি আরো জটিল হয়ে ওঠে যে কারণে সেটা হচ্ছে, শরীয়ার অনাধুনিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কঠোর শারীরিক শাস্তির বিধান। এ ধরনের শাস্তির অনুশীলন মুসলিমদের মাঝে জনপ্রিয় হবেই- এমন কোন কথা নেই। অধিকাংশ পর্যবেক্ষকের মতে এ ধরনের শাস্তির বিধান নিশ্চিতভাবে আধুনিক যুগের আগের

---

[১৭] 'আদালাহ' বিষয়ে দেখুন, মূল শব্দ 'আদ্‌ল্, *Encyclopaedia of Islam*, দ্বিতীয় সংস্করণ

www.pathagar.com

পর্যায়ের।[১৮] কাজেই ইসলামপন্থীরা যখন ইসলামী আইনকে তাদের রাজনৈতিক প্লাটফরমের মূল বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করতে চায় তখন তারা সত্যিকারের রাজনৈতিক ঝুঁকির মুখে পড়ে। তারা দুর্নীতি বিরোধিতা এবং আইনের শাসনের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম; তবে একই সাথে তারা নিজেদেরকে এমন কিছু পদক্ষেপ কঠোরভাবে বাস্তবায়িত করার ঝুঁকির মুখেও ঠেলে দেয় যা মানুষের পছন্দ না করার সম্ভাবনাই বেশি। তারা এর মাধ্যমে পশ্চিমা সমালোচকদের ক্রোধ ও শঙ্কাও সৃষ্টি করে- এ সমালোচনা বা শঙ্কা আন্তর্জাতিক মানবাধিকারভিত্তিক সমাজ থেকে কিংবা নতুন উদারপন্থীদের থেকে আসতে পারে, যারা আধুনিককালের আগের একটি আইনি ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়াকে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত বলে মনে করে। এত কিছুর পরও ইসলামপন্থীরা যে ইসলামী আইনকে তাদের কর্মসূচির আওতাভুক্ত রাখে সেটা আইনের শাসনের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতিকে তারা কত বেশি গুরুত্ব প্রদান করে সেটাই স্পষ্ট করে তুলে।

ইসলামপন্থীদের কর্মসূচিতে ইসলামী আইনের উপর নির্ভরশীলতার আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে আলেমদের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা। ঐতিহাসিকভাবে যে বিষয়টি অতীতের ইসলামী সরকারগুলোকে আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে সেটা হচ্ছে, সেখানে এমন এক শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু ছিল যার আওতায় শরীয়ার বাস্তবায়ন ছিল রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য ন্যূনতম কারণ (অর্থাৎ এ ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্বই থাকতে পারে না) এবং রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগ বা ব্যবহারের বৈধতার মূল মাধ্যম। ক্লাসিক্যাল শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং এর আওতায় সৃষ্ট আইনি ব্যবস্থা এ দু'টো মিলে ইসলামী আইন গঠিত হয়- ইসলামী আইনকে যদি এভাবে দেখা হয় তাহলে তা ব্যক্তিগত আইনি সম্পর্ক এবং নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্কের ধরনটি স্পষ্ট করে দেয়।

---

১৮. শরীয়া কর্তৃক এ ধরনের শাস্তির বিধান চূড়ান্ত বিচারে মানব সমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা এবং মানবিক আচরণ নিশ্চিত করার জন্যই দেয়া হয়েছে। শরীয়ার মূল চেতনা ও শিক্ষা অর্থাৎ ন্যায়বিচারবোধ এবং নৈতিক-মানবিক চেতনা ও শিক্ষার ধারক একটি মানব সমাজ প্রতিষ্ঠা করে সেখানে শরীয়াভিত্তিক শাস্তিসহ আইনি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলেই তা শরীয়ার এ লক্ষ্য পূরণ করতে পারে। শরীয়ার এ সার্বিক মর্ম সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারলেই কেবল এ বিষয়টি উপলব্ধি করা সহজ। বলা বাহুল্য, বিষয়টিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে অনেকেই ব্যর্থ হন।-অনুবাদক।

www.pathagar.com

তবু ইসলামিজমকে এর প্রবক্তারা যেভাবে বাস্তবায়িত করতে চান, সেখানে আলেমসমাজের কেন্দ্রীয় বা বিশিষ্ট ভূমিকা পালনের সুযোগ দিতে তারা উৎসাহী নন; যদিও আলেমসমাজের এ ধরনের ভূমিকাই ঐতিহাসিকভাবে রাষ্ট্রের ইসলামী চরিত্রকে শক্তি যুগিয়েছে; রাষ্ট্রের ইসলামী চরিত্রকে নিশ্চিত করেছে। আমরা যেমনটি দেখেছি, আধুনিকতা এবং সবাইকে সমান সুযোগ বা অধিকার দেয়ার স্পৃহা প্রভৃতি কারণে ইসলামিজম আলেমদেরকে আইনি ক্ষমতা অনুশীলনের ব্যাপারে তাদের ঐতিহ্যগত প্রভাবশালী ভূমিকা পালনের সুযোগ দিতে চায় না। ইসলামপন্থীদের মূলনীতি অনুযায়ী আলেমদেরকে ইসলামের রক্ষক হিসেবে বা ইসলামী মূল্যবোধের চূড়ান্ত বিচারক বা ব্যাখ্যাকারী হিসেবে কল্পনা করা হয়নি এবং করা হয় না। পারিবারিক আদালতের বিচারক হিসেবে আলেমদের অবস্থানকে নামিয়ে দেয়ার ঔপনিবেশিক আমলের বা শেষের দিকের উসমানীয় শাসনামলের যে প্রবণতা ছিল, ইসলামপন্থীদের পরিকল্পিত সরকারের ক্ষেত্রে সে ধারাই আবশ্যিকভাবে মেনে চলা হয়।

ঐতিহাসিক সূত্রকে টেনে বলতে হয়, ইসলামী আইনকে যদি আলেমসমাজের সৃষ্টি বলে ধরা হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে ইসলামী আইনের একদা রক্ষক আলেমদের দ্বারা ইসলামী আইন গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত যদি না হয় তাহলে সে ইসলামী আইন দিয়ে শাসনকার্য চালানো সম্ভব- এ কথা কিভাবে বলা সম্ভব? এর উত্তরটি আপাত স্ববিরোধী মনে হলেও অসত্য নয় অর্থাৎ সেটা হচ্ছে, আলেমদের ছাড়াই শরীয়া প্রতিষ্ঠা করেই ইসলামী আইনভিত্তিক শাসনকার্য চালানো। এভাবে ইসলামপন্থীরা যেভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের কল্পনা করেছেন তা ক্লাসিক্যাল শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় গঠিত ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্র থেকে খুব বেশি পার্থক্যসূচক হবে না। পুরনো ইসলামী রাষ্ট্রগুলো 'ইসলামী' হতো আলেমদের দ্বারা এবং তাদের পক্ষ থেকে। নতুন ইসলামী রাষ্ট্রগুলো আলেমদের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুপস্থিতিতেই 'ইসলামী' হবে।

শরীয়ার গণতন্ত্রায়ণ?

কাজেই যে আলেমসমাজ দীর্ঘকাল ধরে ইসলামী আইনের রক্ষক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন আইনের উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রদান না করেই নতুন ইসলামিজম শরীয়া এবং ন্যায়বিচারের আহ্বান জানায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আলেমসমাজের সক্রিয় প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ ছাড়া ইসলামী আইনের স্বরূপ এবং প্রশাসন কেমন হবে? এর সম্ভাব্য একটি উত্তর হচ্ছে, ইসলামী আইন হবে আইনসভায় প্রণীত নতুন আইনের মত। অ-আলেমদের দ্বারা প্রণীত এবং

www.pathagar.com

প্রয়োগকৃত এ আইনগুলো বরং ঐশী ইচ্ছার প্রকৃত চেতনা এবং বিষয়বস্তু উভয়ই ধারণ করবে- এগুলো হবে ঐশী ইচ্ছাকে ধারণকৃত বিষয় যাকে সমসাময়িক আইনে পরিণত করা হয়েছে। এগুলোতে শরীয়ার ইচ্ছার প্রতিফলনের পাশাপাশি এগুলোকে সমসাময়িক আইনি রূপ দেয়া হবে।

উসমানীয় আইনি কোড এক ধরনের ইসলামী আইনকেই আইনসভায় প্রণীত স্বতন্ত্র ইসলামী আইন হিসেবে উপস্থিত করে। এক বা একাধিক মাযহাবের উপর ভিত্তি করে প্রণীত এ ধরনের আইন কোন ধরনের আলেম সুলভ সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ ছাড়াই তৎকালীন বিচারকরা পরিচালনা করতে পারতেন। যে সব আধুনিক আরব রাষ্ট্র সে সময় সানহুরির কোডের বিভিন্ন সংস্করণ গ্রহণ করেছে সে সব রাষ্ট্র কিছুটা আইনের উপরিউক্ত ধরনের মডেলই অনুসরণ করেছে। সিভিল আইনের আদর্শের আলোকে এ কোড বা সূত্রবদ্ধ আইনগুলোর খসড়া করা হয়, সানহুরি যেখানে স্থানে স্থানে ইসলামী আইনি বিধির প্রতিফলন ঘটানোর জন্য সংশোধন করেন। এগুলোও ইসলামী আইন বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ ছাড়াই বিচারকরা পরিচালনা করতে পারতেন এবং এগুলো ছিল চেতনায় সংকর জাতীয় এবং নৈর্বাচনিকভাবে ইসলামী।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামী সংবিধিবদ্ধ আইন অবলম্বনের জন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা (যারা ইসলামী আইন বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন) এ উভয় ধরনের আইনি মডেল প্রণীত হয়। আইন প্রণয়নের এ ব্যবস্থার অসুবিধা ছিল এই যে, ঐশী উৎস এবং আইনের কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে যথাযথ ব্যাখ্যা করতে এটা ব্যর্থ হয়। ক্লাসিক্যাল ইসলামী আইনের ব্যাখ্যায় আল্লাহর ইচ্ছাকে যেভাবে নবীগণ এবং মুহাম্মাদ স. ব্যাখ্যা করে দিয়ে গেছেন আলেমগণ সেভাবেই ব্যাখ্যা করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন এবং এখনও আছেন। এ ধরনের ব্যাখ্যা করার কাজে জড়িত হবার কর্তৃত্ব খোদ সেই হাদীস থেকে এসেছে যে হাদীসটি আলেমসমাজ যেভাবে বুঝেছেন সেভাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং রাষ্ট্রও সে ব্যাখ্যাজাত আইন প্রয়োগের বাধ্যবাধকতা মেনে নিয়েছে। ফলস্বরূপ আইনি-শাসনতান্ত্রিক এই যৌক্তিক তত্ত্ব সৃষ্টি হয়েছে, যা আইন এবং রাষ্ট্র উভয়ের আইনি বৈধতা ঐশী উৎসের সূত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ইসলামপন্থীরা সৃষ্টিকর্তা তথা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কথাও বলেন। কিন্তু আল্লাহর আইনের বৈধ কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আলেমদের ভূমিকা না থাকায় ইসলামপন্থীরা তখন সমস্যায় পড়ে যান যখন তারা কেন এবং কিভাবে ইসলামী আইনের শাসন চালু হওয়া উচিত এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা

www.pathagar.com

করেন। গত শতাব্দীর অধিকাংশ সময় জুড়ে ইসলামপন্থীদের রচনায় এ বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এ সব সাহিত্য ইসলামী আইনকে সামাজিক মুক্তির একটি প্রতিশ্রুতিশীল উৎস হিসেবে বর্ণনা করেছে। কিন্তু এগুলোতে যথাযথ গুরুত্বের সাথে ইসলামী আইনকে আইন হিসেবে গ্রহণ করা এবং বাস্তবায়িত করার যৌক্তিকতা এবং যথার্থতা না শাসনতান্ত্রিকভাবে না ধর্মতাত্ত্বিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামপন্থীরা সুন্নী বিশ্বে খুব কমই প্রকৃত রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে পেয়েছে। ফলে তারা শরীয়ার যে সংস্করণ উপস্থাপন করে তার উৎস কী, তা তাদের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়নি, ঠিক যেমন সাধারণ রাজনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতি-প্রস্তাবনা গ্রহণ করারও তাদের প্রয়োজন হয়নি।

সাম্প্রতিক সময়ে নতুন একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে। সেটা হচ্ছে, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যেখানে জনগণ স্বাধীন ও মুক্তভাবে ভোট দিতে পারে, সেখানে ইসলামপন্থীদের নির্বাচিত হবার ভাল একটি সুযোগ থাকে। এ ব্যাপারটি এবং পাশাপাশি সরকারের ধরন বিষয়ক সর্বজনীন তত্ত্ব হিসেবে গণতন্ত্রের আবির্ভাব- এ দু'টো বিষয় ইসলামপন্থীদেরকে কখনো গণতন্ত্রের ভাষা ব্যবহারে এবং কখনো কখনো গণতন্ত্রের বাস্তব অনুশীলন করতে উৎসাহিত করেছে।[১৯]

একটি বাস্তব এবং জীবন্ত ইসলামপন্থী সাহিত্য ইসলাম ও গণতন্ত্রের পাশাপাশি অবস্থানের উপযুক্ততা সম্পর্কে নতুন তত্ত্ব হাজির করেছে। বিশেষত ইসলামপন্থীদের সাহিত্য প্রায়শই জনগণের সার্বভৌমত্ব বিষয়ক যে গণতান্ত্রিক মূলনীতি রয়েছে তার সাথে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব কিনা এ বিষয়ে প্রশ্নটি উত্থাপন করে। এ প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত যে যুক্তিগুলো রয়েছে সে বিষয়ে আমি অন্যত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।[২০]

---

১৯. 'Who Are We' লেখায় ইসলামিক কন্সটিটিউশনাল মোভমেন্ট "Dedication to Democracy in the Country" লেখাটি উপস্থাপন করেছে। তাদের অগ্রাধিকারের তালিকায় সুবিচার বা জাস্টিস প্রতিষ্ঠা করা প্রথম বিষয়। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে তারা স্বাধীনতাকে শরীয়া আইনের আলোকে দেখে। এ ছাড়া মুসলিম ব্রাদারহুডের ডেপুটি চেয়ারম্যান ড. এম. হাবিবের বিবৃতি দেখুন, "Habib : Democracy is Our Choice Toward a Civil State", *IkhwanWeb.com*, জুন ১৩, ২০০৭, http:// ikhwanweb.com/Article.asp?ID=807&SectionID=1 &Searching=1.

২০. দেখুন ফেল্ডম্যান, *After Jihad*; আরো দেখুন নোয়াহ ফেল্ডম্যান, "Shari'a and Islamic Democracy in the Age of Al-Jazeera", *Shari'a : Islamic Law in*

www.pathagar.com

এখানে কেবল অধিকাংশ ইসলামপন্থী যে উপসংহার টানেন সেটি উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে বলে মনে হয়। সেটা হচ্ছে : মূলধারার ইসলামিজম নীতিগতভাবে গণতন্ত্র এবং শরীয়ার পাশাপাশি অবস্থানের যৌক্তিকতাকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছে।

গণতন্ত্র এবং শরীয়ার মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে সে মেকানিজম সম্পর্কে চিন্তাবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে প্রস্তাবিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং প্রধান সমাধান হচ্ছে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়ে তারপর ইসলামী আইন প্রণয়নের জন্য একে ব্যবহার করা। এ তাত্ত্বিক মডেলের উপর ভিত্তি করে জনগণ অনেকটা সেভাবে কাজ করবে যেভাবে ক্লাসিক্যাল শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় শাসকরা ইতোপূর্বে কাজ করতেন এবং এভাবে আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়েছেন তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব জনগণ গ্রহণ করে নিবে।

কার্যক্ষেত্রে এ বিষয়ে মূলধারার সুন্নী ইসলামপন্থীদের অবস্থান হচ্ছে এরূপ: তারা বলেন গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত আইনসভা ইসলামী আইনের বিষয়বস্তু সম্বলিত আইনের খসড়া করবে এবং তার অনুমোদন দেবে। রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রই বলে দিবে ইসলাম বা ইসলামী আইন রাষ্ট্রীয় আইনের একমাত্র না কি অন্যতম উৎস হবে।[২১] যে বিষয়ে ইসলামী আইন একক উত্তর বা সমাধান দেয়নি সে ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ইসলামপন্থী আইনসভা ইসলামী মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত সমাধানমূলক আইন নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগ করে বের করে নিবে।

এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ইসলামী আইনের পেছনে যে তাত্ত্বিক ভিত্তি রয়েছে তাতে মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তন এসেছে এভাবে যে, শরীয়া সংরক্ষণের দায়িত্ব জনগণের ভোটে নির্বাচিত আইনসভার উপর অর্পণ করে

---

the Contemporary Context"-এ দেখুন, সম্পাদনা আব্বাস আমানাত ও ফ্রাঙ্ক গ্রিফিল (স্টানফোর্ড : স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৭), পৃ. ১০৪-১১৯

২১. উদাহরণ স্বরূপ "Hamas Legislative Elections Program" –এর লেখাটিতে ইসলামী আইনকে 'আইন প্রণয়নের মৌলিক উৎস' বলা হয়েছে; আরো দেখুন "The Electoral Programme of the Muslim Brotherhood for Shura Council in 2007" -এর তৃতীয় অধ্যায়, যেখানে মুসলিম ব্রাদারহুড "আইন প্রণয়নের মূল উৎস হিসেবে ইসলামী শরীয়ার সাথে দেশের আইনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য আইন সংশোধন করার" প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে, *IkhwanWeb.com,* জুন ১৪, ২০০৭, http:// ikhwanweb.com/ Article.asp?ID=822& SectionID=1&Searching=1.

www.pathagar.com

শরীয়ার গণতন্ত্রায়ণ করা হয়েছে। আর আইনসভা শরীয়ার উৎস থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করে সে অনুযায়ী আইন প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। বাস্তবে শরীয়ার এভাবে গণতন্ত্রায়ণের অর্থ হচ্ছে শরীয়ার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রথমেই জনগণ এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত থাকবে। যে আলেমসমাজ ঐতিহ্যগতভাবে শরীয়ার ব্যাখ্যা করে এসেছেন তাদের অনুপস্থিতির সমস্যার সমাধান করা হয়েছে তাদের পরিবর্তে নির্বাচিত আইনসভার মাধ্যমে। আর এ অবস্থায় যারা ইসলামী আইনের প্রয়োজন পূরণের জন্য যুক্তির (অর্থাৎ কিয়াসের) প্রয়োগ ঘটাতে চায় তাদের কাছে আলেমদের একদা চর্চাকৃত ইসলামী আইনের মূলনীতিবিজ্ঞান (Jurisprudence বা উসুলে ফিক্‌হ) যতটুকু প্রাসঙ্গিক ততটুকুই কার্যকর থাকে; বাকিটুকু তাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

তথাপি আধুনিকতা এবং সকলের সমান অধিকারের যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে সেগুলোর সমাধানে গণতন্ত্রায়িত শরীয়ার উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও শরীয়াকে একটি জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। প্রশ্নটি হচ্ছে, শরীয়া তার কর্তৃত্ব কার কাছে দিবে? যদি শরীয়া রাষ্ট্রীয় আইনের চূড়ান্ত উৎস হয়ে থাকে তবে তা অবশ্যই শাসনতন্ত্রেরও আইনের উৎস হবে। তবে শাসনতন্ত্র মূলত প্রণীত হয় উপস্থিত নাগরিকদের দ্বারা এবং আইন তৈরি হয় বিদ্যমান আইনসভার সদস্যদের দ্বারা। এ সমস্যার সমাধান ক্লাসিক্যাল শরীয়া এ বক্তব্যের মাধ্যমে করেছে যে, সে সময় আলেমদের দায়িত্ব ছিল কেবল ব্যাখ্যা করা; আইন প্রণয়ন নয় এবং তাদেরকে এ ব্যাখ্যা করার কর্তৃত্ব দিয়েছে খোদ শরীয়াই। কিন্তু গণতন্ত্রায়িত শরীয়ার ক্ষেত্রে একই উত্তর দেয়া যাবে না; যেহেতু আইন মূলত এখানে আইনসভায় অনুমোদিত হয় এবং এ কারণেও এ উত্তর দেয়া যাবে না যে, ক্লাসিক্যাল শরীয়ায় কোথাও নির্বাচিত আইনসভার কোন কথা নেই।

গণতন্ত্রায়িত শরীয়ার জন্য উপরের প্রশ্নের উত্তর জটিল এবং অনিশ্চিত। শরীয়ার বর্ণিত বিষয়বস্তুকে সরাসরি স্পর্শ করে এমন আইনগুলো সম্পর্কে বলা যায় যে, এগুলো কেবল শরীয়ার বিষয়বস্তুকে নিশ্চিত করে এবং এর বাস্তবায়নের জন্য এগুলো বাস্তবভিত্তিক। যদি আলেমসমাজ আইনসভায় আইন প্রণয়নকে অস্বীকার করে থাকেন, তবে আইনসভাও আইনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন অস্বীকার করে। অন্যান্য আইন সম্পর্কে বলা হয় যে, এগুলো শরীয়া বা ইসলামের চেতনাকে ধারণ করে এবং এ সমস্ত আইনের বিষয়বস্তু অন্তত তত্ত্বগতভাবে যে কেউ পর্যালোচনা করতে পারে। এ সব উত্তর যদিও

www.pathagar.com

তত্ত্বগতভাবে পুরোপুরি যথার্থ নয়, বাস্তবে বেশির ভাগ সময়ই এগুলো টেকসই উত্তর। তবে 'যদি আইনসভা এটাকে ভুল মনে করে তাহলে কী হবে'- এ ধারণাগত সমস্যাটি আমরা যদি বিবেচনা করি তবে এ উত্তরগুলো ঠিক থাকে না।

শরীয়ার শাসনতান্ত্রিকীকরণ

সমস্যাটি সঠিকভাবে বলতে গেলে এভাবে বলতে হয় : যদি আইনসভায় এমন আইন অনুমোদন দেয়া হয়, তা সঠিক বিশ্বাস বা ঈমান নিয়েই করা হোক বা না হোক, যা ইসলামী আইন বা ইসলামী মূল্যবোধের সঠিক বিষয়বস্তুকে ধারণ করে না তবে কী করা হবে? এ সমস্যাটি গণতন্ত্রায়িত শরীয়া নিয়ে বিদ্রূপ করার হুমকি সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, 'আমার উম্মত কোন ভুলের উপর একমত হবে না'- আইনের উৎস হিসেবে ইজমা সম্পর্কিত আইনি মতবাদের উৎস বা দলিল এ হাদীসটি। তবে ইসলামের ইতিহাসের একেবারে প্রথম দিকে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আলেমসমাজ কখনো কোন ভুলের উপর একমত হবেন না। গণতান্ত্রিক জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজেরাই যেখানে ভুল করতে পারে, সেখানে তারা কিভাবে শরীয়াকে নির্ভুল ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? অথচ এখানে শরীয়া হচ্ছে অবশ্যপালনীয়; আর এ জন্য শরীয়াকে অবশ্যই জনগণের উপর কর্তৃত্বপূর্ণ হতে হবে।

এখানে ইসলামপন্থী শাসনতন্ত্র বিষয়ক তাত্ত্বিকগণ এক ধরনের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছেন যা সমসাময়িক আন্তর্জাতিক শাসনতান্ত্রিক চর্চার প্রতিফলন ঘটায়।[২২] তারা আইনসভার কার্যাবলীর বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার পরামর্শ দেন। আইনসভা শাসনতন্ত্র অনুযায়ী চলছে কি-না কেবল তা নিশ্চিত করার জন্য নয় বরং এটা ইসলামী আইন বা মূল্যবোধ লঙ্ঘন করছে না সেটাও নিশ্চিত করার জন্য তারা এ পরামর্শ দেন। অনেক সময় যাকে 'অপছন্দ প্রকাশক ধারা' বলা হয়, যেটা ইসলামের জন্য অপছন্দনীয় যে কোন আইন বাতিল করে দেয়ার ম্যান্ডেট বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করে, এ ধরনের ধারা বা ক্লজ সাম্প্রতিক সময়ে প্রণীত অনেক শাসনতন্ত্রকে ইসলাম ও গণতন্ত্রের মাঝে আপস তথা সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এর উদাহরণ পাওয়া যাবে ২০০৪ সনের আফগান শাসনতন্ত্রে কিংবা ২০০৫ সনের ইরাকী শাসনতন্ত্রে।[২৩]

---

২২. দেখুন, নোয়াহ ফেল্ডম্যান, "Shari'a and Islamic Democracy"

২৩. এমন কি নিষেধসূচক বা অপছন্দ প্রকাশক ধারাবিহীন অবস্থায় এক ধরনের ইসলামী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা সম্ভব। যেমন, মিসরে ইসলামী আইনকে আইনের উৎস

www.pathagar.com

আমি যেটাকে 'ইসলামী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা' বলব তার উৎসসমূহ একটির সাথে আরেকটি সাদৃশ্যহীন; তবে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার যোগ্য। এ সব উৎসের প্রতি দৃষ্টি দেবার পূর্বে এ মডেলের প্রায়োগিক প্রভাবের দিকে আমাদের লক্ষ্য করা উচিত। ইসলামী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা একটি দেশের সর্বোচ্চ বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানকে সে দেশে ইসলামী আইনের সাথে দেশের আইন সামঞ্জস্য বিধান করছে কি না তার গ্যারান্টি প্রদানকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। সাধারণ অর্থে এ ধরনের আদালত কোন আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান নয়। তবে প্রণীত যে কোন আইন বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোন আদালতের মত এরও প্রাসঙ্গিক বিচার বিভাগীয় আদর্শ লঙ্ঘন করার কারণে কিছু আইনি ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ করে অন্য কিছু আইনি ব্যবস্থাকে ম্যান্ডেট প্রদানের কার্যকর ক্ষমতা ও দায়িত্ব দুটোই রয়েছে। সর্বত্র বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সমালোচকরা এই অভিযোগ করে থাকে যে, পর্যালোচনার এ কাজটি মূলত আইন প্রণয়নেরই নামান্তর। সত্যি কথা বলতে কি, কোন প্রণীত আইনকে মুলতবী বা বাতিল ঘোষণা করার এ কাজটি সহজাতভাবেই আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানের সমান।[২৪]

আইন প্রণয়নকারীর যে বৈশিষ্ট্য বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার মধ্যে দেখা যায় তা এই দাবির দ্বারা বিশেষভাবে হালকা হয় যে, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত এ আদালত মূলত প্রাসঙ্গিক মান (Standard) ব্যাখ্যা করে এবং সেটাকে পর্যালোচনাধীন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। অন্য কথায়, ইসলামী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা কর্মে নিয়োজিত আদালত অবশ্যই ইসলামী আইনের বিষয়বস্তু বা ইসলামী মূল্যবোধ বা আর যা কিছু শাসনতন্ত্রে বলা থাকুক সেটা ব্যাখ্যা করে তা প্রাসঙ্গিক মানসম্মত কি-না সেটা তুলে ধরা এবং সেটা পর্যালোচনাধীন আইনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কাজে নিয়োজিত থাকবে। এ ধরনের আদালত দ্বারা গৃহীত ব্যাখ্যা আইনসভার জন্য অবশ্যপালনীয় হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার একে প্রত্যাহার করে নেয়ার ক্ষমতা না থাকবে এবং একে অবশ্যই উক্ত আদালতের নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে।

বানানোর জন্য যে ধারা রয়েছে তা শাসনতান্ত্রিক কেস আইনের একটি গুচ্ছ সৃষ্টি করেছে। দেখুন, লাম্বারদি, *State Law as Islamic Law in Modern Egypt*

২৪. উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, র‍্যান হার্শল (Ran Hirschl), *Toward Juristocracy : The Origins and Consequences of New Constitutionalism* (ক্যামব্রিজ : হারভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৪)

www.pathagar.com

এভাবে দেখা যাচ্ছে, একদা আলেমসমাজের যে অবস্থান ছিল ইসলামী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা এ কাজে নিয়োজিত আদালতের অবস্থানকে সে পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। আলেমদের মতই পর্যালোচনাকারী আদালতের বিচারক ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা হিসেবে তার কাজটি করছে। আলেমদের মতই বিচারক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছে, যে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের কোন সম্ভাবনা নেই। আলেমদের মতই বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার কাজে নিয়োজিত আদালতের বিচারক নিজেকে বিচার বিভাগ এবং কর্তৃত্বের অন্যান্য উৎস যেমন আইনসভা এবং নির্বাহী বিভাগের মাঝে ক্ষমতার চমৎকার ভারসাম্য রক্ষাকারী হিসেবে নিয়োজিত দেখতে পাবে।

কিন্তু ইসলামী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার কাজে নিয়োজিত বিচারকরা অবশ্যই আলেম নয়। ইসলামপন্থী শাসনতন্ত্র ইসলামী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা করতে পারে, তবে সেটি বিদ্যমান বিচার বিভাগকে তার স্থানে অক্ষুণ্ন রেখে করতে হবে; যে বিচার বিভাগ সিভিল আইনে প্রশিক্ষিত বিচারকদের দ্বারা পরিচালিত; আলেমদের দ্বারা নয়। এ সব বিচারকের প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তিগত আইনি বৈধতার উৎস ক্লাসিক্যাল আলেমদের প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তিগত আইনি বৈধতার উৎস থেকে একেবারেই ভিন্ন হবে। আফগানিস্তানে যেমনটি দেখা গেছে যে, কিছু লোক শরীয়া বিষয়ে হয়ত প্রশিক্ষিত হতে পারে, কিন্তু তাদের কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থান (Position) তাদের প্রশিক্ষণগত যোগ্যতার উপর নির্ভর করবে না, বরং তাদের এ দায়িত্ব বা পদে আসীন থাকার উপরই সেটি নির্ভর করবে। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের সাথে সম্পর্কিত একটি স্মরণীয় উক্তির আলোকে বলা যায় যে, তারা হচ্ছে চূড়ান্ত; তারা অমোঘ বলে চূড়ান্ত নয়, বরং চূড়ান্ত বলেই অমোঘ। ঔপনিবেশিক যুগের বিচারকদের মত নয়, যাদের বদলে এরা এসেছে; এ বিচারকরা ইসলামী আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষিত নয়। তবে তাদের ইসলামী আইন বা ইসলামী মূল্যবোধ নিশ্চিত করা এবং বাস্তব ঘটনায় এগুলোর প্রয়োগ ঘটানোর আইনি-শাসনতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে।[২৫]

ইসলামী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনায় নিয়োজিত বিচারকরা আলেমদের থেকে আরো একটি ক্ষেত্রে ভিন্ন রকম হবে। সেটা হচ্ছে একটি লিখিত

---

২৫. লামবারদি (Lambardi), *State Law as Islamic Law in Modern Egypt*, পৃ. ২-৩ (শরীয়ার কোন ধারা কার্যকর করার মাধ্যমে সেক্যুলার শাসনতান্ত্রিক আদালতের ব্যাখ্যামূলক কাজের প্রকৃতি নিয়ে বিভিন্ন রকম দৃষ্টিভঙ্গিকে বিবেচনা করা প্রসঙ্গে..)

www.pathagar.com

শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে তাদের সুস্পষ্ট দায়িত্ব তাদের প্রতি অর্পিত হয়। আলেমরা যেভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হত তা থেকে ভিন্নভাবে বর্ণিত বিচারকরা একটি বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব লাভ করে, যে বাছাই প্রক্রিয়াটি যেকোন আধুনিক রাষ্ট্রে যে ধরনের রাজনৈতিক কৌশল থাকে পুরোপুরি সে ধরনের রাজনৈতিক কৌশলের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। হাইকোর্টের বিচারকদের বাছাই প্রক্রিয়া একেক দেশে একেক রকম। কোথাও সকল পর্যায়ে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বিচারকরা নিয়োগপ্রাপ্ত হয় আবার কোথাও বিচার বিভাগীয় একটি কমিটির মাধ্যমে স্ব-বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। যে দেশে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার এ ধারাটি বিকাশ লাভ করেছে সেখানেই এ দায়িত্বের জন্য বিচারক বাছাইয়ের কাজটিকে রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং যারা শাসনতান্ত্রিক পরিণতির ব্যাপারটিকে গুরুত্ব প্রদান করে তারাই এতে নির্বাচিত হবার জন্য অতি আগ্রহের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

এখানে সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যে ব্যাপারটি রয়েছে সেটা হচ্ছে, ইসলামী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার কাজে নিয়োজিত বিচারকরা তাদের পূর্বসূরী আলেমদের থেকে লক্ষণীয়ভাবে ভিন্ন এ ক্ষেত্রে যে, গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত একটি আইনসভার সাথে তাদের নিজেদের 'আইন প্রণয়ন ও ব্যাখ্যাকারী কর্তৃত্ব'কে ভাগাভাগি করতে হবে বা করতে হয়। ইসলামী ভাবধারার আইন অবলম্বন করার শাসনতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা প্রাথমিকভাবে আইনসভার কাঁধেই এসে পড়ে। অতএব শাসনতান্ত্রিকীকরণকৃত শরীয়া গণতন্ত্রায়িত শরীয়ার পাশে এসে অবস্থান নেবে, যে গণতন্ত্রায়িত শরীয়া সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। হ্যাঁ, কোথাও ইসলামী মূল্যবোধ মেনে চলতে বাধ্য, কিন্তু বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই- এমন আইনসভার অস্তিত্ব থাকতেই পারে। কিন্তু আইনসভা ছাড়া বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার কার্যকর এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন করা হলে আশা করা যায় যে, এর প্রভাবে আইনসভা এমন ভাষায় আইন প্রণয়ন করবে যা পর্যালোচনাকারী আদালতের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত একটি আইনসভা, যা আইনের ধারাসমূহ শরীয়া অনুযায়ী- নিদেনপক্ষে শরীয়ার বিরোধিতা না করে প্রণয়ন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, এমন একটি আইনসভা ইসলামী আইনের ইতিহাসে একটি অনন্য পদক্ষেপের কথা বলে; পদক্ষেপটি হচ্ছে আইনের গণতন্ত্রায়ণ। আইনের গণতন্ত্রায়ণ হয় এভাবে যে, সাধারণ নাগরিকগণ তাদের শাসন করার নিমিত্ত যে আইন রয়েছে তার বিষয়বস্তু তাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে নিজেরা ঠিক করে নেয়।

www.pathagar.com

ইসলামপন্থী শাসনতান্ত্রিক মডেল : সম্ভাবনাময় না কি নিষ্ফল?

যে কোন একটি প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে ইসলামী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনাকে শাসনতান্ত্রিকী করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গণতন্ত্রায়িত শরীয়ার সম্ভাবনা দুয়ের যে কোন একটি হবে- হয়ত উসমানিয়া সাম্রাজ্যের পতনের পর ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় অগ্রগতি হিসেবে আবির্ভূত হবে, অন্যথায় একটি বিপর্যয় হিসেবে আবির্ভূত হবে। প্রথমটি আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নির্দেশক এবং পরেরটি হতাশাবাদীর নির্দেশক। আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয় এ বাস্তবতা লক্ষণীয় হওয়ার মাধ্যমে যে, তানযিমাত নামের সংস্কারকর্মের ব্যর্থতা- বিশেষত সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ কর্তৃক শাসনতন্ত্র প্রত্যাহার এবং আইনসভার বিলুপ্তি ঘোষণা বহু মুসলিম প্রধান দেশকে অনিয়ন্ত্রিত নির্বাহীর শাসনের পথে ঠেলে দিয়েছে। আলেমসমাজের হাত থেকে আইন প্রণয়নের প্রকৃত ক্ষমতা নির্বাচিত আইনসভার কাছে হস্তান্তর করা হলে সেটি হয়ত এর চেয়ে অনেক ভাল ফলাফল বয়ে আনত; এমন কি তা আলেমদের আইনের শাসনের ঐতিহ্যকে একটি আধুনিক এবং গণতান্ত্রিক ধরনে পরিবর্তিত করেও সেটা ধরে রাখতে পারত। কিন্তু সেটা হয়নি।

এই প্রেক্ষাপটে আশাবাদীদের মতে, বর্তমানে গণতন্ত্রায়িত শরীয়া 'সঠিক পথে' ফিরে আসার সুযোগের চেয়ে কিছু কম বোঝায় না। সঠিক পথ (Track) হচ্ছে আইনের শাসনের যে ইসলামী ঐতিহ্য রয়েছে সেটিকে সাম্প্রতিক সময়ে মুসলিম বিশ্বে উদ্ভূত গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার সাথে পুনঃস্থাপন করা। এ ধরনের আশাবাদী অবস্থার ভিত্তিতে এটি (গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা বা স্পৃহা) ইসলামপন্থীদেরকে 'ইসলামী সুবিচারে'র প্রতি তাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষাসহ দুর্নীতিগ্রস্ত নির্বাহীর রাষ্ট্রভিত্তিক শাসন থেকে বের করে এনেছে। এ ধরনের চিন্তাধারা অনুযায়ী ইসলামপন্থীরা আলেমদেরকে এড়িয়ে গিয়ে এবং কিছুটা ভিন্নভাবে গণতান্ত্রিকরূপে ইসলামী রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে মুসলিম বিশ্বকে বিরাট সুবিধা বা আনুকূল্য দিচ্ছে।

অন্যদিকে হতাশাবাদীর পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখলে বলতে হয়, নির্বাচিত আইনসভা, শক্তিশালী বিচার বিভাগ এবং ইসলামী মূল্যবোধের সমন্বয়ে আইনের শাসন পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা রাজনৈতিক-আইনি সংস্কারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আনাড়ি ধরনের অলীক কল্পনামাত্র। যা হোক, এখানে নানা ধরনের ভাব ও চিন্তাধারার অভাব নেই, কিন্তু এগুলো বাস্তবে রূপদানের জন্য প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত আইনসভার অস্তিত্বের

www.pathagar.com

হয়ত আশা করা যায়- যেমনটি ইরাকের অভিজ্ঞতায় এবং কিছুটা কম হলেও আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়- কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আইনসভা থাকলেই সেটি খুব আশাপ্রদ হবে। এমন নাও হতে পারে যে, সে আইনসভা হবে উদ্দীপক, হবে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতার উৎস, নয়ত অন্তত আরব এবং মুসলিম বিশ্বের বহু দেশের বর্তমানের ছলনামূলক ও কপট আইনসভার চেয়ে বড় ও ভাল কিছু হবে- সে আত্মবিশ্বাসের উৎস হবে।

ইসলামী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার কাজে নিয়োজিত আদালতের ব্যাপারেও এ কথা ততোধিক সত্য। এ ধরনের বিচার বিভাগীয় একটি প্রতিষ্ঠানে সদস্য নিয়োগদান এবং তাদেরকে এ মর্মে নির্দেশনা দেয়া যে, তাদের আইনসভাকে বাতিল করা এবং নির্বাহী বিভাগকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা রয়েছে- এটা এক ধরনের কাজ। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নিয়োজিত অন্য যে কোন ব্যক্তির জন্য, যেমন সরকারের অন্যান্য শাখায় নিয়োজিত অন্য যে কেউ বা জনসাধারণ বা পুলিশ বিভাগ বা বেসামরিক প্রশাসনে নিয়োজিত ব্যক্তির উক্ত আদালতের নির্দেশনা মেনে চলা একেবারেই ভিন্ন ব্যাপার। এ অবস্থায় পর্যালোচনাকারী আদালতের হয়ত তার কর্তৃত্বের হাত গুটিয়ে নেয়া এবং অকার্যকর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, নয়ত একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতা নিয়ে নেয়ার লোভ অনেক বেড়ে যায়।

নতুন পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ কাজ আত্মস্থ করতে এবং যথাযথভাবে সম্পাদন শুরু করতে কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত সময় লেগে যায়। তারপরও দেখা যায় যে, পরিকল্পনাকারীরা যেভাবে কাজগুলো হবে বলে চিন্তা করে প্রতিষ্ঠানগুলো সে কাজ যেভাবে সম্পাদন করে সেগুলো তাতে শেষ পর্যন্ত অন্যভাবে বাস্তবায়িত হয়। রাজনৈতিক সংস্কৃতিও নিঃসন্দেহে সে রকমই হবে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অবশ্যই নির্বাচকমণ্ডলী থাকবে বা নির্বাচকমণ্ডলী সৃষ্টি করবে যারা সাংবিধানিক সংকটের সময়-যা অবশ্যাম্ভাবীভাবে সৃষ্টি হয়- এদেরকে সমর্থন করতে পারবে। তারকা ব্যক্তিত্বদের অবশ্যই যথার্থভাবে এক কাতারে শামিল হতে হবে, যেন যোগ্যতাসম্পন্ন, বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়কগণ রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল করতে এগিয়ে আসে। কিন্তু এ ধরনের সব শর্ত পূরণ হবে তার সম্ভাবনা খুবই কম, নিতান্তই নগণ্য।

সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে, যে একক প্রতিষ্ঠানটি ঐতিহাসিকভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং ঠিক রাখতে কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন করেছে সে প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আলেমদেরকে পরিত্যাগ করা এবং ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন এবং কার্যকারিতার ক্ষেত্রে তাদের কেন্দ্রীয় এবং সক্রিয় ভূমিকার স্বীকৃতি দিতে

www.pathagar.com

ব্যর্থতাই হচ্ছে ইসলামপন্থীদের প্রধান ভুল। আলেমদের তাদের পুরনো অবস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়াই ইসলামী আইন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার অর্থ হচ্ছে আত্মা থেকে দেহকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে এ উদ্যোগের ব্যর্থ হওয়া নিশ্চিত করা। আইনি বৈধতা সৃষ্টি এবং বৈধতাদানে সক্ষম প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি সম্পর্কিত জীবন্ত ও সক্রিয় মতবাদ হিসেবে শরীয়া ক্লাসিক্যাল ইসলামী রাষ্ট্রকে সফল করে তুলেছিল। কাগজে লিখিত একগুচ্ছ বিধি হিসেবে, এমন কি গণতান্ত্রিক আইনসভা কর্তৃক যদি তা অনুমোদিতও হয় এবং হাইকোর্ট বা উচ্চ আদালত দ্বারা তা কার্যকরও হয়, শরীয়ার এমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক নির্মাণ কাঠামো নেই যাতে শরীয়া কোনভাবে প্রাণ সঞ্চার করতে পারত। শরীয়া ছাড়া আলেম সমাজ কিছুই না। তবে এটাও হতে পারে যে, আলেমদের ছাড়া শরীয়াও একটি ন্যায়সঙ্গত এবং ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্রের কাঠামো প্রদানে প্রত্যাশা অনুযায়ী বেঁচে থাকতে পারবে না বা বেঁচে থাকতে পারে না।

ইরানী ধারা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বব্যাপী শাসনতান্ত্রিক উপায়ে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা রীতি বিস্তারের কাছে সুন্নী ইসলামপন্থীদের প্রত্যাশিত ইসলামী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ব্যাপারটি ব্যাপকভাবে ঋণী। একে হয়ত উল্টোভাবে হলেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আইনি ধারার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা যায়। এই ধারা স্থানীয় প্রথাগত অথবা ধর্মীয় আইনের প্রয়োগের অনুমোদন দিয়েছে। তবে তা এই শর্তে যে, এ ধারাগুলো দৃশ্যত সমতা, প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার এবং পশ্চিমা বিচারকদের বিবেকবোধের বিরোধী নয়, যারা এগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করবে।[২৬] 'বিরোধিতার ধারা' বা 'ক্লজ' কথাটি প্রায়শই এমন আইনি ধারা বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যেগুলো বর্তমান দশকের মাঝামাঝি থেকে ইরাক এবং আফগানিস্তানের শাসনতন্ত্রে রয়েছে। এ ধারাগুলো পাকিস্তানী শাসনতন্ত্র থেকে ধার নেয়া, যে শাসনতন্ত্র ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার ধারাবাহিকতায় 'ইসলামের নির্দেশনা'র 'বিরোধী' আইন নিষিদ্ধ করেছে।[২৭]

---

২৬. দেখুন, এইচ এইচ মার্শাল, *Natural Justice*, (লন্ডন : সুইট ও ম্যাক্সওয়েল, ১৯৫৯), পৃ. ১৬৫-৭৩

২৭. ১৯৭৩ সনের শাসনতন্ত্রে এ ধারাটি অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। দেখুন আর্টিক্যাল ২২৭ (১)। এর উৎস সম্পর্কে জানতে দেখুন, চার্লস এইচ কেনেডি, "Repugnancy to Islam-Who Decides? Islam and Legal Reform in Pakistan", *International Comparative Law Quarterly*, সংখ্যা- ৪১ (অক্টোবর ১৯৯২), পৃ. ৭৬৯, ৭৭০-৭১

www.pathagar.com

ঔপনিবেশিক আমলের পর ন্যায়বিচারের পশ্চিমা ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে নিজেদের বিশেষ ইসলামী বিচার বিভাগীয় ভেটো প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করে তত্ত্বাবধানের এই পশ্চিমা ব্যবস্থাটিকে গ্রহণ করার এবং এর বিরুদ্ধে ইসলামী আইনি চর্চার সম্ভাব্য অননুমোদন আদালত ও শাসনতন্ত্রের জন্য আপাতদৃষ্টিতে যথার্থ ছিল।

কিন্তু এ বিষয়টির ইসলামী সংস্করণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস রয়েছে, যেমনটি ইরাকী ও আফগান শাসনতন্ত্রে দেখা যায়। ইসলামী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বা নিরীক্ষার প্রথম উদাহরণ দেখা যায় ১৯০৬-০৭ সনের ইরানী শাসনতন্ত্রে। এ শাসনতন্ত্রটি ছিল পশ্চিমা উল্লেখযোগ্য হস্তক্ষেপ বা প্রভাব ছাড়াই আলেমদের সক্রিয় অংশগ্রহণে মুসলিমদের দ্বারা মুসলিমদের জন্য প্রণীত একটি দলিল। ইরানের শিয়া আলেম, ইসলামী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার তাদের নিজস্ব ধরন, তাদের স্বল্পমেয়াদী শাসনতন্ত্র এবং শেষ পর্যন্ত আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর উত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি বিষয়গুলো আমি সুন্নী প্রেক্ষাপটে আলেমদের পতন এবং ইসলামপন্থীদের উত্থানের যে কাহিনী বলে আসছি তার বিপরীতে একটি আকর্ষণীয় এবং উদ্দীপক ধারণা দেয়। এটা এমন এক পথ দেখায় যা সুন্নী বিশ্বে নেই এবং এই প্রক্রিয়ায় এটা আলেম শ্রেণীর পুনরুত্থানের যুগপৎ সুবিধা ও ঝুঁকি প্রকাশ করে।

ইরানের শাসনতান্ত্রিক ঘটনাবলীকে (যার শুরু ১৯০৫-১৯১১ সনের শাসনতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে এবং সেখান থেকে ১৯৭৯ সনের ইসলামী বিপ্লব ও তার পরবর্তী সময় পর্যন্ত) অবশ্যই শিয়া মতবাদের বিশেষ রাজনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক তত্ত্বের আলোকে দেখতে হবে। আরো সাধারণভাবে দেখলে দেখা যায়, শিয়া আইনি তত্ত্বের মত শিয়াদের শাসনতান্ত্রিক চিন্তাধারাও সুন্নীদের মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবু শিয়া মতবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্মতাত্ত্বিক অবস্থান এবং ঐতিহাসিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সুন্নীদের থেকে তাদের পার্থক্যসমূহ বিশেষ লক্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ।

রাসূলুল্লাহ স. এর উত্তরাধিকারী কে হবেন এ বিষয়ে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে দ্বিমত হবার কারণেই সুন্নী ও শিয়া- এই দু'টো সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎপত্তিকালীন সময় থেকে গুরুতর পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। আমরা প্রথম অধ্যায়ে যেমন দেখেছি রাসূলুল্লাহ স.-এর উত্তরাধিকারী হবার ব্যাপারে সুন্নী পদ্ধতি বা চিন্তাধারা হচ্ছে যোগ্যতম প্রার্থীকে এ পদের জন্য বাছাই করতে হবে এবং তাকে অনুমোদন দেবে তারা যাদের 'সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখা এবং সামাজিক বন্ধন শিথিল করে দেয়ার'

www.pathagar.com

ক্ষমতা রয়েছে। এ বিষয়টি আলেমসমাজের জন্য সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত সুযোগ এনে দেয়। তাৎক্ষণিকভাবে আলেমসমাজ বাস্তব অবস্থা বিচারে যদি নাও হয় অন্তত আইনের দিক থেকে ঐ ভূমিকা (উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তির অনুমোদন) দাবি করে। আমি মনে করি, শাসকের বৈধতার নিয়ন্ত্রক হিসেবে এবং পাশাপাশি আলেমদের ব্যাখ্যাসম্মত আইন মানতে শাসকের যে দায়বদ্ধতা তা বাস্তবে রূপায়ণকারী হিসেবে আলেমদের সফল প্রয়াসের ক্ষেত্রে তাদের এই দাবি অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

তবে শিয়াদের মতে রাসূলুল্লাহ স.-এর উত্তরাধিকারী হবার কথা ছিল রাসূলের পরিবারের লোকজন অর্থাৎ তাঁর চাচাতো ভাই এবং জামাতা আলী ইবনে আবী তালিবের রা. এবং তারপর তাঁর বংশধরদের- যেমন শহীদ হুসাইন রা. এবং তাঁর অধস্তন বংশধরদের। যদি সম্পূর্ণ যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ স.-এর উত্তরাধিকার হিসেবে দৃশ্যত ঐশী ইমামের (শিয়াদের মতে ইমামের ব্যক্তিগত গুণাগুণ এত বেশি যে, তা তার উপর দেবত্ব আরোপের কাছাকাছি) উপর এই নির্ভরতা আলেমদের তুলনামূলক ক্ষুদ্র ভূমিকাকেই নির্দেশ করে; কেননা নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে স্রষ্টার প্রতিনিধির অধিকতর যোগ্যতার অধীনেই আলেমদের আইন ব্যাখ্যার ক্ষমতা থাকবে। বাস্তবে যদিও উল্টোটি ঘটেছে। মূলধারার শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস করে উত্তরাধিকারের ধারায় বারোতম ইমামের মাধ্যমে উত্তরাধিকারের ধারা সমাপ্ত হয়ে গেছে, যিনি হচ্ছেন কথিত অপ্রকাশ্য ইমাম, যার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা তার ত্রাণকর্তা রূপে পুনরুত্থানের মাধ্যমে কোন একদিন শেষ হবে।

শিয়াদের অন্যান্য উপদল যেমন ইসমাইলিয়া বা যায়েদীগণ বার ইমামে বিশ্বাসীদের মত নয়; এরা পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া হিসেবে জীবিত ইমামকে বিশ্বাস ও ভক্তি করে। বার ইমামে বিশ্বাসী শিয়া মতবাদে বিশ্বাসীদের মতে মূলত মানবীয় শাসনের মৌলিক অবস্থা হচ্ছে অনুপস্থিত; কিন্তু সত্যিকার এবং আইনত বৈধ শাসকের নির্দেশনা ছাড়া পৃথিবীতে বাস করার শামিল। ইমামের অনুপস্থিতিতে, শিয়া আলেমরা যেমনটি বলে, ঐশী বার্তা এবং এর মধ্যে যে আইনের কথা থাকে সেগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায়।[২৮] এই ভূমিকা যা সুন্নী আলেমদের ভূমিকা থেকে একেবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন

---

২৮. শিয়া শাসনতান্ত্রিক চিন্তাধারা সম্পর্কে সতর্কতার সাথে দেখুন আব্দুল আযীয শাসিদিনা (Sachedina), *The Just Ruler In Shi'ite Islam : The Comprehensive Theory of the Jurist in the Imamite Jurisprudence,* (অক্সফোর্ড : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি

www.pathagar.com

তা নয়- শিয়া আলেমদেরকে তাদের সুন্নী প্রতিপক্ষের চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান করে তুলেছে। সুন্নী আলেমদেরকে যেখানে ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক অধিকার ও দায়িত্বের অধিকারী খলীফার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হতো, সেখানে শিয়া আলেমরা শাসকের সঙ্গে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া করত, যে শাসকদের সত্যিকার ইমামের সম্মিলিত ধর্মীয়-রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে অনেক কম ক্ষমতা ছিল, অথবা তারা (শাসকরা) যদি সুন্নী হতো তবে শিয়াদের চিন্তাধারা অনুযায়ী তারা নীতিগতভাবে সম্পূর্ণ অবৈধ বলে গণ্য হতো।

যখন এই ছিল অবস্থা, বিভিন্ন কারণে তাদের ধর্মতত্ত্ব নিয়ে শিয়াদের তেমন কিছু করার সুযোগ ছিল না। এ অবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন হবার মত এমন অবস্থান বা সুযোগ তাদের ছিল না বললেই চলে। ফলে মধ্যযুগে শিয়া শাসন সংক্রান্ত শাসনতান্ত্রিক তত্ত্ব সুন্নীদের শাসনতান্ত্রিক তত্ত্বের তুলনায় অনুন্নত ছিল। এর ফলে মধ্যযুগের বেশ কিছু শিয়া রাষ্ট্রে, যেমন ফাতিমীদের শাসনাধীন মিসরে, আশ্চর্যজনকভাবে আলেমসমাজ এবং সরকার- এ দুয়ের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল সুন্নী সরকারের অধীনে আলেম ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্কের অনুরূপ। তবে ষোল শতাব্দীতে ইরানে সাফাভী রাজবংশ বার ইমাম সংক্রান্ত শিয়া মতবাদ গ্রহণ করলে এর পরিবর্তন শুরু হয়। সাফাভীদের দু'শ বছরেরও বেশি সময়ের শাসনের পর ইরানের পরবর্তী রাজবংশগুলো সাফাভীদের শিয়া মতবাদ অক্ষুণ্ন রাখে। এভাবে ইরানের শাসকবর্গ অর্ধ সহস্রাব্দকাল ব্যাপী আলী রা. এর দল ('শিয়ায়ে আলী')-এর ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। অতএব অদৃশ্য ইমামের যুগের (অর্থাৎ বার ইমামে বিশ্বাসী শিয়াদের যুগের) ব্যাপকভিত্তিক শাসনতান্ত্রিক তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সে দেশে আলেমদের ভূমিকা বিকাশ লাভ করেছিল।

ইরানি শিয়া মতবাদে যে বিষয়টির উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে সেটা হচ্ছে আলেমদের মধ্যে অতি উন্নত এবং আনুষ্ঠানিক পদসোপান ব্যবস্থা। এটি সম্ভবত আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের ঐতিহ্যবাহী পারসিক প্রতিভার কারণে সম্ভব হয়েছিল।

প্রেস, ১৯৮৮); আরো দেখুন হুসেইন মুদাররেসী কর্তৃক ব্যাপক ভিত্তিক এবং জ্ঞান-উদ্দীপক পর্যালোচনা "The Just Ruler or the Guardian Jurist : An Attempt to Link Two Different Shi'ite Concepts", *Journal of the American Oriental Society*, ভলিয়ুম-১১১, সংখ্যা : ৩ (১৯৯১), পৃ. ৫৪৯-৬২। নিকি কেডি জোর দিয়ে বলেছেন যে, ইমামের ইচ্ছাকে আলেমরা ব্যাখ্যা করার যে দাবি "বারো ইমাম সম্পর্কিত প্রথম দিকের তত্ত্বে তার কোন ভিত্তি নেই", এটি পরবর্তীতে সংযোজিত হয়েছে, নিকি কেডি, 'The Ulama's Power in Modern Iran", পৃ. ২১৭

www.pathagar.com

এই আমলাতান্ত্রিক সংগঠন ইসলাম-পূর্ব পারস্য সাম্রাজ্য থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এবং এটি কখনো সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত বা লুপ্ত হয়নি। শিয়াগণ আলেমদের মধ্যে অনেকগুলো আনুষ্ঠানিক দাপ্তরিক স্তরবিন্যাস সৃষ্টি করে- সাধারণ 'মোল্লা' থেকে শুরু করে একেবারে 'আয়াতুল্লাহ' বা 'আল্লাহর নিদর্শন' পর্যন্ত। এরূপ স্তর এবং স্তরের মাঝে পদোন্নতি নাযাফ ও কারবালা এবং আরো অনেক পরে (বিংশ শতাব্দীতে) কোম[২৯] শহরের বিখ্যাত শিয়া শিক্ষাকেন্দ্রে সমবেত আলেমদের দ্বারা অনুমোদিত এবং পরিচালিত হত।

এ সব স্তরের মধ্যে উপরের পদগুলোতে যে সব পদ অন্তর্ভুক্ত ছিল তার মধ্যে 'মুজতাহিদ'-এর যোগ্যতার কথাও ছিল, যার অর্থ হচ্ছে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি যে আইনের স্বাধীনভাবে ব্যাখ্যা করার যোগ্যতার অধিকারী। এ পরিভাষাটি ক্লাসিক্যাল সুন্নী আইনি চিন্তাধারায় পরিচিত ছিল। সেখানে এ পরিভাষাটি আলেম হিসেবে সর্বোচ্চ স্তরের যোগ্যতার অধিকারী বোঝাতেও ব্যবহৃত হতো। মাওয়ারদীর আদর্শিক খলীফা এ ধরনের যোগ্যতার অধিকারী বলে ধারণা করা হয়। যদিও কোন সুন্নী শাসক কখনো এরূপ মুজতাহিদের কাজ অর্থাৎ ইজতিহাদ করেছেন কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। তবে বহু শতাব্দীর পথ পরিক্রমায় সুন্নী আইনি চিন্তাধারার যে ঐতিহ্য গড়ে ওঠেছে তাতে কোন আলেম এরূপ যোগ্যতার অধিকারী- এ কথাটি কারো জোর দিয়ে বলা ক্রমশ দুর্লভ বিষয়ে পরিণত হয়ে ওঠেছে। পরিভাষাটি হয়ে উঠে এক ধরনের ভয় লাগানো যোগ্যতার মত, যেহেতু আলেমসমাজ জোর দিয়ে বলেছেন যে, তারা এ ব্যাপারে তাদের পূর্বসূরীদের শিক্ষার প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু করছেন না। বাস্তবিকপক্ষে সুন্নীদের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনভাবে ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা বা ক্ষমতার দাবিটি এতটাই অস্বাভাবিক এবং কঠিন হয়ে যায় যে, কখনো এমনও বলা হয়েছে যে, স্বাধীনভাবে ব্যাখ্যা তথা ইজতিহাদ করার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এ ধরনের চিন্তাধারা সঠিক কি-না ১৯৮০ এর দশকে সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলার পূর্ব পর্যন্ত ইসলামী আইনের পশ্চিমা শিক্ষার্থীরা এ ধরনের মন্তব্যকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করেছে।[৩০]

---

২৯. সাফাভী নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিভিন্ন বড় বড় শিক্ষা কেন্দ্রের ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব বিষয়ে কেডি উল্লেখ করেছেন। সাফাভীদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকার কারণে এগুলো উনবিংশ শতাব্দীর কেন্দ্রীভূত সরকার ব্যবস্থার রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল, নিকি কেডি, "The Ulama's Power in Modern Iran", পৃ. ২২৬

৩০. ওয়েল বি হালাক (Wael B. Hallaq), "Was the Gate of Ijtihad Closed?", *International Journal of Middle East Studies*, ভলিয়ুম-১৬, সংখ্যা- ১ (মার্চ ১৯৮৪) : পৃ. ৩-৪১

www.pathagar.com

শিয়া আলেমদের মাঝে স্বাধীন ব্যাখ্যা থেকে এ ধরনের পিছিয়ে আসার ঘটনা ঘটেনি। উল্টো স্রষ্টার ইচ্ছার ব্যাখ্যা সম্পর্কে শিয়া আলেমরা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারার ক্ষমতা ও যোগ্যতার ব্যাপারে ক্রমশ আরো আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। অন্য কথায়, তারা শরীয়ার বিভিন্ন বিষয়ে তাদের ব্যাখ্যা দেয়ার যোগ্যতার ব্যাপারে আরো আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। এই আত্মবিশ্বাস কেবল আইনি উপাদান ও উপকরণই নয়, বরং বৃহত্তর দার্শনিক উপাদানের উপরও ভিত্তি করেই তৈরি হয়। মধ্যযুগের ইসলামী দর্শনশাস্ত্রের ঐতিহ্য, যা প্লেটো, এরিস্টট্‌ল্ এবং অন্যান্য অধিকাংশ গ্রীক দার্শনিকের দর্শন বিষয়ক রচনাসমগ্রের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, সুন্নী বুদ্ধিবৃত্তিক জগত থেকে হারিয়ে যাওয়ার বহু পরেও ইরানি শিয়া আলেমদের মাঝে তা টিকে ছিল। সর্বদা একান্তভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক একটি এলিট শ্রেণীকে সংরক্ষণ করার দার্শনিক ঐতিহ্য ইরানের কোম নগরীতে এখনও রয়েছে। এখানে মৌলভীরা শরীয়া পাঠ্যক্রমসহ মধ্যযুগ থেকে সমসাময়িক কালের দর্শন অধ্যয়ন করে থাকেন।

আলেম শ্রেণীর জনসাধারণকে দিক-নির্দেশনা দেয়ার ক্ষমতার ব্যাপারে উপরের এ সব বিষয়ে (Texts) শিক্ষিত ইসলামী পণ্ডিত তথা মৌলভীদের আত্মবিশ্বাস রয়েছে। আর সাধারণ মানুষের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে এলিট শ্রেণীর, যাদের কথা একটু আগে বলা হল, যে কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে সে ব্যাপারে জোর দেয়ার জন্য এ সব বিষয়বস্তু পাঠ করা যেতে পারে। রাজনৈতিক বিষয়ে একজন শিয়া আলেমের ফতওয়া কেবল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে কোন যুক্তির ভিত্তিতে জারি হতেও পারে; সুন্নী আলেমগণ যেভাবে সাধারণত সমচরিত্রের অন্য একটি পরিস্থিতির সাথে আইনগত দিক থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়টির তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করে (অর্থাৎ কিয়াসের মাধ্যমে) ফতওয়া জারি করেন, সেটা সেখানে নাও থাকতে পারে। অর্থাৎ এ ধরনের কোন কিয়াস বা যুক্তির বিন্যাস ছাড়াই একজন শিয়া আলেম রাজনৈতিক বিষয়ে ফতওয়া দিতে পারেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ২০০৩ সনে ইরাকে সে দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী শিয়া ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি আস-সিসতানি এ দাবি করে ফতওয়া জারি করেন যে, ইরাকের রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীন জনসংখ্যাতাত্ত্বিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচিত একটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা সে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণীত হতে হবে। ফতওয়াটি ছিল এক পৃষ্ঠার চেয়েও ক্ষুদ্র। এতে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক তত্ত্বের অন্তর্নিহিত যুক্তি ছাড়া কোন কর্তৃপক্ষীয় উৎসের কোন রেফারেন্স ছিল না।[৩১]

---

৩১. দেখুন, ফেল্ডম্যান, *What We Owe Iraq*, পৃ. ৪০, ১৪০, সংখ্যা : ৩২

www.pathagar.com

এই প্রেক্ষাপট থেকে আমরা ইরানে ১৯০৫-১৯১১ সনের শাসনতান্ত্রিক বিপ্লবে সে দেশের শিয়া আলেমদের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারি।[৩২] এ সমস্ত ঘটনার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি ছিল ইরানি সম্রাটের ক্ষমতার অবনয়ন। বস্তুত উনবিংশ শতাব্দীর 'গ্রেট গেমে'র সময় রাশিয়া এবং ব্রিটেন ইরানের সম্রাটের ক্ষমতা ছাঁটাই করে ফেলে। তবে এ সময় বহু মুসলিম দেশ ঔপনিবেশিক শাসনের কবলে পরলেও ইরান এ ধরনের অপমানজনক পরিণতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। তবে তত দিনে সে দেশের পুরনো শাসকবর্গের শাসন দুর্বল হয়ে পতনের পর্যায়ে চলে আসে। খ্রিস্টিয় ১৯০৫ সন নাগাদ ইরান মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়। ফলে পশ্চিমা দেশগুলো থেকে ইরানকে ঋণ নিতে হয় এবং সে দেশের সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য জরুরি প্রয়োজন মেটানোর কাজে সে অর্থ দ্রুত ব্যয় করে ফেলে।

অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা সব সময় শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের বড় ধরনের একটি উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। ইরানের ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সরকারের ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে আরোপিত করের বোঝায় হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়ে সে দেশের আলেম শ্রেণীর দিকে দৃষ্টি দেয়। পূর্বতন সরকারগুলোর পরিবর্তন ঘটিয়ে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালুর উদ্দেশ্যে আগের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে ব্যবসায়ী সমাজ আলেমদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করে।[৩৩] রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা পেয়ে সে দেশের আলেমসমাজ সে সময় উত্থিত হয় এবং জনগণভিত্তিক আন্দোলনে তাদের সমর্থন প্রদান করে। ঐ আন্দোলনের দাবি ছিল সংস্কারের প্যাকেজ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ইসলামী আইনি আদর্শকে সম্মান দেখাতে হবে। সে সময় আলেমসমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তৎকালীন সংস্কার আন্দোলনের অংশে পরিণত হয়। ঐ সংস্কার আন্দোলন ইরানের জন্য নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করে; সেটা হচ্ছে ইরান একটি লিখিত শাসনতন্ত্র লাভ করে।

---

৩২. এ সম্পর্কে দেখুন, জ্যানেট এ্যফরে (Janet Afary), *The Iranian Constitutional Revolution, 1906-1911,* (নিউইয়র্ক : কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৬)

৩৩. ১৮৯১-৯৩ সনে ইরানের আলেমসমাজ ব্রিটিশ উদ্যোক্তার কাছে সে দেশের তামাক উৎপাদন ও বিক্রি করার একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ দিয়ে শাহের অনুমোদনের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের তামাক বিদ্রোহকে সমর্থন দেয়। আলেমরা ধুমপান নিষিদ্ধ করে দেয় এবং তারা এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে। ফলে শাহ পিছিয়ে আসতে বাধ্য হন এবং একচেটিয়ার সুযোগ বাতিল করেন। বুলিয়েট, *The Case,* পৃ. ৭২

www.pathagar.com

স্বভাবতই লিখিত শাসনতান্ত্রিকতার ভাবধারাটি ছিল আলেমদের প্রেক্ষাপট থেকে কৌশলী। সমসাময়িক যুগের সুন্নী আলেমদের থেকে তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে ইরানের শিয়া আলেমরা অধিকতর সূক্ষ্ম ও জটিল ছিল। তারা মেনে নেয় যে, লিখিত দলিল থাকার অর্থই হচ্ছে সেটা আইন এবং আইনি প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর তাদের নিজস্ব কর্তৃত্ব খর্ব করতে চেয়েছে। একই সময়ে তারা এটাও বিশ্বাস করেছে যে, লিখিত শাসনতন্ত্র নতুন শাসকদের (যারা ক্ষমতায় আসার জন্য অপেক্ষায় ছিল) ক্ষমতা সীমিত করার ব্যাপারে জনগণকে কিছুটা সুবিধা দিয়েছে। একটি প্রাণবন্ত জ্ঞানগর্ভ বিতর্ক সামনে আসে : লিখিত শাসনতন্ত্র কি শরীয়াকে লঙ্ঘন করবেই? শরয়ী মূলনীতির ভিত্তিতে প্রণীত একটি শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে এ দু'টোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যেত কি? একজন অদৃশ্য ইমামের অনুপস্থিতিতে শরীয়া পুরোপুরি বাস্তবায়ন অসম্ভব- এটিই কি মন্দের ভাল হিসেবে সীমিত ক্ষমতার একটি সরকার ব্যবস্থাকে মেনে নেয়ার কারণ?[৩৪]

দু'টি পর্যায়ে যে শাসনতন্ত্রটির খসড়া করা হয় সেটা এ সব প্রশ্নের একটি উত্তর দিতে সক্ষম হয়।[৩৫] যদিও কিছুটা বেলজিয়ান শাসনতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে এ শাসনতন্ত্রটি প্রণীত হয় এবং এটি শরীয়াকে আইন এবং শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্বের একটি স্বাধীন উৎস হিসেবে গণ্য করে। এতে শাসনতন্ত্রটি ইসলামীকরণ করার কিছু উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল বিধায় শিয়া আলেমরা একে সমর্থন দেয়। ইসলামীকরণের উপাদানগুলো খসড়া প্রণয়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৩৬] এই 'শরীয়া শাসনতন্ত্রে'র একটি ধারা ছিল এর

---

৩৪. মুহাম্মদ হুসায়ন নাইনী'র বিতর্ক এবং অবদান সম্পর্কে জানতে দেখুন হামিদ আলগার, "The Oppositional Role of Ulama in Twentieth Century Iran", কেডি'র *Scholars, Saints and Sufis*, পৃ. ২৩৭-৪০; মাশরুআ শব্দের আগের দিকের উল্লেখ দেখতে দেখুন সাঈদ আরজুমান্দ, *The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran*, (অক্সফোর্ড : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৮), পৃ. ৩৭-৪০

৩৫. খসড়া করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে দেখুন জ্যানেট অ্যাফরি, "Civil Liberties and and the Making of Iran's First Constitution", *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, ভলিয়ুম-২৫, সংখ্যা-২, (২০০৫), পৃ. ৩৪১

৩৬. মৃত্যুপথযাত্রী মুজাফফর আদ-দীন শাহের অধীনে খসড়াকৃত ও গৃহীত ১৯০৬ সনের দলিলটি ছিল মূলত সেক্যুলার ধরনের। তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী মুহাম্মদ আলী শাহ জানুয়ারি ১৯০৭-এ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। রক্ষণশীল আলেম ফজলুল্লাহ নূরীর সহায়তায় তিনি ১৯০৭ সনের সহায়ক (Supplementary) আইনের খসড়া প্রণয়ন এবং গ্রহণ করার কাজে নেতৃত্ব দেন। এই দলিলটি বারো ইমামে বিশ্বাসী শিয়া মতবাদকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং প্রণীত আইন পর্যালোচনা করার জন্য আলেমদের একটি

www.pathagar.com

কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। এ ধারায় দেশের প্রধান আলেমদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করার বিধান ছিল, যে কমিটিকে আইনসভায় অনুমোদিত আইন পর্যালোচনা করা এবং এটি শরীয়ার নির্দেশনা অনুযায়ী হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত করে বলার কর্তৃত্ব দেয়া হয়।[৩৭] এ ধারার কাঠামোটি ইসলামী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি করে দেয়। এ ধারাটি এক শতাব্দী পর আফগান ও ইরাকি শাসনতন্ত্রে গৃহীত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এটি খোমেনীর ইসলামী বিপ্লবী শাসনতন্ত্রের অধীনে অভিভাবক পরিষদ গঠনেও উৎসাহ জুগিয়েছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক ধারার সুনির্দিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক উৎসগুলোর উপর কিছু ঐতিহাসিক কাজ রয়েছে। সম্ভবত এর কারণ হচ্ছে, এ ধারা বা ক্লজের প্রভাব ছিল অপ্রত্যক্ষ এবং দীর্ঘমেয়াদী; তাৎক্ষণিক নয়।[৩৮] এই ধারার কাঠামোটি প্লেটোর রাজনৈতিক তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল হয়ত, যেমনটি এর

পরিষদ গঠন করে। দেখুন এ্যাফরে, "Civil Liberties and the Making of Iran's First Constitution", পৃ. ৩৫০, ৩৫৪

৩৭ ১৯০৭-এর সহায়ক আইনের আর্টিক্যাল ২-এ বলা হয়েছে : "কোনভাবেই পবিত্র জাতীয় উপদেষ্টা সংসদের আইন প্রণয়ন ইসলামের পবিত্র মূলনীতি বা নবী মুহাম্মাদ স.-এর আনীত আইনের সাথে সামঞ্জস্যহীন হতে পারবে না..... এতদ্বারা ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, এ ধরনের আইন যেভাবে প্রস্তাব করা হতে পারে- সেটি ইসলামের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি-না শিক্ষিত ধর্মতত্ত্ববিদ অর্থাৎ আলেমরাই তা নির্ধারণ করবেন এবং সে জন্যই সরকারিভাবে আইন করা হয় যে, অন্যূন পাঁচজন মুজতাহিদ বা নিবেদিতপ্রাণ ধর্মতত্ত্ববিদের দ্বারা সর্বদা একট কমিটি গঠন করতে হবে, যারা এ ক্ষেত্রে সময়ের দাবি বা চাহিদা সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল হবেন। আলেম ও ইসলামের প্রামাণিকগণ (প্রমাণকারী) জাতীয় উপদেষ্টা সংসদের কাছে উপরে উল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারী বিশজন আলেমের নাম পেশ করবে। জাতীয় উপদেষ্টা সংসদের সদস্যগণ সর্বসম্মত সম্মতির মাধ্যমে অথবা ভোটের মাধ্যমে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এদের মধ্য থেকে পাঁচজন বা ততোধিক ব্যক্তির নাম মনোনীত করবে এবং তাদেরকে সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দিবে; যেন তারা সংসদে প্রস্তাবিত সকল বিষয় সতর্কতার সাথে আলোচনা করবে এবং বিবেচনা করবে এবং এ ধরনের যে কোন প্রস্তার, যা ইসলামের পবিত্র আইনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, সম্পূর্ণ অথবা আংশিক প্রত্যাখ্যান এবং বাতিল করবে; যেন এ ধরনের প্রস্তাব আইন হিসেবে স্বীকৃতি না পেতে পারে। এ সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে এই ধর্মীয় মর্যাদাসম্পন্ন কমিটির সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে এবং তার অনুসরণ করতে হবে। (অদৃশ্য ইমামের) আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত এ ধারা অপরিবর্তিত রূপে এভাবেই কার্যকর থাকবে।..."

৩৮. জ্যানেট এ্যাফরে, "Civil Liberties and the Making of Iran's First Constitution", পৃ. ৩৫৪; শুধু লক্ষণীয় ছিল এ ব্যাপারটি যে, বেলজিয়ান কিংবা উসমানীয় বা বুলগেরীয় শাসনতন্ত্রে এ ধরনের সমপর্যায়ের ধারা নেই; যদিও এ শাসনতন্ত্রগুলোই ছিল ইরানের শাসনতন্ত্রটির জন্য মডেল শাসনতন্ত্র।

www.pathagar.com

কুখ্যাত উত্তরসূরী ইরানের অভিভাবক পরিষদের ক্ষেত্রে ঘটেছে, কিংবা এটা ছিল আলেমদের ক্ষমতাকে লিখিতভাবে দাপ্তরিক বা অফিসিয়াল করার জন্য বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ। পশ্চিমা বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার আইডিয়া বা ধারণা দ্বারা এটি প্রভাবিত হয়েছে- এমন সম্ভাবনা নেই; যেহেতু সে সময় অধিকাংশ পশ্চিমা শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ ধরনের কোন উপাদানই ছিল না। এগুলোর মধ্যে বেলজিয়ান মডেলও অন্তর্ভুক্ত, প্রাথমিকভাবে যেটি ইরানের উপরিউক্ত শাসনতন্ত্রটি প্রণয়নের সময় অনুসরণ করা হয়েছিল। বিংশ শতাব্দী শুরুর পর শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ও নিরীক্ষার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিদ্যমান ছিল, যা তখনও বিশ্বব্যাপী শাসনতান্ত্রিক আদর্শের উপর কোন ধরনের প্রভাব ফেলতে শুরু করেনি, (যা যুক্তরাষ্টকে বিশ্বশক্তির পর্যায়ে উপনীত হতে সাহায্য করতে পারে।)[৩৯] এর যথার্থ পূর্বসূত্র যাই হোক না কেন, মনে হয় যে, ইরানের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ব্যবস্থাটি ছিল অভ্যন্তরীণভাবে সৃষ্ট; এটা ছিল সে দেশের লিখিত শাসনতন্ত্রের সাথে সঙ্গতি রেখে আলেমদের নিজেদের জন্য আনুষ্ঠানিক তত্ত্বাবধানমূলক ভূমিকা সৃষ্টির প্রচেষ্টার ফল।

---

৩৯. ইরান উপনিবেশ হয়নি। ঔপনিবেশিক শাসন হলে ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক ধরনের তত্ত্বাবধান তথা খবরদারি করার জ্ঞান সর্বোচ্চ তৃতীয়পক্ষের মাধ্যমে তাদের কাছে আসতে পারে। যদি স্থানীয় আইন ব্রিটিশ আইনের সমতা এবং স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের ভাব-ব্যঞ্জনার বিরোধী হয় তবে স্থানীয় আইনকে যেন অগ্রাহ্য করা যায় তা নিশ্চিত করার জন্য ইরান অপছন্দ প্রকাশক বা নিষেধসূচক ধারাগুলোকে ব্যবহার করেছে। আইন সূত্রবদ্ধ করার সময় সমতা এবং স্বাভাবিক বা সহজাত ন্যায়বিচারকে শরীয়ার পরিবর্তে ব্যবহার করার হয়তো প্রয়োজন হয়েছিল। শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারীরা ব্রিটিশদের স্থানীয় আইনকে সম্মান দেখানো অথবা তাকে প্রত্যাখ্যান করার যে রীতি বা চর্চাসমূহ তাকে তাদের তুলনা করার উৎসগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেনি। দ্রষ্টব্য এ্যাফরে, "Civil Liberties and the Making of Iran's First Constitution", পৃ. ৩৪৯, সংখ্যা : ৩৯; তবে ব্রিটিশ রাজের অধীন বসবাসকারী আলেমদের সংস্পর্শে আসার সুযোগটি এ ধরনের প্রভাবাধীন হওয়ার অন্যতম কারণ হওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। পাকিস্তানের ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্রে, তখন থেকে নিয়ে পরবর্তী সংস্করণসমূহে, অপছন্দ প্রকাশক বা শরীয়া বিরুদ্ধ বিষয়ের বিরুদ্ধে ধারা সংযোজনে নিঃসন্দেহে ১৯০৭ সনের ইরানের শাসনতন্ত্রের প্রভাব ছিল। বস্তুত খসড়া কমিটি শুরুতে কোন প্রস্তাবিত আইন কুরআন বা সুন্নাহ বিরোধী কি-না তা যাচাই করে নির্ধারণ করার জন্য পাঁচ আলেম বিশিষ্ট একটি বোর্ড গঠনের সুপারিশ করেছিল। দ্রষ্টব্য কেনেডি, "Repugnancy of Islam", পৃ. ৭৭০; অবশ্য অপছন্দ বা নিষেধসূচক ধারার যে ভাষা তার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ আইনি প্রভাব কতটুকু তা নিশ্চিত নয়। দেখুন, আহমাদ, "Activism of the Ulama in Pakistan", পৃ. ২৬৫-৬৬

www.pathagar.com

ইসলামী বিপ্লবের দৃষ্টি দিয়ে পেছনে দেখলে- যেদিকে আমরা অচিরেই দৃষ্টি দেব- ইসলামী বিচার বিভাগীয় ক্লজ বা ধারা আলেমসমাজকে আইনি-শাসনতান্ত্রিক পদসোপানের সর্বোচ্চ চূড়ায় স্থাপন করার একটি অপরিপক্ক এবং অসম্পূর্ণ পদক্ষেপ বলে দেখা যেতে পারে। তথাপি বুদ্ধিবৃত্তিক নয়, রাজনৈতিক পরিভাষায় বললে বলতে হয়, ইরানি শাসনতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল ব্যর্থ। বিগত কাইজার রাজবংশের বিভিন্ন শাসক এ শাসনতন্ত্রকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত বাতিল অথবা উপেক্ষা করতে চেয়েছে। খ্রিস্টিয় ১৯২৫ সন নাগাদ ক্ষমতা পাহলবী রাজবংশের হাতে চলে যায়, যারা ১৯৭৯ সনে শেষ শাহ (রেজা শাহ পাহলবী) ইরান থেকে পালিয়ে যাওয়া পর্যন্ত দেশ শাসন করেছে। বস্তুত উপরিউক্ত শাসনতন্ত্রটি কখনোই আন্তরিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়নি এবং এ শাসনতন্ত্রের আওতায় ইসলামী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা কমিটি বা আদালত কখনো অর্থপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করেনি।

আলেমদের দ্বারা শাসন

ইরানে ১৯০৫-১৯১১ সনের শাসনতান্ত্রিক বিপ্লবে শিয়া আলেমদের ভূমিকা, বিশেষত শাসনতান্ত্রিক খসড়ায় ইসলামী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ধারাটি সংযোজনে তাদের সাফল্য দেখে বোঝা যায়, এ সব শিয়া আলেম তাদের সমসাময়িক সুন্নী আলেমদের চেয়ে বেশি সূক্ষ্ম ও জটিল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। বর্তমান ইরানের শাসকবর্গের মাঝে তাদের প্রাধান্যের কারণে যে কেউ এ কথা ভাবতে পারে যে, আলেমরা সে দেশে শতাব্দীকালব্যাপী দেশীয় রাজনৈতিক জীবনে তাদের কেন্দ্রীয় ভূমিকা ধরে রেখেছেন। তবে এ কথা সমভাবে সত্য নয়। যদিও এ কথা বলা ভাল যে, একটি শ্রেণী হিসেবে সুন্নী আলেমদের যতটুকু অবনতি হয় শিয়া আলেমদের কখনো ততখানি অবনতি হয়নি।[৪০] তথাপি এ কথা সত্য যে, ১৯২৫ সনে শুরু হওয়া পাহলবী শাসনাধীনে সে দেশের শিয়া আলেমদের ক্ষমতা বহুলাংশে কমে যায়।

এর কারণ হচ্ছে, তুরস্কে কামাল পাশা যে চরম পর্যায়ের সেক্যুলার ব্যবস্থা চালু করেন পাহলবী শাসকরা ইরানকে প্রায় সে চূড়ান্ত পর্যায়ের সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তুরস্কের মতই ইরানে মহিলাদের মাথার

---

৪০. দেখুন, কেডি, "The Ulama's Power in Modern Iran", পৃ. ২১১ ("মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের আলেমদের তুলনায় আধুনিক ইরানী আলেমসমাজ অনেক বেশি রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চা করেছে- এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করে.."। কেডি ১৯৭৯ সনের বিপ্লবেরও আগে এ কথাগুলো লিখেছিলেন।

www.pathagar.com

স্কার্ফ, ওড়না এবং পুরুষের পাগড়িসহ ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পোষাক নিষিদ্ধ করা হয়। তুরস্কের মতই ইরানের সরকার ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তবে তুরস্কে আতাতুর্কের এ ক্ষেত্রে সাফল্যের চেয়ে ইরানে পাহলবীরা কম সাফল্য পেয়েছে। ইরানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেক্যুলার নীতির বিরোধিতাকারীদের কণ্ঠ ধ্বনিত হতে থাকে। তথাপি বহু বছরের অভিজ্ঞতায় পাহলবী শাসনের যারা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সমালোচক তারা নির্বাসনে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন। তৎকালীন শাসককে উৎখাত করার আহ্বান জানানোর পর আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী নিজে ১৯৬৩ সনে নির্বাসিত হন।[৪১] তিনি ইরাকের ধর্মীয় শিক্ষাশ্রমে বহু বছর অতিবাহিত করেন এবং সেখান থেকে প্যারিসে তাঁকে জোরপূর্বক নির্বাসনে পাঠানোর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইরাকেই ছিলেন। অতপর প্যারিস থেকে তিনি ১৯৭৯ সনে ইরানে প্রত্যাবর্তন করে রেজা শাহ পাহলবীকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

ইরানি সমাজকে সেক্যুলার বানানোর প্রক্রিয়া কেবল শিক্ষিত শ্রেণীর ক্ষেত্রে সফল হয় সম্ভবত এ কারণে যে, তুরস্কে আলেমদের পতনের তুলনায় ইরানে সে দেশের আলেমদের শক্তি অটুট ছিল। যখন রেজা শাহের শক্তির দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন কমিউনিস্টসহ সেক্যুলার বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ১৯৭৯ সনের বিপ্লব সংঘটিত করতে সে দেশের আলেমদের সাথে এসে যোগ দেয়। তাদের যুক্তি ছিল, দরিদ্র ও অধিকারহারা জনগোষ্ঠির কাছে শহুরে শিক্ষিত এলিট শ্রেণীর চেয়ে আলেম শ্রেণীর অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা ছিল। খোমেনী প্রকৃত অর্থেই দেশের নিপীড়িত ও পদদলিত মানুষগুলোর প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন।[৪২]

বিপ্লবের সময় সেক্যুলারপন্থীরা দৃশ্যত আশা করে যে, বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যাবার পর তারা মৌলভীদেরকে পরিহার করতে সক্ষম হবে। তারা খুব একটা ভুল করেনি। কিন্তু কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য সেক্যুলার গোষ্ঠীকে খোমেনী কার্যকরভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার মাধ্যমে এ পূর্বাভাষ পাওয়া যায় যে, এভাবে ইসলামিজম সে দেশে টিকে যাবে এবং বাস্তবেও ইসলামিজম বিংশ শতাব্দীর

---

৪১. আলগার, "The Role of the Ulama", পৃ. ২৪৬-৪৭; যেহেতু আলগার ১৯৭৯ সনের ইসলামী বিপ্লবের আগে লিখেছিলেন, তাঁর বর্ণনা কাল বা সময়ের প্রমাদ থেকে মুক্ত।

৪২. খোমেনী সর্বদা 'মুসতাদ'আফীন' শব্দটি ব্যবহার করতেন। এটি অবহেলিত ও পদদলিত মানুষকে বোঝাতে ব্যবহৃত একটি কুরআনী শব্দ, আলী শরিয়তীর মধ্যস্থতায় ফ্রানজ ফ্যাননের *damnes de la terre* –তে যা প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

www.pathagar.com

শেষের দিকে সেখানে বিকশিত হয় অথচ কম্যুনিজম মৃত্যুবরণ করে।[৪৩] মূলত এটা প্রথম বিপ্লবীদের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক মিশ্রণ নয় বরং এটা ছিল বিপ্লব-উত্তর শুদ্ধি অভিযান, যা ১৯৭৯ সনের বিপ্লবকে 'ইসলামী' রূপদান করে। একই সময়ে প্রেসিডেন্ট আবুল হাসান বনি সদরের মত মধ্যপন্থী বা মডারেট অ-আলেম ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধেও খোমেনী ও তাঁর অনুসারীদের অনুকূলে সমান্তরালে শুদ্ধি অভিযান চালানো হয় যেন বিপ্লব বিশেষভাবে ধর্মীয় নেতাকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে।[৪৪] এভাবে অ-আলেমদেরকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর নিজস্ব শিয়া রাজনৈতিক তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি শাসনতান্ত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খোমেনীর আর কোন বাধা থাকেনি।

খোমেনী প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্র তাঁর অভিনব 'বেলায়াতে ফকীহ' বা আলেম-আইনজ্ঞদের কর্তৃত্বকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ বিষয়ে যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাতে এ ভাবধারার নির্যাসটুকু ছিল, অর্থাৎ ইমামের অনুপস্থিতিতে আলেমদের উপর সরকারের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করার কর্তৃত্ব অর্পিত ছিল। খোমেনী এ ধারণাটি গ্রহণ করেন এবং একই সময়ে তিনি একে প্রকৃতই রেডিক্যাল ধারণায় পরিবর্তিত করেন। তাঁর বর্ণনায়, আলেমরা শাসন ক্ষমতার সরাসরি চর্চা করবে। যখন রেজা শাহ ইরান ছেড়ে পালিয়ে গেলেন খোমেনী নিজেকে একজন আলেম হিসেবে শাহের স্থানে দেশ শাসন করার সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেন। বিপ্লবের সময় একটি জনপ্রিয় শ্লোগান ছিল, 'শাহ বিদায় নিয়েছেন, ইমাম এসেছেন।'[৪৫]

আলেমরা একটি শ্রেণী হিসেবে সরাসরি শাসন করবে- এই ধারণাটি ইসলামের ইতিহাসে নজীরবিহীন। একজন বিশেষ আলেম তাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে- এ ব্যাপারটি কোন না কোনভাবে আরো বেশি লক্ষণীয় একটি বিষয়। একজন সর্বোচ্চ নেতা, যিনি অবশ্যই একজন আলেম, তিনি শাসন করবেন- এ ব্যাপারটি শিয়া প্রেক্ষাপটে কল্পনা করা সম্ভবত তুলনামূলক সহজ ছিল; কেননা এ নেতা ছিলেন প্রায় অঘোষিত প্রত্যাবর্তনকৃত ইমামের মত (বাস্তবিকপক্ষে খোমেনীর কিছু কিছু অনুসারী তাঁকে এভাবেই সম্বোধন করত) যার মধ্যে যুগপৎ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সন্নিবেশ ঘটেছে। প্লেটোর ভাষায় তিনি ছিলেন একজন

---

৪৩. আরজুমান্দ, *The Turban for the Crown*, পৃ. ১৫৪

৪৪. মুজাহিদীনে খালক, ইসলামিজম এবং রেডিক্যাল বাম ভাবাদর্শের সমন্বয়ে গঠিত ছিল; ১৯৮২ সন নাগাদ ধ্বংস হয়ে যায়, প্রাগুক্ত

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. vi

www.pathagar.com

'দার্শনিক রাজা'র মত, যার ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে প্রদত্ত বিচারিক রায় একগুচ্ছ লিখিত আইনের অধীনে প্রদত্ত রায়ের চেয়ে ভাল হবে।[৪৬]

ইরানে প্লেটো বর্ণিত সর্বোচ্চ নেতার কাঠামো পূর্ণতা লাভ করে অভিভাবক পরিষদ গঠনের মাধ্যমে। এটি আলেমদের দ্বারা গঠিত এমন একটি প্রতিষ্ঠান ছিল যারা এর মাধ্যমে সকল আইনে ইসলামী বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে। পরিণতিতে অভিভাবক পরিষদ বিভিন্ন পদের জন্য সম্ভাব্য প্রার্থীদের যোগ্যতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এমন কি খোমেনীর মৃত্যুর পর নতুন সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচনে মূল ভূমিকা পালন করে। সর্বোচ্চ নেতা এবং অভিভাবক পরিষদের উপর ন্যস্ত ব্যাপক ক্ষমতার কারণে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত হয়ে পড়ে। প্রেসিডেন্ট কেবল তাই করতে পারবেন যা সর্বোচ্চ নেতা এবং পরিষদ অনুমোদন করে, তার বেশি নয়- যেমনটি সংস্কারবাদী প্রেসিডেন্ট খাতামী ব্যর্থতার কারণে তাঁর হতাশার মধ্য দিয়ে বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। আলেমদের প্রতি এবং আলেমরা যে ধরনের শাসনব্যবস্থা পছন্দ করে সে ধরনের শাসনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাবের অধিকারী বলে পূর্বেই ঘোষিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে একটি নির্বাচিত আইনসভা গঠিত হয়।

এই পুরো ব্যবস্থার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এটি আলেমদের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে পরিষ্কারভাবে নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছে। পূর্বে যেখানে আলেমসমাজ ঐতিহ্যগতভাবে শাসকের নির্বাহী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষমতার ভারসাম্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এখন তারা নিজেরাই প্রথমবারের মত শাসক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছেন। আইনসভার গঠন-প্রক্রিয়ায় আলেমদের কঠোর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকার কারণে আলেমদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে ভারসাম্য সৃষ্টির মত আর কোন ক্ষমতার ভিত্তি অবশিষ্ট থাকেনি। ফলে দেশে আলেমদের অনিয়ন্ত্রিত সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্তৃত্বের উদ্ভব হয়।

শাসনতান্ত্রিক রূপরেখার প্রেক্ষাপট থেকে এ ধরনের শাসন-ব্যবস্থার মডেলের যে পরিণতি দেখা দেয় তা কোন আশ্চর্য কিছু নয়। ক্ষমতার ভারসাম্যবিহীন নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী স্বভাবতই ক্ষমতার অপব্যবহার এবং চরম ক্ষমতার অধিকারী হবার পথে অগ্রসর হবে। অন্যান্য মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে যেমন ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে আলেমদের অনুপস্থিতি

---

৪৬. প্লেটো, *Statesman*, et seq.

www.pathagar.com

অনিয়ন্ত্রিত নির্বাহী ক্ষমতাধিকারীর উদ্ভব ঘটিয়েছে, তেমনি ইরানেও নির্বাহীর আসনে আলেমদের আরোহন সে দেশে শাসনতান্ত্রিকভাবে নির্বাহীর ক্ষমতাকে বিকৃত করেছে। অধিকাংশ মুসলিম দেশের সরকারের- যেগুলো আলেম দ্বারা শাসিত নয় (যেমন মৌলিক স্বাধীনতা নেই, স্বচ্ছতা নেই, আইনের সঠিক প্রক্রিয়ার অনুসরণ নেই) তেমনি ইরানে আলেমদের অধীনে সরকারের মৌলিক স্বাধীনতা নেই, স্বচ্ছতা নেই, আইনের সঠিক প্রক্রিয়ার অনুসরণ নেই; এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ইরানে এগুলো আরো বেশি মাত্রায় দেখা যায়।

ইরানি দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায়, যদি সুন্নী বিশ্বে আলেম শ্রেণীর পুনরুত্থান সম্ভব হতো, তবে সেটাই এককভাবে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন দূর করতে পারত না। আইনের শাসনের অধীন ন্যায়বিচার ভিত্তিক যথার্থ এবং কার্যকর (Functional) শাসনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে আলেমদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি মূল ইস্যু নয় বরং এখানে মূল বিষয় হচ্ছে ক্ষমতার ভারসাম্য; অর্থাৎ ক্ষমতার ভারসাম্যই হচ্ছে এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটাই ঐতিহ্যগতভাবে আলেমরা রক্ষা করেছিল। ইরানের দৃষ্টান্ত থেকে আরো দেখা যায় যে, আইন সম্পর্কে আলেমদের শিক্ষা থাকলেও তাতে এমন কোন অন্তর্নিহিত কিছু নেই, যার ফলে অন্য কোন বিকল্প শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা ছাড়াই তারা একক ও ন্যায়সঙ্গতভাবে এবং ইনসাফের সাথে শাসন করতে সক্ষম হবে। ন্যায়বিচারপূর্ণ নিরপেক্ষ প্রশাসনের মাধ্যম হিসেবে শরীয়ার কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে। তবে অন্যান্য আইনি ব্যবস্থার মতই শরীয়াও এভাবে কাজ করতে পারে না যদি তাকে একটি শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে গ্রথীত না করা হয়; যে ব্যবস্থায় আইনের নির্দেশনাগুলো বিচার বিভাগ ও প্রশাসন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দ্বারা বলবৎ হবে। আর এ সব প্রতিষ্ঠান ন্যায়পরায়ণতার সাথে কাজ করার জন্য এবং পাশাপাশি বিশ্বের বাস্তব পরাশক্তিগুলোর সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তব অনুশীলন দ্বারা তাদের আশ্বস্ত করার মত উপাদান দ্বারা উজ্জীবিত থাকবে। অতএব, এ বাস্তবতার নিরিখে বলা যায় যে, শরীয়া আইনের শাসন সংক্রান্ত সমস্যার কোন যাদুকরী সমাধান নেই।

আফগানিস্তানে তালিবানের নাতিদীর্ঘ শাসনকাল এ ব্যাপারটি স্পষ্ট করে তুলে যে, এদের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতির কারণ ইরানি শাসনের শিয়া চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়; অন্য কিছু। তালিবানরা পরোক্ষভাবে ইরানি মডেলের অনুরকরণ করে এর সমকক্ষ হতে বা একে ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে (যদিও ইরানি শাসকবর্গ তাদেরকে সমর্থন দেয়নি) এবং এভাবে তারা আলেমদের দ্বারা

www.pathagar.com

শাসিত বিশ্বের প্রথম সুন্নী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। তালিবান নেতা মোল্লা উমরের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, শেষ পর্যন্ত তাঁর শাসনও পর্যাপ্ত ভারসাম্য ব্যবস্থা ছাড়াই চলছিল, যা অন্যদের শাসনের চেয়ে ভাল কিছু ছিল না। যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তালিবানরা যথেষ্ট যোগ্য আলেম ছিল না, তাদের নাম দ্বারা যেমনটি বোঝা যায়, তারা ছিল মূলত মাদরাসার ছাত্র, যাদের অপর্যাপ্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ তাদের যোগ্য আলেম শ্রেণীর পর্যায়ে উন্নীত হতে তাদেরকে পিছিয়ে দেয়। তাদের বিচারিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত-যেমন, সন্দেহভাজন সমকামীকে সামাজিকভাবে একঘরে করা- অনেক ক্ষেত্রেই শরীয়ার কোন বিধানের চেয়ে বরং পশতুন সামাজিক রীতির খুব কাছাকাছি হতো। তবে তালিবানরা যদি পুরোপুরি আলেম হিসেবে প্রশিক্ষিত হতো, তবুও তা তাদের শাসনের যে সার্বিক মান ছিল তাতে কোন লক্ষণীয় পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারত না; বরং একই রকম থাকত।

সর্বশেষ আশ্রয় হিসেবে শরীয়া

যদিও ইরান ও আফগানিস্তানের দৃষ্টান্ত থেকে ইসলামী পণ্ডিত বা আলেমদের দ্বারা শাসনের সীমাবদ্ধতা জানা যাচ্ছে, এখানে অন্য একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে যেটা এখানে বিবেচনা করা যায়। সেটা হচ্ছে, এ দুটি দেশে শরীয়া আদালতের দায়িত্বপ্রাপ্ত আলেমদের দ্বারা পরিচালিত স্থানীয় পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় প্রশাসন কিছুটা হলেও সম্ভাবনাময় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এ দুই ব্যর্থ রাষ্ট্রে, যেখানে অনেকটাই থমাস হব্‌সের পরিবেশ বিদ্যমান, (যে পরিবেশে কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান আইনত বৈধ শক্তির ব্যবহারে একচেটিয়া ক্ষমতা চর্চার দাবি করতে পারে না), সেখানে স্থানীয় জনগণ মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তি বা দ্বন্দ্ব নিরসনের সবচেয়ে মৌলিক কাজে স্ব-প্রতিষ্ঠিত শরীয়া আদালতকে কাজে লাগানোর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে এ ধরনের আদালত এরূপ দাবি করে না এবং এগুলোর এমন ক্ষমতাও নেই যে, এগুলো ব্যক্তিগত বিষয়ে (অর্থাৎ প্রাইভেট ম্যাটার নিয়ে) মৌলিক আইনি সিদ্ধান্ত প্রদান এবং স্থানীয় ক্ষমতাবান ব্যক্তিদেরকে আদালতের বিচারিক সিদ্ধান্তগুলো বলবৎ করতে উৎসাহিত করার চেয়ে আরো অনেক বেশি কিছু করতে পারবে। এগুলোর নিজের কোন বাধ্য করার মত আনুষ্ঠানিক ক্ষমতাও নেই; এগুলো বরং নিজের আইনগত এখতিয়ারের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে ব্যক্তির সম্মতির উপর নির্ভর করে, যে বা যারা এ ধরনের আদালতের নির্দেশকে অবশ্য পালনীয় বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত রয়েছে। অতএব অন্য প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি দ্বারা ভারসাম্য রক্ষাবিহীন ক্ষমতাবান কর্তৃপক্ষের অবস্থান থেকে এ সব আদালতের অবস্থান বহু দূরে। বরং এভাবে বলা যায়, সামাজিক বিশৃঙ্খলার ডাইনামিক্সগুলো এ ধরনের আদালতের

www.pathagar.com

কর্তৃত্বকে সীমিত করে দেয়- সেই একই ডাইনামিক্স বিচারপ্রার্থীদেরকে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার দিকে ঠেলে দেয়।

বর্তমানে চালু রয়েছে এমন শরীয়া আদালতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হচ্ছে সোমালিয়ার শরীয়া আদালত। এটি প্রকৃতপক্ষে সে দেশে সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের শূন্যতারই নামান্তর। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সে দেশের ব্যর্থ সরকারগুলো সেখানে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যেখানে কোন সংগঠিত কর্তৃপক্ষ গোত্রীয় নেতাদের বিরুদ্ধে দেশের স্বার্বভৌম ক্ষমতাকে প্রয়োগ করতে পারেনি। বরং এ সব গোত্রীয় নেতা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের দৈনন্দিন ও নিয়মিত ভূমিকার শূন্যতা পূরণ করেছে। গোত্রীয় রীতি ও প্রথার মধ্যেই আইনি বিষয়াদি এবং আইনি প্রতিষ্ঠানও থাকতে পারে। গোত্রীয় রীতি ও প্রথা আফ্রিকার কিছু কিছু অঞ্চলে সেই ভূমিকাই পালন করে। তবে দৃশ্যত মনে হয়, সোমালী গোত্রগুলোতে এ ধরনের আইনি ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না; সম্ভবত পুরো সোমালী সমাজের ভাঙ্গনের কারণেই এমনটি হয়েছে। তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠী বা গোত্রীয় লোকজনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও বিরোধ নিষ্পত্তিতে গোত্রীয় বিচার কখনোই খুব বেশি কার্যকর হয় না; যেহেতু গোত্রীয় লোকজন বাস্তব পরিস্থিতির কারণেই সাধারণত প্রতিপক্ষের আদালতে বিরোধ নিয়ে নিরপেক্ষ শুনানি হবে বলে আশা করে না। এর ফলে তারা শুনানি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না, আর এভাবে বিচারের রায়ও খুব ফলদায়ক হয় না। ফলে কার্যত কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অথবা গোত্রীয় কার্যকর বিকল্প- এ দুটোর কোনটিই না থাকায় কিছু কিছু সোমালী তাদের দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ ইসলামী আইনি মূলনীতি অনুসারে নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ সে দেশের আলেমদের দারস্থ হতে প্রস্তুত হয়।

এর ফলে সোমালিয়ায় অনেকগুলো স্থানীয় ইসলামী আদালতের উদ্ভব ঘটে, দৃশ্যত যেগুলোর উত্থান স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে হয়েছিল; কিন্তু পরবর্তীকালে সেগুলোর মধ্যে এক ধরনের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের নিজেদের মধ্যে ধীরে ধীরে শিথিল ধরনের পারস্পরিক একটি সম্পর্ক গড়ে উঠে। এমন এক প্রক্রিয়ায়, যা সরকারি কর্তৃত্বের প্রাকল্পিক (হাইপোথেটিক্যাল) ক্রম-উত্থানের ইঙ্গিত বহন করে- যেমনটি রবার্ট নজিক তাঁর Anarchy, State and Utopia[৪৭] গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন- এ সব পরস্পরযুক্ত আদালত সংযতভাবে

---

৪৭ রবার্ট নজিক (Robert Nozick), *Anarchy, State and Utopia* (নিউইয়র্ক : বেসিক বুকস, ১৯৭৪), পৃ. ১২-২৫

www.pathagar.com

সরকারি পর্যায়ের কিছু কিছু বিষয়ের দাবি উত্থাপন করতে শুরু করে। বিশেষত এগুলো অযৌক্তিক সহিংসতা বন্ধের দাবি জানাতে শুরু করে; এ ধরনের সহিংসতাই সোমালী সামাজিক সম্পর্ককে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলছিল। এ সব আদালত প্রয়োজনীয় আইনের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে যে কোন আধা সরকারের (প্রোটো সরকার) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কাজ অর্থাৎ দেশে এক ধরনের শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থা তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

শরীয়া আদালত আন্দোলন যখন কয়েক মাস হয় আরো বড় ধরনের সরকারি কাজের দাবি করতে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখায়। শরীয়া আদালত আন্দোলনের সন্ত্রাসবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা করার সম্ভাবনা রয়েছে- এরূপ দাবি করে ২০০৭ সনে সোমালিয়ায় অসংগঠিত আধা সরকারকে অর্থাৎ শরীয়া আদালত আন্দোলনকে পরাজিত করার লক্ষ্যে সমন্বিত সামরিক অভিযানে ইথিওপিয়াকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন দেয় এবং তারা শক্তি প্রয়োগ করে অন্য ধরনের একটি সরকারকে নির্বাসন থেকে দেশে এনে ক্ষমতায় বসায়। ইথিওপীয়দের আক্রমণের মুখে শরীয়া আদালত আন্দোলন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে নতুন সরকারও প্রকৃত সরকারি কর্তৃত্বের যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে ব্যর্থতার পরিচয় দেয় ফলে দেশের পরিস্থিতি দ্রুত সেই নৈরাজ্যকর অবস্থার দিকে যেতে থাকে শরীয়া আদালত আন্দোলন শুরু হবার পূর্বে যেমন নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি দেশে বিরাজমান ছিল। এ অবস্থায় শরীয়া আদালত আন্দোলন পুনর্গঠিত হয় এবং সরকারের নাগালের বাইরের (বস্তুত দেশের অধিকাংশ অঞ্চলই ছিল সরকারের নাগালের বাইরে) অঞ্চলগুলোতে তারা আবার কাজ করতে শুরু করে।

তবে বিদেশী হস্তক্ষেপের কারণে শরীয়া আদালত আন্দোলন সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল বলে এর সংক্ষিপ্ত উত্থানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা থেকে আমাদের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করা ঠিক হবে না। ঐ আদালত যে ধরনের আইনি ব্যবস্থাই কার্যকর করার চেষ্টা করে থাকুক না কেন, হয়ত তখন যে কোন স্ব-গঠিত আদালত সাধারণ সোমালীদের জন্য কোন কিছু না থাকার চেয়ে ভাল ছিল। তথাপি বিশৃঙ্খলা মোকাবেলার জন্য ইসলামী আদালতের কিছু বিশেষ সুবিধা ছিল।

প্রথমত অধিকাংশ সোমালী হচ্ছে মুসলিম। তারা আদালতের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রায় মূলত নিরপেক্ষ ও ন্যায়সঙ্গত হবে বলে হয়ত আশা করে থাকবে।

দ্বিতীয়ত আলেমসমাজ- যদিও তারা হয়ত সংখ্যায় অল্প এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে যথেষ্ট দুর্বল- আইনের ব্যখ্যাকারী হিসেবে তারপরও যথেষ্ট সম্মান ও প্রয়োজনীয় কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। তাদের এরূপ সম্মান লাভ করার কারণ

www.pathagar.com

হচ্ছে তারা সবচেয়ে কঠিন ও সংকটময় পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত বাস্তব ঝুঁকি সত্ত্বেও এ সমস্ত আদালত গঠন করতে পেরেছিলেন। এই কর্তৃত্ব নিশ্চয় তাদেরকে গোত্রীয় নেতাদের (যাদের ক্ষমতা এ সব আদালত দখল করে নিয়েছিল) হুমকি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকবে।

তৃতীয়ত ইসলাম ধর্ম সে দেশে আনুগত্যের এমন একটি মাত্রা উপস্থাপন করার সর্বজনীন ক্ষমতা রাখে যা গোত্র-প্রথার বিশিষ্টতাকে অতিক্রম করে যায়। রাসূল মুহাম্মাদ স. এর একটি একক পতাকাতলে অসম বিভিন্ন গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ করার যে প্রাথমিক উদ্যোগ ছিল তার সাফল্যের জন্য এ ব্যাপারটি জরুরি ছিল। যদিও ইসলাম কখনো গোত্রপ্রথা বা গোত্রীয় পরিচয়কে নিশ্চিহ্ন করেনি অন্তত শহরাঞ্চলে ইসলাম গোত্রীয় দ্বন্দ্ব নিরসনের পূর্বতন প্রচলিত ব্যবস্থাকে ইসলামী আইনি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা দ্বারা পরিবর্তিত করতে খুবই সফলকাম হয়। বাস্তবিক অর্থে এ ধরনের উদ্যোগকে এমন একটি কাজ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, যে কাজের জন্য ইসলামী আইনই হচ্ছে সর্বাধিক উপযুক্ত। এভাবে সোমালিয়া শেষ পর্যন্ত ইসলামী আদালতের জন্য উন্মুক্ত ভবিষ্যতের একটি দৃষ্টান্ত হয়ে যায়।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার ভবিষ্যৎ

আলেমদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শাসিত ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর ব্যর্থতা এবং বিকৃতি সত্ত্বেও তা বহু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে কোন না কোন ধরনের ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ ভোটারদের আগ্রহ নষ্ট করতে পারেনি। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষ অংশে মুসলিম বিশ্বে সবচেয়ে আশ্চর্য ধরনের এবং ব্যাখ্যার অযোগ্য কিন্তু পূর্বাপর সঙ্গতিপূর্ণ নির্বাচনী যে ঘটনাটি দেখা গেছে সেটি হচ্ছে ইসলামী দলগুলোর অব্যাহত জনপ্রিয়তা। খ্রিস্টিয় ১৯৯০ সনে আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে এ প্রবণতার সূচনা হয়েছে এবং এ ধারায় এখনও কোন উল্টো স্রোত দেখা যায়নি।

আরব দেশগুলোতে, যেখানে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান কঠিন, যেখানে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে সেখানেই তারা সফল হয়েছে। ইরাকে শিয়া ইসলামপন্থীরা কেবল অধিকাংশ ভোটে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছিল তাই নয়, সুন্নী এলাকাতেও ইসলামপন্থী দলগুলোই সবচেয়ে ভাল ফলাফল করেছিল। অন্যদিকে আরেকটি আরব রাষ্ট্র লেবানন যেখানে তুলনামূলক অবাধ নির্বাচন হয়ে আসছে, শিয়াপন্থী হিযবুল্লাহ নির্বাচনে যে কারো প্রত্যাশার চেয়েও বরাবর বেশি ভাল করে আসছে। খ্রিস্টিয় ২০০৬ সনে আরো একটি তুলনামূলক অবাধ নির্বাচনের দেশ ফিলিস্তিনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ইসলামপন্থী হামাস নিজস্ব

www.pathagar.com

সরকার গঠনের মত পর্যাপ্ত সংখ্যক আসনে বিজয়ী হয়। তবে তাদের একটি সমস্যা ছিল বা আছে, সেটি হচ্ছে তারা ফাতাহ নেতা প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করতে পারেনি। ইতোমধ্যে যথেষ্ট সতর্কতার সাথে নিয়ন্ত্রিতভাবে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল এ বিষয়টি স্পষ্ট করে যে, মিসর, মরক্কো, জর্ডান, বাহরাইন, কুয়েত এমন কি ক্ষুদ্র পরিসরে সউদী আরবে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো তাদেরকে যে আসনগুলোতে নির্বাচন করার সুযোগ দেয়া হয় তারা সেখানে অধিকাংশ আসনে বিজয়ী হতে পারে। (ইতোমধ্যে মিসর, তিউনিসিয়া, ইরাক, লিবিয়াসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী দলগুলোও নির্বাচনে ভাল ফল করেছে-অনুবাদক)

আলজেরিয়ায় নির্বাচনের প্রায় দু' দশক পর, যে নির্বাচনে জনগণের প্রতি ইসলামপন্থীদের গণতান্ত্রিক একটি আবেদন ছিল, এটি জোর দিয়ে বলা খুবই দুরূহ যে, ঐ ফলাফল ছিল নিছক প্রতিবাদী ভোটের প্রতিফলন; অর্থাৎ তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে নিছক ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্যই জনগণ ইসলামপন্থীদেরকে ভোট দিয়েছিল। সন্দেহ নেই ভোটাররা স্বৈরতান্ত্রিক এবং অকার্যকর শাসন দেখে দেখে অত্যন্ত বিরক্ত। আর এ সব স্বৈরশাসনের মোটামুটি সবই সেক্যুলার। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ফিলিস্তিনে ফাতাহ-এর শোচনীয় খারাপ রেকর্ড নিঃসন্দেহে হামাসের সাফল্যের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। একই সাথে ইসলামপন্থীরা স্পষ্ট শাসন চালানোর মত প্লাটফরমহীন এবং চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মত শক্তি আর নয়। তারা নির্বাচন ও সরকার উভয় ক্ষেত্রে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছে। আর এটি তো বলা বাহুল্য যে, তারা রাজনৈতিক বক্তৃতার নায়ক, যে বক্তৃতা সমগ্র অঞ্চলে স্যাটেলাইট টেলিভিশনের মাধ্যমে দেখা যায়। আরব বিশ্বের ভোটার জনসাধারণ ভাল করেই বোঝে কারা ইসলামপন্থী এবং তাদের রাজনৈতিক প্লাটফরমটি কী।

ইসলামপন্থীদের সাফল্যকে শুধু দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম অথবা তাদের সংগঠনের সামাজিক সেবাদানের প্রয়াস দ্বারা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে। আবার, ইসলামপন্থীরা অনেক সময়ই মানুষের এ ধারণা অর্থাৎ তারা দরিদ্রতম নাগরিকদের প্রতি বিশেষ নজর দেয় এবং তাদের জন্য কিছু করতে তারা প্রস্তুত- এই ধারণা দ্বারা সুবিধা লাভ করে। ফিলিস্তিন, মিসর এবং অন্যত্র ইসলামপন্থীদের সামাজিক উদ্যোগের ফলে তৃণমূল পর্যায়ের লোকেরা সংগঠিত হয়ে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে ইসলামপন্থী রাজনীতিতে হঠাৎ উল্লম্ফণ ঘটায়। তবে ইসলামপন্থী ভোটাররা অধিকতর দরিদ্র শ্রেণী থেকেই সবাই এসেছে তা

www.pathagar.com

নয়; মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেও তারা এসেছে। এখন পর্যন্ত ভোটাররাও বুঝতে পেরেছে যে, ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলের শাসন ছাড়াও তারা অন্তত তাদের সামাজিক সেবার সুবিধাটুকু কুড়াতে পারে।

অতএব, এখন আরব বিশ্বের বাইরের পর্যবেক্ষকদেরও এটি মেনে নেয়ার সময় এসেছে যা আরব বিশ্বের ভেতরের অধিকাংশ পর্যবেক্ষক ইতোমধ্যে মেনে নিয়েছেন, সেটি হচ্ছে, ইসলামপন্থী রাজনীতি ইতোমধ্যে আরব বিশ্বের ভোটারদের কাছে একটি বাস্তবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে কোন সংগঠনের ক্ষমতা লাভের একমাত্র স্বাভাবিক উপায় হচ্ছে নির্বাচন। সামাজিক সেবা এবং তৃণমূল পর্যায়ের সাংগঠনিক তৎপরতার পাশাপাশি এমন সহিংসতাও রয়েছে যা হিযবুল্লাহ বা হামাসের মত সংকর আধা-সামরিক রাজনৈতিক দলগুলো অবলম্বন করে থাকে। ইসলামপন্থীরা এ সব পন্থা অবলম্বন করতে চায়। তবে বাস্তবতা হচ্ছে মূলধারার ইসলামপন্থীরা এমন কি যেখানে অবাধ নির্বাচন বহুদিন ধরেই অনুপস্থিত সেখানেও অহিংস নির্বাচনী পন্থা ব্যবহার করতেও পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে। এখন জর্ডানে মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে সম্পর্কযুক্ত ইসলামিক এ্যকশন ফ্রন্ট[৪৮] নামের রাজনৈতিক দলকে বাদ দিয়ে সে দেশের রাজনীতির কথা কল্পনা করাও অসম্ভব। একইভাবে বর্তমানে দু'টো রাজনৈতিক সংগঠন- সরকার অনুমোদিত ইসলামপন্থী জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি এবং অন্যটি ছায়াচ্ছন্ন ও নিষিদ্ধ ঘোষিত কিন্তু ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা আন্দোলন অর্থাৎ জাস্টিস এন্ড ইমপ্রুভমেন্ট- এ দু'টো দলকে বাদ দিয়ে আমরা মরক্কোর রাজনীতি বুঝতে অক্ষম।

আরব বিশ্বের বাইরে অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগুরু রাষ্ট্রেও ইসলামপন্থী নির্বাচনী রাজনীতি বিকশিত হয়ে ওঠছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হচ্ছে তুরস্ক। তুরস্কে মধ্যপন্থী ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের নেতৃত্বাধীন এ কে পার্টি (যার পূর্ণ নামেও 'জাস্টিস' শব্দটি এসেছে) গত বেশ কয়েক বছর ধরে অর্থনৈতিক উদারিকরণ এবং মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজনগুলো পূরণের সাথে সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নে দেশটির অন্তর্ভুক্তির জাতীয় এজেন্ডা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে সফল হয়েছে। সেক্যুলার সেনাবাহিনী অতি ইসলামীকরণ করাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য সরকারের উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। সে কারণেই

---

৪৮. কুয়েনটিন উইকটরউইকজ (Quentin Wictorowicz), *The Management of Islamic Activitsm : Salafis, the Muslim Brotherhood and State Power in Jordan* (আলবানী : সানি (SUNY) প্রেস, ২০০১)

www.pathagar.com

শরীয়ার সরাসরি বাস্তবায়ন এ কে পার্টির এজেন্ডা নয়। তবে এ কে পার্টির ধর্মীয় বিষয়ে ঝোঁক রয়েছে- এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। পাশাপাশি পার্টিকে ক্ষমতায় আনা এবং শতাব্দীর অন্যতম সফল গণতান্ত্রিক তুর্কি রাজনীতিকের অবস্থানে উন্নীত হবার পূর্বে এরদোগানের ইসলাম প্রবণতার কারণে রাজনীতিতে তাঁর নিষিদ্ধ থাকার কথাও ভুললে চলবে না।

তুরস্কের ইতিবাচক কাহিনী পাকিস্তানের ঘটনা দ্বারা হোঁচট খেতে পারে। পাকিস্তানে ইসলামিজমের অধিকতর গণতন্ত্র বিরোধী প্রবণতা রয়েছে, যদিও ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং পরপর প্রতি নির্বাচনী প্রচারাভিযানে এদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবও রয়েছে। তবে তুরস্কের মত পাকিস্তানেও ইসলামিজম নিশ্চিতভাবে একটি স্থায়ী শক্তিতে পরিণত হয়েছে অথবা নিদেনপক্ষে পাকিস্তানী রাজনীতির উত্থান-পতনের ধারায় কোন আন্দোলনকে যতদূর স্থায়ী বলে মনে করা যেতে পারে ততদূর স্থায়ী শক্তির কাছাকাছি শক্তিতে পরিণত হয়েছে। তুরস্কে যেটি নেই পাকিস্তানে তেমন একটি ব্যাপার দেখা যায়, অর্থাৎ পাকিস্তানের সংবিধান সে দেশে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা মেনে নিয়েছে, এমন কি তাকে উৎসাহিত করেছে। যেভাবে পাকিস্তানের সংবিধানকে কার্যকর করা হয় তাতে দেখা যায়, এই সংবিধানে যা কিছু সীমাবদ্ধতাই থাকুক না কেন এতে ইসলামী আইনের ভূমিকাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং পাকিস্তান সরকারিভাবে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র'ও বটে। সে দেশের হাইকোর্ট বহু ব্লাসফেমী কেসের ব্যাপারে রায় বা সিদ্ধান্ত দিয়েছে এবং নানাভাবে ইসলামী আইন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে চলেছে। যদি পরিপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্র এখনও চরম ভাবাপন্ন ইসলামপন্থীদের কল্পনার বিষয় বলে ধরা হয়, তবু এ কথা সত্য যে, পাকিস্তানের সংবিধানের আনুষ্ঠানিক কাঠামো মূলধারার ইসলামপন্থীদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অনেক কিছুই ইতোমধ্যে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই ইসলামিজম কোথায় যাচ্ছে? ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর ক্রমবর্ধমান সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি কোন না কোন পর্যায়ের আরো ইসলামী রাষ্ট্র দেখতে পাব? আরো অনেক রাষ্ট্রব্যবস্থা কি সৃষ্টি হবে, যেগুলো গণতন্ত্রায়িত অথবা শাসনতান্ত্রিকীকরণ করা অথবা উভয় ধরনের শরীয়াভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা চালু করবে? এগুলোর উত্তর কী?

এমন হতে পারে যে, আমরা হয়ত দেখতে পাব, ইসলামের উপর জনগণের বৃহত্তর অংশের গুরুত্বারোপের ফলে এর সাথে স্বৈরাচারী সরকারগুলো কিছুটা সামঞ্জস্য বিধান করে নিবে প্রচলিত ব্যবস্থায় বিশেষ কোন বাস্তব

www.pathagar.com

পরিবর্তন ছাড়াই। স্বৈরশাসকদের সেটি পছন্দও হবে এবং সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রেরও। কেননা যুক্তরাষ্ট্র সত্যি বলতে কি মধ্যমপন্থী ইসলামী রাজনৈতিক দলকেও নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতার সুযোগ দিতে ভয় পায়। ইসলামী প্রতীকী বিষয়গুলোর সতর্ক স্বীকৃতিদানই (যেমন, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণাদান) হচ্ছে মুসলিম বাদশাহ এবং স্বৈরশাসকদের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত সত্য। তবে এভাবে তারা সময়ের পরিক্রমায় টিকে থাকতে পারবে না- এ কথা বলাটা হবে নিশ্চিতভাবে অতি সরল।

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের সরকারগুলো নিজ নিজ দেশের ভেতর জনপ্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর প্রতি সাড়া দেয়ার জন্য অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের- উভয় দিক থেকে ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে রয়েছে। এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এ সব আন্দোলনের বেশির ভাগই প্রধানত ইসলামপন্থী বলেই দেখা যায়। এখন সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা হচ্ছে, ইসলামপন্থীদের গণতন্ত্রায়িত বা শাসনতান্ত্রিকীকরণ করা শরীয়া প্রতিষ্ঠার আহ্বান ক্রমবর্ধমান হারে লক্ষণীয় হয়ে উঠবে। ইসলামপন্থী রাজনৈতিক শক্তিগুলো সরকার গঠনে অংশগ্রহণ করবে এবং কিছু রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার মাঝেই তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির বিভিন্ন দিক অবলম্বন করতে সক্ষম হবে এবং সেগুলো বাস্তবায়িত করারও চেষ্টা করতে পারবে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন ইরাক, আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনে দেখা গেছে, শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের পর সহিংসতা, বিশৃঙ্খলা এবং অকার্যকর সরকার ইত্যাদি দেখা দিবে, যেন ইসলামী চিন্তাধারাগুলো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হওয়ার সুযোগ না পায়। নিঃসন্দেহে অনেক ইসলামপন্থী দলের সহিংস সামরিক শাখা ধরে রাখার আগ্রহ সত্যিকারের ক্রিয়াশীল ইসলামপন্থী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয়। ফলে এ ধরনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং বিকশিত হতে দেয়ার ব্যাপারে ইসলামপন্থী সরকারের ক্ষমতা কতটুকু তা বাস্তবে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়নি। ইরাক এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় টেস্ট কেস হতে পারত; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক দখলে অপর্যাপ্ততার কারণে সে দেশে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তার কারণে দেশটির উদাহরণ দেয়ার মত অবস্থানটি বিনষ্ট হয়ে যায়।

কোন কার্যকর এবং ক্রিয়াশীল দেশে যখন ইসলামপন্থীরা নির্বাচনে জয় লাভ করে, যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য আঞ্চলিক নটরাজরা ইসলামপন্থী সরকার গঠিত হবে এ কথা ভেবে যথেষ্ট বিচলিত হয়ে পড়ে। ফলে যারা এ সব সরকারের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতেও প্রস্তুত তারাসহ এ সব সরকারের প্রতিপক্ষরা ক্ষমতাসীন ইসলামপন্থীদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য বাইরের সমর্থনও লাভ করবে। এর নজীর সর্বপ্রথম আলজেরিয়ায় দেখা গেছে। সে দেশে ফ্রান্স এবং যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯২

www.pathagar.com

সনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে দেয়া এবং ইসলামপন্থী শাসনকে পদদলিত করার ব্যাপারে সামরিক সরকারকে সমর্থন দেয়। আবার আমরা এমন ঘটনা দেখেছি ফিলিস্তিনে যেখানে সরকারে হামাসের ভূমিকাকে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে ফাতাহকে যুক্তরাষ্ট্র উৎসাহিত করে, যাদের তাত্ত্বিকভাবে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসার কথা ছিল এবং শেষ পর্যন্ত গাজার নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করার একটি মোটিভ ছিল। এ ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষকে দু' ভাগে বিভক্ত করে ফেলে। এ লেখা যখন প্রস্তুত হচ্ছে তখনও এমন কোন নজীর নেই যে, ইসলামপন্থীরা কোথাও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতায় এসেছে এবং তাদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে শাসন করার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

বাস্তবতা হচ্ছে, এখন পর্যন্ত আমাদের সামনে কোন ইসলামপন্থী সরকারের শান্তিপূর্ণ অবস্থায় ক্ষমতায় আরোহণ এবং তারপর শাসন করতে ব্যর্থ হওয়ার উদাহরণ নেই। যতদিন পর্যন্ত ইসলামপন্থীদের শাসন করার সুযোগ না হবে এবং সে সুবাদে তাদের সফল কিংবা ব্যর্থ হবার মত ঘটনা না ঘটবে, আশা করা যায় জনগণ তাদেরকে ভোট দিয়েই যাবে। কার্যকর সরকার চালানোর পরীক্ষায় ইসলামপন্থীরা অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে কম সংবেদনশীল তা নয়; বরং ইসলামপন্থীদের প্লাটফরমের প্রতি জনগণের যে আবেদন তা কার্যকর সরকারের ভাবাদর্শের উপর এবং পাশাপাশি ন্যায়সঙ্গত আইনি ব্যবস্থার উপর এত বেশি নির্ভরশীল যে, ইসলামপন্থীরা এই পরীক্ষায় বাস্তবিকই জিততে পারল কি-না তা দেখার সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত জনগণ সন্তুষ্ট হবে না। যদি আরব বা মুসলিম বিশ্বের সমসাময়িক সরকারগুলো কোনভাবে তাদের নিজ নিজ নাগরিকদের রাজনৈতিক সুবিচার নিশ্চিত করতে পারে, তবে নিঃসন্দেহে ইসলামপন্থীদের আবেদন কমে যাবে। তথাপি যতক্ষণ পর্যন্ত এ সব দেশে অনিয়ন্ত্রিত নির্বাহী ক্ষমতাই শাসনতান্ত্রিক প্রভাবশালী ব্যবস্থা হিসেবে বহাল থাকবে ততক্ষণ এ সব দেশে নিকট এবং দৃশ্যমান ভবিষ্যতে এ ধরনের রাজনৈতিক সুবিচারের সম্ভাবনা অল্পই। যতদিন পর্যন্ত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নির্বাহীরা তাদের অন্যায় বা জুলুমের শাসন অব্যাহত রাখবে- অর্থাৎ যতদিন তাদের শাসন অব্যাহত থাকবে ততদিন সেখানে বিকল্প ব্যবস্থার জন্য জনগণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকবেই।[৪৯]

---

[৪৯]. সম্প্রতি মিসরে হুসনি মোবারকের পতনের পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ব্রাদারহুড সমর্থিত প্রার্থী মুহাম্মাদ মুরসী ৫১% ভোট পেয়ে নির্বাচিত হওয়ার এবং সরকার গঠনের এক বছরের মাথায় সামরিক বাহিনী কর্তৃক তাঁকে উৎখাত এবং ব্রাদারহুডকে নৃশংসভাবে দমন লেখকের ধারণাকে সঠিক বলে প্রমাণ করেছে-অনুবাদক।

www.pathagar.com

উপসংহার

ইসলামিজম, প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান এবং আইনের শাসন

এ সব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সামনে এ প্রশ্ন চলে আসে যে, ক্ষমতায় থাকলে ইসলামপন্থীরা সত্যিই কি আইনের শাসন দিতে পারবে? ইরানের উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত ও সংগঠিত সরকারও শাসনতান্ত্রিকভাবে স্বৈরতান্ত্রিক এবং ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে, যেমন সেক্যুলার স্বৈরতান্ত্রিক সরকারও এমন হতে পারে। ফলে সেক্যুলার স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের মতই এরাও জনগণের কাছে অজনপ্রিয় হতে পারে। যদি ইসলামপন্থীরা রাজনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে, তবে তাদের পূর্বসূরীদের মতই তারাও দুর্নামের মুখোমুখি হবে। তবে যদি ইসলামপন্থীরা তাদের সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি মত কাজ করতে পারে, তবে সমগ্র আরব এবং মুসলিম বিশ্বে কোন না কোন প্রকারের শরীয়াভিত্তিক শাসনের প্রত্যাবর্তন খুবই স্বাভাবিক এবং সম্ভব।

তবে এটা ঘটবে কি না তা চূড়ান্ত বিচারে ইসলামপন্থীদের নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও বিকশিত করার ক্ষমতা বা যোগ্যতার উপর নির্ভর করে, যে প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামী আইনের আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে নিজস্ব, মৌলিক এবং বিশেষ উপায় খুঁজে পাবে। এ সব প্রতিষ্ঠান হতে পারে ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত আইনসভা, যা গণতন্ত্রায়িত শরীয়ার চেতনায় সমৃদ্ধ হবে; অথবা হতে পারে এক ধরনের আদালত, যা এর প্রভাবাধীনে অনুমোদিত আইনের রূপরেখা প্রণয়ন এবং তাকে প্রভাবিত করার জন্য ইসলামী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা করবে। তবে এ দুটোর যেটাই হোক না কেন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠান নিজে নিজে যথেষ্ট হবে না। আইন ও বিচার বিভাগের প্রভাবাধীনে অথবা উভয় বিভাগের সমন্বিত প্রভাবে নির্বাহী বিভাগকে আইনি এবং শাসনতান্ত্রিক বিচার বা রায় মেনে নেয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে।

কিন্তু সেটা কিভাবে হবে? কিভাবে উদ্ধত ক্ষমতা চর্চা করতে অভ্যস্ত একজন নির্বাহী আইনের শাসনের অধীন হবে? এ প্রশ্নটি বিশ্বব্যাপী শাসনতান্ত্রিক বিকাশ ও পরিবর্তনের অন্যতম গূঢ় রহস্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ বিপ্লব জরুরি। কেননা নতুন এবং দুর্বল

www.pathagar.com

নির্বাহী যদি নিজের শাসনতান্ত্রিক বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তবে তার আইন মান্য করা ছাড়া হয়ত গত্যন্তর থাকবে না। এটি কল্পনা করতে ভাল লাগে যে, এ ধরনের বিপ্লব হয়ত অতি মাত্রায় ক্ষমতাবান নির্বাহীকে নির্মূল করার জন্য জরুরি, যেমনটি আরব ও মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে রয়েছে। তবে পরিপূর্ণ বিপ্লবের সাম্প্রতিক দশকগুলোতে খুব খারাপ রেকর্ড রয়েছে, অন্তত মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশগুলোতে। শাহকে সরিয়ে দিতে ইরানে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে দেখলে দেখা যায় তা শেষ পর্যন্ত বিরাট ক্ষমতাবান মাথাভারী ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়েছে। একইভাবে ইরাক সম্পর্কে আহমদ সা'লাবী এবং পল উল্ফওয়াইজের বৈপ্লবিক স্বপ্ন এখন পর্যন্ত নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়েছে। কেননা সাদ্দাম হুসেনের বাথপার্টির স্বৈরশাসনের অবসানের পর সে দেশে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যা নতুন কার্যকর প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হবার জন্য প্রয়োজনীয় স্থিতিশীলতা দিতে পারেনি।

কাজেই ধীরগতির শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন আগের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। দৃশ্যত এ ব্যাপারটি ইসলামিজমকে আকর্ষণীয় করেছে। কেননা ইসলামিজম বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ইসলামী মূল্যবোধ এবং ইসলামী আইনের কিঞ্চিত সংযোজনের মাধ্যমে খাপ খাওয়াতে চায়। এটি কল্পনা করাও হয়ত সম্ভব যে, ইসলামপন্থীদের নির্বাচনী সাফল্য শরীয়া প্রতিষ্ঠার আহ্বান সম্বলিত রাজনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের দাবি পূরণের জন্য নির্বাহীর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। ফলে এর জন্য বিচার বিভাগীয় সংস্কৃতিরও রূপান্তরের দরকার হবে, যেমনটি সম্প্রতি পাকিস্তানে হয়েছে, যেখানে বিচারকগণ নিজেদেরকে রাষ্ট্রের সেবক না ভেবে আইনের এজেন্ট হিসেবে ভাবতে শুরু করবে।

আমরা দেখেছি যে, শরীয়া যুগপৎ ঐতিহাসিক বিষয়ের বাস্তব চর্চা এবং সমসাময়িক ভাবাদর্শ হিসেবে বিবেচিত হলে এটি বিচার বিভাগের উপরিউক্ত ধরনের ভূমিকা পুনর্গঠনের জন্য একটি প্রয়োজনীয় উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। শরীয়া এর সারমর্মে সকলের জন্য সমানভাবে, মহান বা সাধারণ মানুষ, বড় বা ছোট, শাসক বা শাসিত যে কারও জন্য আইনে পরিণত হতে চায়। কেউ এই আইনের উর্ধ্বে নয় এবং সকলে সব সময় এর অধীন। যদিও শাসনতান্ত্রিক কাঠামো, যা শরীয়াকে বাস্তবায়িত করার জন্য ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে, বাস্তবসম্মত নবায়ন বা পরিবর্তন এবং কার্যকর সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় নমনীয়তা বা পরিবর্তনশীলতার সুযোগ রেখেছে। শাসনতান্ত্রিক এই

www.pathagar.com

কাঠামোও আইনি বৈধতার আদর্শকে রক্ষা করেছে। যে বিচারকগণ শরীয়ার প্রতি নিবেদিত তারা এ অর্থে আইনের শাসনের প্রতিও নিবেদিত, রাষ্ট্রের শাসনের প্রতি নয়। কোন রাষ্ট্রের বৈধতা, যাতে সরকারের কর্মচারী-কর্মকর্তারা এ বিশ্বাসের কাঠামোকে মেনে চলে, আইন বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করবে।

তবে, যেমনটি আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি, আইনের শাসনের আদর্শকে শূন্যতার মাঝে বাস্তবায়ন করা হয় না এবং তা সম্ভবও নয়। এর জন্য রাষ্ট্রের কার্যকর মানবিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়মিত অনুশীলন এবং এই ব্যবস্থায় ভূমিকা পালনকারীদের ইতিবাচক উপলব্ধির (অর্থাৎ এর নির্দেশনা এড়িয়ে যাওয়া বা অমান্য করার চেয়ে এগুলো মেনে চলাতেই তাদের বেশি সুবিধা হবে) মধ্য দিয়ে দৃঢ়তর করে তোলা হয়। ক্লাসিক্যাল ইসলামী ব্যবস্থায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু যখন এ ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে তখন এ সব প্রতিষ্ঠানও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এখন এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পুনরুত্থান হলেও সেগুলো হুবহু পূর্বেরগুলোর মত হতে পারবে না। যদি সাফল্য পেতে হয় তবে নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের পুরনো ঐতিহ্য ভিত্তিক চর্চাগুলোর বিভিন্ন আঙ্গিক সম্পর্কে শিখতে পারে। তবে সে উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রকে নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করার জটিল ও ধীরগতির কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব পন্থায় কাজ করবে এবং এভাবে এগুলো ক্রমে ক্রমে আইনি বৈধতা লাভ করবে।

যারা মুসলিম সংখ্যাগুরু রাষ্ট্রের বাইরে এবং ভেতরে রয়েছেন, যারা অর্থপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক ও আইনি সংস্কার দেখার আশা করেন, যে সংস্কার নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে সরকারগুলোকে ঠেলে না দিয়েও স্বৈরতান্ত্রিক ধরন থেকে সরকারগুলোকে সরিয়ে আনবে- তাদের জন্য এখানে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আমাদের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম প্রয়াসকে অবশ্যই নিবেদিত করতে হবে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে, যেগুলো নিজেরাও নিজেদের সম্পর্কে ধারণা করবে এবং এ সব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জনগণও ধারণা করবে যে, এগুলো আইনের শাসনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আদালত ও আইনসভার ভূমিকার ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়াকে শর্তযুক্ত করা যেতে পারে এবং আইন ও সরকারের সমন্বিত বিভাগগুলোর সিদ্ধান্ত মেনে চলার জন্য নির্বাহীর উপর চাপ সৃষ্টি করা যেতে পারে। বিশেষত যখন প্রত্যক্ষভাবে বৈদেশিক স্বার্থ বিপদের সম্মুখীন না হয় তখনও এটা করা যেতে পারে। উদাহরণ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান যারা গড়ে তোলে তাদেরকে সতর্ক

www.pathagar.com

প্রশংসাসহ স্বীকৃতি দেয়া যেতে পারে। এ স্বীকৃতি অভ্যন্তরীণ বৈধতার মাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য, বৈধতার অবস্থান থেকে তাদের বিচ্যুত করার জন্য নয়।

এ সব কাজ বা উদ্যোগে সুস্থ্য ও ইতিবাচক সন্দেহবাদিতা (অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বিষয়টির সত্যাসত্য বা ভাল-মন্দ খুঁটিয়ে দেখার মানসিকতা) একটি প্রয়োজনীয় মাধ্যম। যখন স্থানীয় আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থার জন্য বিষয়টি স্পর্শকাতর তখনও বাইরের বিশেষজ্ঞ দ্বারা বিচারক এবং অন্যান্য এলিটের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা আইনগত এবং বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে যখন নির্বাহী বিভাগ এগুলোর বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে তখন এগুলোর জন্য অনেক বেশি এবং স্পষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমর্থনের প্রয়োজন হয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিভিন্ন কনফারেন্স, সম্মেলন এবং ঘোষণার নিজস্ব একটি অবস্থান বা ভূমিকা রয়েছে সত্য[১], তবে বিচারকদের মন-মানসিকতা পরিবর্তনে এগুলোকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এ কাজে লেগে থাকতে হবে। কাজেই এ কথা বলাই বাহুল্য যে, তাদের বাস্তব প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা পরিবর্তন করতে গেলে সেটা হবে আরো অনেক দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার।

যখন ইসলামী কিংবা অ-ইসলামী নতুন আইনি এবং শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো দৃশ্যপটে আবির্ভূত হতে পারে এবং তাদের বৈধতার জন্য নিজেদের ভূমিকা পালন করতে পারে, তাদেরকে সমর্থন দেয়া জরুরি। যদি যুক্তরাষ্ট্র নির্বাহী বিভাগের উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিষ্পেষণের চেষ্টাকে মেনে নেয়, তাহলে তার অর্থ হবে যুক্তরাষ্ট্র আইনের শাসনকে তোয়াক্কা করে না। বিপরীতক্রমে ইসলামপন্থীরা ক্রমাগতভাবে শরীয়ার মাধ্যমে ন্যায়বিচার এবং আইনের শাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে ইসলামপন্থীদেরকে থামিয়ে দেয়াটা আপাত ভাল লাগতে পারে, কিন্তু এই কৌশল চূড়ান্ত বিচারে উল্টো ফল দিতে পারে। কেননা জনগণ দেখবে এ আচরণ কেন, কিসের জন্য হচ্ছে এবং এটা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনঃনিশ্চিত করবে যে, ইসলামপন্থীদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশাকে পশ্চিমা শক্তি এবং স্থানীয় স্বৈরশাসকরা বাধাগ্রস্ত করে।

---

[১] উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, আরব অঞ্চলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিষয়ক কায়রো ঘোষণা, দ্বিতীয় আরব বিচারপতি সম্মেলনে উপস্থাপিত, "Supporting and Promoting the Independence of the Judiciary", ২১-২৪, ফেব্রুয়ারি, ২০০৩

www.pathagar.com

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নতুনভাবে গড়ে তোলা এবং পুরনোগুলোকে নবায়ন করার উচ্চাভিলাষী প্রয়াসের মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামপন্থীদের যে প্রয়াস তার সাফল্যের সম্ভাবনা কখনোই খুব বেশি নয়। আধুনিককালে গণতন্ত্রের পুনঃআবিষ্কার একটি অসম্ভব কিংবা আংশিক সম্পাদিত বিষয় এবং এতে এর চর্চাকারীদের পুরনো ধ্যানধারণাকে নতুন ধরনের চর্চার সাথে মিলিয়ে নেয়ার প্রয়োজন পড়ে সাধারণত দু'য়ের মাঝের পার্থক্যকে স্বীকার না করেই। আজকাল এত বিপুল সংখ্যক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্র থেকে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পুরোটা ধার নিয়ে কাজ চালাতে এত আগ্রহী হবার অন্যতম কারণ হচ্ছে শূন্য বা ভঙ্গুর অবস্থা থেকে একেবারে নতুনভাবে এ ধরনের ব্যবস্থা সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন। সে জন্যই সব ধরনের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নতুন আবিষ্কার বা সৃষ্টির চেয়ে অন্যের কাছ থেকে ধার নেয়া সহজ। তবু সমস্ত ধরনের ঝুঁকি এবং বিপদ সত্ত্বেও সরকারের একটি ধরন (অর্থাৎ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা) পুনঃসৃষ্টির প্রত্যাশা করাকে- যে সরকার নতুনের সংস্পর্শে যখন আসে তখন পুরনো ব্যবস্থার সবচেয়ে ভালটুকু গ্রহণ করে- যতদূর ধারণা করা যায় সবচেয়ে সাহসী এবং মহান একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে বিবেচনা করা যায়।

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ইসলামী বিশ্বে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্পর্কিত প্রায় এক দশকের বাস্তব ও তাত্ত্বিক অবস্থার প্রতিফলন থেকে এই গ্রন্থের উৎপত্তি। যদিও গ্রন্থটিতে আলোচ্য ধারণাগুলো বাগদাদের সাবেক রিপাবলিকান প্রাসাদের আশ্চর্য প্রেক্ষাপটে বাস্তব রূপ পেতে শুরু করেছিল। কার্নেগী কর্পোরেশন, কাউন্সিল অন ফরেইন রিলেশন, নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি স্কুল অব ল' এবং হারভার্ড ল' স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অকুণ্ঠ সমর্থন ছাড়া এগুলো লেখার আকারে প্রকাশ করা হয়ত সম্ভব হতো না। ইয়েলে ল' স্কুলে আমি এ বিষয়ে একটি সেমিনার করেছিলাম; সেখানে এ গ্রন্থে উপস্থাপিত বহু যুক্তি বা আলোচনা আমি পরিমার্জিত ও পরিশীলিত করেছি। আমি ঐ সেমিনারে উপস্থিত ছাত্রদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই। পাশাপাশি আমি ইয়েলে মিড্‌ল্ ইস্ট লিগ্যাল স্টাডিজ সেমিনার এবং হারভার্ড ল' স্কুল ফ্যাকাল্টি ওয়ার্কশপে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদেরকেও ধন্যবাদ দিতে চাই। আমি উক্ত সেমিনার ও ওয়ার্কশপে এ লেখাটির আংশিক খসড়া উপস্থাপন করেছিলাম। আমি বিশেষ করে একজন প্রকৃত ভদ্রলোক পণ্ডিত জনাব আব্দুল আযিয আল-ফাহাদের কাছ থেকে এমন গ্রন্থ-সমালোচনা পেয়েছি যা আমার জন্য সহায়ক হয়েছে। আমি আইসিএম-এর হিদার শ্রুডারের (Heather Schroder) দৃঢ় দিকনির্দেশনা লাভ করেছি। এ ছাড়া প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস-এর ফ্রেড এপেল (Fred Appel) ধৈর্যের সাথে এ কাজে সময় দিয়েছেন। উপরন্তু নাভিদ সাতো (Navid Sato), কালিনা ডেনকোভা (Kalina Denkova), ইয়ান মিচ (Ian Mitch), শ্যালেভ রোইজম্যান (Shalev Roisman), বেন ওয়েন (Ben Owen) প্রমুখের গবেষণা সহায়তা পেয়ে এবং জিল গোল্ডেনজিল (Jill Goldenziel), আনওয়ার ইমন (Anver Emon), ইয়াসির কাজি (Yasir Kazi) এবং এন্ড্রু মার্চের (Andrew March) মন্তব্য পেয়ে আমি প্রভূত উপকৃত হয়েছি। আমার স্ত্রী ও সহকর্মী জেনী সাক (Jeannie Suk) গ্রন্থে উপস্থাপিত প্রতিটি যুক্তি বা আলোচনাকে চ্যালেঞ্জ করে সেগুলোকে শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করেছে। সত্যি বলতে কি আমি এ গ্রন্থে যা কিছু লিখেছি তার প্রতিটি বিষয়কে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার পর থেকে সে এভাবে চ্যালেঞ্জ করে আলোচনা করে সেগুলোকে উন্নত করতে সাহায্য করেছে। সে আমার জন্য সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ; যদিও সে আশীর্বাদের আমি যোগ্য নই।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা

আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ **ইসলামের পারিবারিক আইন** (১ম খণ্ড) -সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুবাদক মণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত	৬০০/-
আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ **ইসলামের পারিবারিক আইন** (২য় খণ্ড) -সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুবাদক মণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত	৬৫০/-
দি ইমারজেন্স অব ইসলাম (বাংলা অনুবাদ) -ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ	৩৫০/-
ইসলামী আইনের উৎস -মুহাম্মদ রুহুল আমিন	৩০০/-
ইসলামী দণ্ডবিধি (১ম খণ্ড) -ড. আবদুল আযীয আমের	৩০০/-
বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস -মোহাম্মদ আলী মনসূর	৩০০/-
ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ও পুনরুত্থান -নোয়াহ্ ফেল্ডম্যান	৩০০/-
মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি -ড. মুহাম্মদ আত-তাহের আর রিযকী	১২০/-
ইসলামী শরীয়ত ও বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য -ড. আলী আত্ তানতাভী ও ড. জামাল উদ্দীন আতিয়া	৫০/-
ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার -মুহাম্মদ শরীফ চৌধুরী	৫০/-
মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর পর্যালোচনা ও সংশোধনী প্রস্তাব -ড. মুহাম্মদ মানজুরে ইলাহী ও অন্যান্য	৪০/-
পঞ্চম সপ্তম ও ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল এবং প্রাসঙ্গিক জটিলতা -মোবায়েদুর রহমান	২৫০/-
ফতোয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজন -সংকলন ও সম্পাদনা : আবদুল মান্নান তালিব	১০০/-

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

প্রকাশিতব্য গ্রন্থ তালিকা

আল-মাওসূআতুল ফিক্‌হিয়্যাহ **ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন**-১ম খণ্ড
-সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুবাদক মণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত

আল-মাওসূআতুল ফিক্‌হিয়্যাহ **ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন**-২য় খণ্ড
-সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুবাদক মণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত

আল-মাওসূআতুল ফিক্‌হিয়্যাহ **ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন**-৩য় খণ্ড
-সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুবাদক মণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত

CRIME PREVENTION IN ISLAM
(Proceedings of the Symposium held in Riyadh, Saudi Arabia)

ইসলামী ফিকহের ঐতিহাসিক পটভূমি
-মাওলানা তাকী আমিনী
অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব

বিশ্বখ্যাত স্কলারদের রচনায় ইসলামী আইন
-সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুবাদক মণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত

ইসলামের কারা আইন ও কারাবন্দিদের অধিকার
-লেখক : ড. মুহাম্মদ রাশেদ উমর
অনুবাদ : ড. মুহাম্মদ আব্দুল জলীল ও প্রফেসর ড. মাহফুজুর রহমান

ইসলামের দৃষ্টিতে গৃহ-অধিকার ও সুরক্ষা
-প্রফেসর ড. আহমদ আলী

www.pathagar.com

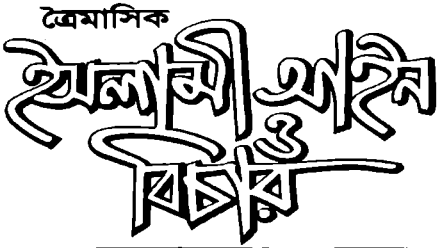

নিয়মিত প্রকাশনার ১১ বছর

প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং ইসলামী আইনের সর্বজনীন কল্যাণ ও কার্যকারিতা সম্পর্কে বাংলাদেশে একমাত্র একাডেমিক জার্নাল (বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, ISSN নম্বরপ্রাপ্ত ও সকল সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত) ত্রৈমাসিক **ইসলামী আইন ও বিচার** এগারো বছরে পদার্পণ করেছে। এ পর্যন্ত ৪০টি সংখ্যায় দেশ ও বিদেশের প্রখ্যাত গবেষকদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় দুইশত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

* একসঙ্গে ৪০ টি সংখ্যার মূল্য ২৪০০/-
* প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০০/-

নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়তে দিন।

যোগাযোগের ঠিকানা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং

MSA ১১০৫১
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০
বিকাশ : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭ (পারসোনাল)

সংস্থার একাউন্ট বা বিকাশ-এ পেমেন্ট করে ঘরে বসেই আপনি ডাক/কুরিয়ার যোগে জার্নাল ও বই সংগ্রহ করতে পারেন।

www.pathagar.com

এক নজরে
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
এর কার্যক্রম

১. রিসার্চ প্রজেক্ট ক. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইন খ. মুসলিম পারিবারিক আইন গ. নারী, শিশু ও মানবাধিকার ঘ. ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস ঙ. ইসলামী আইন সম্পর্কে ভ্রান্তি নিরসন চ. ইসলামী আইনের কল্যাণ ও কার্যকারিতা উপস্থাপন	**২. লিগ্যাল এইড প্রজেক্ট** ক. পারিবারিক বিরোধ নিরসনে সালিশ খ. আদালতের বাইরে সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি গ. অসহায় মজলুমদের আইনী সহায়তা ঘ. নির্যাতিতা নারী ও শিশুদের আইনী সহায়তা ঙ. ইসলামের পক্ষে আইনী প্রতিরোধ
৩. সেমিনার প্রজেক্ট ক. আন্তর্জাতিক আইন সেমিনার খ. জাতীয় আইন সেমিনার গ. মাসিক সেমিনার ঘ. মতবিনিময় সভা ঙ. গোলটেবিল বৈঠক	**৪. জার্নাল প্রজেক্ট** ক. ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ত্রৈমাসিক) খ. ইসলামিক ল' এন্ড জুডিশিয়ারী (ষান্মাসিক) গ. আরবী জার্নাল (ষান্মাসিক) ঘ. মাসিক পত্রিকা ঙ. বুলেটিন
৫. বুক পাবলিকেশন প্রজেক্ট ক. মৌলিক আইন গ্রন্থ খ. অনুবাদ আইন গ্রন্থ গ. আইনের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা ঘ. ইসলামী আইন কোড ঙ. ইসলামী আইন বিশ্বকোষ	**৬. লেখক প্রজেক্ট** ক. বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক লেখক ফোরাম খ. আইনজীবী ভিত্তিক লেখক ফোরাম ঘ. মাদরাসা ভিত্তিক লেখক ফোরাম ঘ. লেখক ওয়ার্কশপ ঙ. লেখক সম্মেলন
৭. লাইব্রেরি প্রজেক্ট ক. কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ খ. ফিক্‌হ ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ গ. আইন ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ ঘ. ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ ঙ. ইসলামের ইতিহাস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ	**৮. উন্নয়ন প্রজেক্ট** ক. আইন কমপেক্স প্রতিষ্ঠা খ. আইন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা গ. আধুনিক অডিটোরিয়াম প্রতিষ্ঠা ঘ. ই-লাইব্রেরি ঙ. আইন ওয়েব সাইট

www.pathagar.com

গ্রন্থ পরিচিতি

নোয়াহ ফেল্ডম্যান-এর লেখা 'দি ফল এন্ড রাইজ অব দ্যা ইসলামিক স্টেট' গ্রন্থটি আধুনিক মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্লাসিক্যাল ইসলামী শরীয়া প্রতিষ্ঠার সাম্প্রতিক জনপ্রিয় দাবির নেপথ্যের কার্যকারণ কী- এ বিষয়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করেই তুলে ধরেছে। অবশ্য পশ্চিমা বিশ্বের অনেকেই এ প্রবণতাকে গণতন্ত্রের প্রতি হুমকি মনে করেন। এ অবস্থায় প্রশ্ন হচ্ছে শরীয়া বলতে আমরা আসলে কী বুঝব? তাছাড়া শরীয়া কি মুসলিম বিশ্বে সত্যিই সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে?

ফেল্ডম্যান এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী ক্লাসিক্যাল ইসলামী আইনের মূলে ফিরে গেছেন। তার মতে, আজকের যে কোন মুসলিম রাষ্ট্র শরীয়ার মাধ্যমেই তার নাগরিকদের রাজনৈতিক ও আইনী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে কেবল একটি বিষয় নিশ্চিত করলেই; সেটা হচ্ছে, যদি শরীয়াভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা নতুন নতুন এমন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে যেগুলোর মাধ্যমে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার কাজটি নিশ্চিত করা যায়।

ফেল্ডম্যান তাঁর নাতিদীর্ঘ কিন্তু স্পষ্ট বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এ চমৎকার গ্রন্থটিতে সাধারণ পাঠকদের সামনে শত শত বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত ইসলামী শাসনব্যবস্থার নানা রূপ তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি তিনি ঐতিহ্যবাহী ইসলামী প্রশাসন এবং বর্তমানের রাজনৈতিক ইসলামের মধ্যকার পার্থক্যের বিষয়টিও তুলে ধরতে ভুলেননি। তার এ বইটি মূলত ইসলামের প্রথম যুগের খলিফাদের আমল থেকে আজকের আধুনিক যুগ পর্যন্ত ইসলামের আইনব্যবস্থায় যে বিবর্তন ও বিকাশ ঘটেছে এরই সংক্ষিপ্ত অথচ সুচিন্তিত ইতিহাস-পর্যালোচনা।

গ্রন্থটি এসোসিয়েশন অব অ্যামেরিকান পাবলিশার্স ঘোষিত ২০০৮ সনে PROSE Award বিজয়ী এবং ইকোনমিস্ট-এর দৃষ্টিতে ২০০৮ সনের অন্যতম সেরা গ্রন্থ।

লেখক পরিচিতি

নোয়াহ ফেল্ডম্যান হার্ভার্ড স্কুল অব ল' এর একজন বেমিস অধ্যাপক। তিনি নিউইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিন ও ব্লুমবার্গ ভিউ'র নিয়মিত লেখক এবং কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন-এর অন্যতম সিনিয়র ফেলো। তিনি Divided by God, What We Owe Iraq এবং After Jihad শীর্ষক গ্রন্থসমূহের লেখক।